তেলরাজনীতি ও পরাশক্তির উত্থান-পতন

# ব্যাটল ফর পাওয়ার

সোহেল রানা
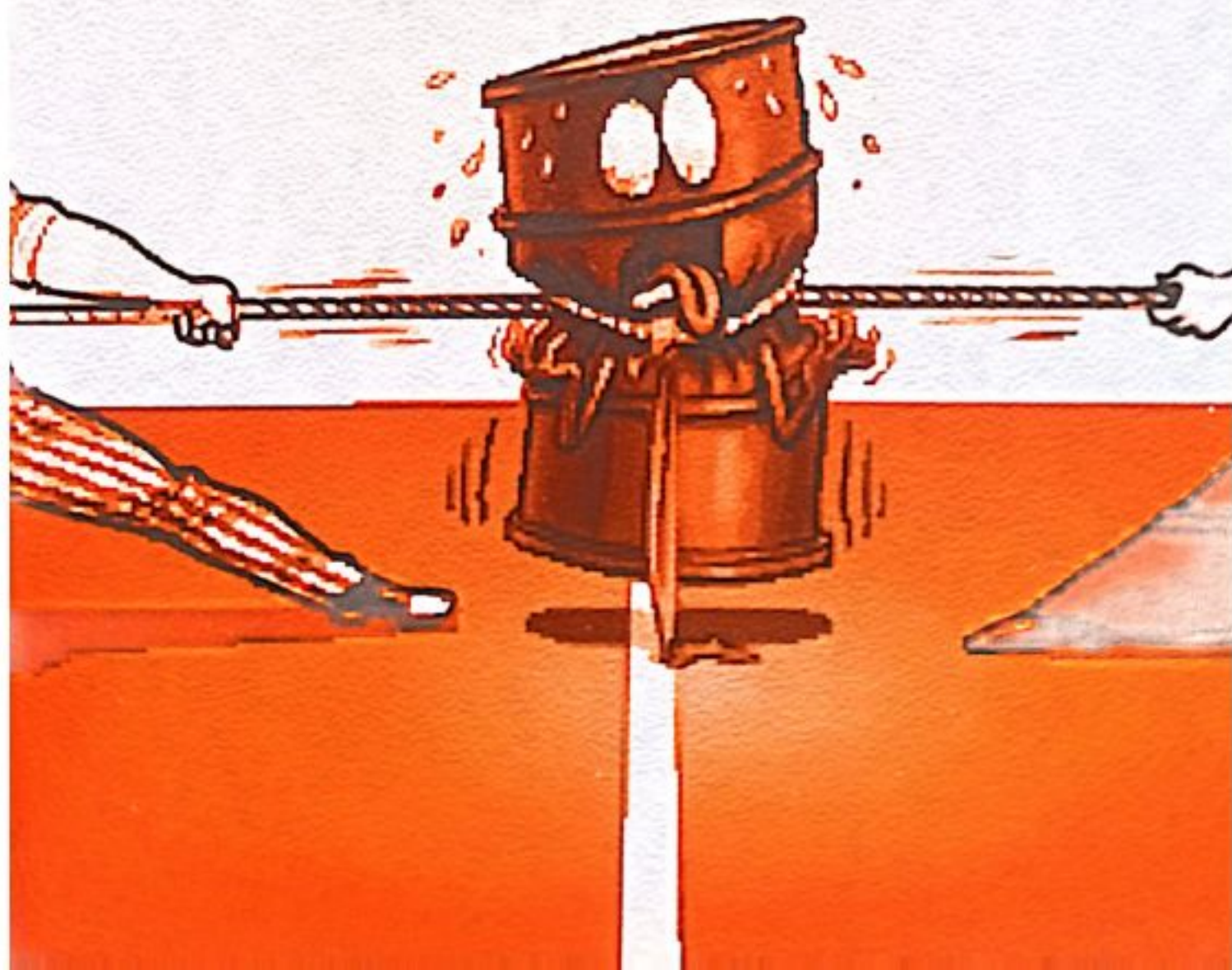
# বই সম্পর্কে

সাম্রাজ্যবাদের দুর্গন্ধ পশ্চিমাদের শিরায় শিরায়। পৃথিবীর যেখানেই তারা হস্তক্ষেপ করেছে—পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট যা-ই হোক না কেন, নিজেদের মতো গল্প তৈরি করে তা বাজারজাত করেছে বাকি দুনিয়ার মানুষের কাছে। এটা তাদের বহুল চর্চিত পুরোনো কৌশল। এভাবে নিজেদের সন্ত্রাসের বৈধতায় বিশ্বের সব খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে তারা গবেষণা চালায়, গন্ডায়গন্ডায় বইপুস্তক আর থিসিস লিখে সয়লাব করে ফেলে বিদ্যায়তন। সেগুলোর প্রচার-প্রসারে ব্যয় করে হাজার হাজার মার্কিন ডলার; অথচ এসব গল্প শুনেই আমরা বড়ো হই, আহ্লাদে গদগদ হয়ে বুক চেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি বিপন্ন মানবতার জন্য। এভাবে একসময় নিজেদের অজান্তেই আমরা পশ্চিমা বয়ানের বিশ্বস্ত খদ্দের বনে যাই। আর ওরিয়েন্টালিজমের চোরাবালিতে আটকে পড়ি চিরতরে।

# প্রকাশকের কথা

সাদা চোখে বিশ্ব রাজনীতিতে যা দেখছি, তার পেছনে রয়েছে বহু সংলাপপরম্পরা। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মুক্তচর্চা, বাক্‌স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, অংশীদারত্বের রাষ্ট্র ইত্যাদি টার্মগুলো খুবই জনপ্রিয় ও বহুল চর্চিত। সাদা চোখে অতি উত্তম এসব টার্ম যেমন দেখায়, পর্দার আড়ালের দৃশ্য ঠিক তেমন নয়। জাতিরাষ্ট্রের যে আগ্রাসন দেখি, তার সম্মুখচিত্র যা, পেছনের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা। দুনিয়ার বুকে যত যুদ্ধ-সংঘাত-লড়াই, তার পেছনে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান দুটো প্রেক্ষিত আছে। অদৃশ্যমান প্রেক্ষিত মূলত মসনদের নিশ্চয়তা এবং এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক বলয় আবর্তিত হয় তেলরাজনীতিকে সামনে রেখে।

বিশ্বব্যাপী তেলসংঘাত (Petro-Aggression) খুবই পরিচিত টার্ম। ১৯৮০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৮ সালের ২০ আগস্ট পর্যন্ত ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলেছে। আপনি সাদা চোখে দেখেছেন, সদ্যজাত ইরানের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে বাপের বেটা সাদ্দাম। কিন্তু পেছনে পরাশক্তির তেলরাজনীতিটা সহজে চোখে পড়েনি। ১৯৯০ সালের ইরাক-কুয়েত লড়াইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে তেলের তেলেসমাতি খুঁজে পাওয়া গেছে। সত্তরের দশকে আফ্রিকার দেশ চাঁদে লিবিয়ার বারবার অনুপ্রবেশের মূলে ছিল তেল। এই যে ইরানের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদি অবরোধ চলছে, সেই গল্পটাও কিন্তু তেলের খনিতে গিয়ে ঠেকেছে।

তেলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে বিশ্ব রাজনীতি ঠিক কীভাবে ফাংশন করে, কী করে আন্তর্জাতিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পেট্রোডলার দিয়ে, জানতে চান কি? এই প্রজন্মের একজন হিসেবে আপনার অবশ্যই সেটা জানা দরকার। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও স্বতন্ত্র মেজাজে আন্তর্জাতিক তেলরাজনীতির সেই সাতকাহন পাঠক সমীপে তুলে ধরেছেন তরুণ লেখক ও সাংবাদিক সোহেল রানা। ইতিহাসের কাঠখোট্টা পাঠে আপনি ক্লান্ত হবেন না; বরং পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে যাবেন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে। কখনো তেলের খনিতে যাবেন, আবার কখনো বা ঢুকে পরবেন রাজদরবারের অন্দরমহলে। ইতিহাস পড়বেন একবুক রোমাঞ্চ নিয়ে।

*কিংডম অব আউটসাইডারস*-এর পরে এটি লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। সম্মানিত লেখক বরাবরের মতো গার্ডিয়ানের প্রতি আস্থা রেখেছেন। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা বলে থাকি, তরুণ প্রজন্মের বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে মৌলিক লেখকের সংখ্যা কম। জনাব সোহেল রানার এই গ্রন্থ পড়ার পর আপনিও বলতে বাধ্য হবেন—এমন তরুণদের আরও বেশি বেশি লেখা উচিত। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অফুরান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৫ জুন, ২০২২

# লেখকের কথা

পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ ছড়িয়েছে একেক সময় একেক বিষয়কে উপজীব্য করে। কখনো ধর্ম, কখনো মসলা বাণিজ্য, আবার কখনো-বা খনিজ সম্পদ দখলের নেশায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় হানা দিয়েছে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গের দল। লুটপাটের পথ মসৃণ করতে পৃথিবীর বহু দেশে স্বৈরশাসনকে প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে দশকের পর দশক ধরে।

লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কিছু দেশে স্বৈরশাসকদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল আমেরিকা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও বেলজিয়াম। এর অন্যতম উদাহরণ কঙ্গোর মবুতু সেসে এবং চিলির সামরিক শাসক অগাস্টা পিনোশে। আবার জাতীয়তাবাদের ঐক্য গড়ে যারা এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মোকাবিলায় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উপায় খুঁজেছেন, তাদের কপালে জুটেছে বন্দিত্ব, নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ড কিংবা গুপ্তহত্যা। পাশ্চাত্য দুনিয়া কখনো সিভিলিয়ানদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সন্ত্রাসের পথ রচনা করেছে, আবার কখনো স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে অস্ত্র ধরেছে সেই অস্ত্রধারী সিভিলিয়ানদেরই বিরুদ্ধে। তেল সম্পদ লুট করতে না পারার অভিমান থেকে ৫০-এর দশকে ইরানের জাতীয়তাবাদী সরকারকে হটিয়ে স্বৈরাচারের হাতকে শক্তিশালী করেছিল আমেরিকা ও ব্রিটেন। আবার আশির দশকে রোনাল্ড রিগ্যানের আমলে মধ্য আমেরিকায় বামপন্থি শাসনের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল প্রক্সি যুদ্ধের মাধ্যমে।

কমিউনিস্ট স্বৈরশাসন পোক্ত করতে আফগানিস্তানে ঢুকে পড়েছিল সোভিয়েত সেনারা। তাদের ঠেকাতে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থি আফগানদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় জিমি কার্টার প্রশাসন। ২২ বছর বাদে সেই আফগান মুজাহিদিন গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসা 'তালেবান'কে কাবুল থেকে উৎখাত করে পুরোনো মিত্র আমেরিকাই। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! দুই দশক আগে এত আয়োজন করে যাদের সরানো হলো, সেই তালেবানের সাথেই শান্তিচুক্তি করে কাবুলের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরে গেছে আমেরিকা।

ইরানে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। সেই আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়েন পশ্চিমাপন্থি শাহ মুহাম্মাদ রেজা পাহলভি। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে আয়াতুল্লাহ খোমেনির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রতিবেশী ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হোসেনকে অস্ত্র দেয় রিগ্যান প্রশাসন। সদ্যোজাত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে ইরাক। এ লড়াই চলে দীর্ঘ আটটি বছর। এক যুগের ব্যবধানে আরও দুটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় সাদ্দামের ওপর। সেইসঙ্গে ইরাকের উত্তর ও দক্ষিণে ছড়িয়ে দেওয়া হয় কুর্দি ও শিয়া বিদ্রোহ।

এমনিভাবে আফ্রিকা মহাদেশে একাধিক শাসক খুনের পেছনেও আছে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম। গণবিপ্লব দমন করে সিরিয়া আর বেলারুশের দুই ডিক্টেটরকে এখনও মদদ দিয়ে যাচ্ছে পুতিন শাসিত রাশিয়া। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে গণতন্ত্র, কমিউনিজম, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, সন্ত্রাসবাদ—এ সবকিছুই বাহানা এবং লুটপাটের কিছু টুলস মাত্র। যখন যেখানে যেভাবে ব্যবহার করা দরকার, সেখানে সেভাবেই এসব টুলস ব্যবহার করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাকে যেখানে প্রয়োজন, তাকেই সেখানে বসিয়েছে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। ফলে বিশ্বরাজনীতি ক্ষণে ক্ষণে উত্তপ্ত হয়েছে, ক্ষমতা কাঠামো বদলে গেছে, পালটে গেছে পরাশক্তির মানচিত্র। এই পট পরিবর্তনের রাজনীতিতে গত ১০০ বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে পেট্রোলিয়াম অয়েল।

বিশ্ব তেলরাজনীতির সূচনা হয়েছে পারস্য তথা আজকের ইরান থেকে ইংরেজদের হাত ধরে। তার মানে এই নয় যে, ইরানেই প্রথম তেল খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। ইরান কেন এবং কীভাবে ইংরেজদের টার্গেটে পড়ল? কীভাবে বদলে গেল দুনিয়ার ক্ষমতা কাঠামো? মোসাদ্দেককে কেন সরানো হয়েছিল? কীভাবে আজকের রূপ পেল মরুর দেশ সৌদি আরব? কারা খুন করল বাদশাহ ফয়সালকে? আফগানিস্তানে তালেবান উত্থান-পুনরুত্থানের নেপথ্যে কারা? রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র কেন ব্যর্থ হলো? কী করে পুঁজিবাদে বিলীন হলো চীন? মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সৌদি-আমিরাতের দ্বন্দ্বের সমীকরণ কী? ইরাক-ইরান যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ এবং কুর্দি সংকটের পেছনে কেবলই কি আঞ্চলিক রাজনীতি কিংবা সন্ত্রাসবাদ? বইটিতে এসব প্রশ্নেরই জবাব খুঁজেছি আমি।

এই বইয়ের দুটো অংশ। প্রথম অংশে পাঠকদের জন্য রয়েছে ইতিহাস ও বিশ্বরাজনীতির সাধারণ আলোচনা। আর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বন্ধুর সাথে আড্ডার মধ্য দিয়ে বিশ্বরাজনীতির অন্দরে অল্পবিস্তর আনাগোনা। সনাতন ধারাবাহিক আলোচনার চেয়ে বইটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঘটনা ও সময়কে। অর্থাৎ গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে ইতিহাস ও রাজনীতির প্রসঙ্গ এগিয়েছে সামসময়িক ঘটনাপ্রবাহকে সঙ্গে করে। ইতিহাসের সাধারণ ধারাবাহিক আলোচনা শুনে যারা অভ্যস্ত, এটা তাদের প্রত্যাশা থেকে কিছুটা আলাদা।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজনের লেখা ও পরামর্শ আমার কাজে লেগেছে। সবার আগে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখতে চাই। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, প্রয়াত অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রেহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীহারকুমার সরকার, পাঠশালার অ্যাডমিন শাহাদাত হোসেন, কলামিস্ট ফারুক ওয়াসিফ, আলতাফ পারভেজ, রোরবাংলার লেখক মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা, হিমেল রহমান, জাহিদ হাসান মিঠু ও রাজনোটিশের লেখক সাইফুদ্দিন আহমেদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 'বইটি কবে আসছে', 'কী লিখছিস', 'তাড়াতাড়ি কর'—এভাবে প্রতিনিয়ত খোঁচাখুঁচি করে সব সময় মধুর অত্যাচার চালিয়েছে অপার্থিব বন্ধু ইমরুল হাসান রাসেল। কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতিও। বইটি প্রকাশের জন্য পুরো গার্ডিয়ান পরিবারের প্রতি আমার অনিঃশেষ শুকরিয়া ও ভালোবাসা।

# সূচিপত্র

## প্রথম অংশ

## দ্বিতীয় অংশ

# প্রথম অংশ

# মহাশক্তির মহাপতন

১৬ই আগস্ট, ২০২১। পত্রিকার পাতায় লাল কালির ঢাউস শিরোনাম—'তালেবানের হাতে কাবুলের পতন...'

কাবুলজুড়ে উড়ছে তালেবানের পতাকা। ২০ বছর ধরে পাহাড়-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো সেই পুরোনো যোদ্ধারা এখন কাবুলের হর্তাকর্তা। মাঝখানে অসংখ্য মৃত্যু আর দুঃসহ স্মৃতির বোঝা। ২০০১ সালে আমেরিকার হাতে শুরু হওয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধের পথে প্রথম বহুজাতিক এনকাউন্টারের শিকার হয়েছিল যে দেশটি, তার নাম আফগানিস্তান—আড়াই লাখ বর্গমাইলের এক পার্বত্য ভূখণ্ড। আমেরিকা স্লোগান তুলেছিল—'হয় তুমি আমার পক্ষে, নাহয় তুমি সন্ত্রাসবাদী।' পরের ২০টা বছর আমেরিকা আর তার দোসররা ছুটেছে তথাকথিত 'ইসলামি সন্ত্রাস' নামের এক ছুঁচোর পেছনে। পশ্চিমা মিডিয়া এই ছোটাছুটিরই নাম দিয়েছে 'ওয়ার অন টেরর'।

২০ বছরে আফগান রাজধানী কাবুলের চেহারাও পালটে গেছে অনেকখানি। পুরোনো নগরী গায়ে-গতরে ঝকঝকে তকতকে হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পা চেটে উত্থান ঘটেছে নব্য ধনিক শ্রেণির। শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়েছে। ৬ লাখ জনসংখ্যার পুরোনো কাবুলে এখন অর্ধকোটি মানুষের বসবাস। কাবুল যেমন পাশ্চাত্যের পরশে বদলে গেছে, তেমনি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব হয়েছে সম্প্রতি ক্ষমতায় ফেরা তালেবান। নতুন তালেবানের সামনে অগ্নিপরীক্ষা—আফগানিস্তান কি শান্ত হবে? জনগণ কি যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে?

# মহাশক্তির মহাপতন

১৬ই আগস্ট, ২০২১। পত্রিকার পাতায় লাল কালির ঢাউস শিরোনাম—'তালেবানের হাতে কাবুলের পতন...'

কাবুলজুড়ে উড়ছে তালেবানের পতাকা। ২০ বছর ধরে পাহাড়-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো সেই পুরোনো যোদ্ধারা এখন কাবুলের হর্তাকর্তা। মাঝখানে অসংখ্য মৃত্যু আর দুঃসহ স্মৃতির বোঝা। ২০০১ সালে আমেরিকার হাতে শুরু হওয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধের পথে প্রথম বহুজাতিক এনকাউন্টারের শিকার হয়েছিল যে দেশটি, তার নাম আফগানিস্তান—আড়াই লাখ বর্গমাইলের এক পার্বত্য ভূখণ্ড। আমেরিকা স্লোগান তুলেছিল—'হয় তুমি আমার পক্ষে, নাহয় তুমি সন্ত্রাসবাদী।' পরের ২০টা বছর আমেরিকা আর তার দোসররা ছুটেছে তথাকথিত 'ইসলামি সন্ত্রাস' নামের এক ছুঁচোর পেছনে। পশ্চিমা মিডিয়া এই ছোটাছুটিরই নাম দিয়েছে 'ওয়ার অন টেরর'।

২০ বছরে আফগান রাজধানী কাবুলের চেহারাও পালটে গেছে অনেকখানি। পুরোনো নগরী গায়ে-গতরে ঝকঝকে তকতকে হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পা চেটে উত্থান ঘটেছে নব্য ধনিক শ্রেণির। শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়েছে। ৬ লাখ জনসংখ্যার পুরোনো কাবুলে এখন অর্ধকোটি মানুষের বসবাস। কাবুল যেমন পাশ্চাত্যের পরশে বদলে গেছে, তেমনি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব হয়েছে সম্প্রতি ক্ষমতায় ফেরা তালেবান। নতুন তালেবানের সামনে অগ্নিপরীক্ষা—আফগানিস্তান কি শান্ত হবে? জনগণ কি যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে?

পাশাপাশি দুটো ছবি। প্রথমটি তোলা হয়েছে ১৯৭৫ সালে, সায়গনে। আর দ্বিতীয়টির পটভূমি ২০২১ সালের কাবুল। ভিন্ন দুই শহর, ভিন্ন সময়, ভিন্ন প্রেক্ষাপট, কিন্তু বিদায়ের ধরনে কত মিল!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা যে কয়টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ছিল ভিয়েতনাম ও আফগান যুদ্ধ। তথাকথিত কমিউনিস্ট দুর্বৃত্তদের রুখতে আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়ায় ১৯৬৫ সালে। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, ১৯৭৩ সালে আমেরিকান সেনাদের ভিয়েতনাম রণাঙ্গন ছাড়তে হয়েছিল একেবারে শূন্য হাতে। তার দুবছর বাদেই তখনকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনের পতন হয়। আমেরিকান সমর্থনপুষ্ট সরকারের লোকজন যে যার মতো পালিয়ে বাঁচে। সেই পতনের সাথে ২০২১ সালের কাবুল পতনের মিল দেখছেন অনেকেই। ব্যবধান অবশ্য বেশি নয়, মাত্র ৪৬ বছর!

দুই দশকের ইঁদুর-বিড়াল খেলা শেষে আফগানিস্তান থেকে তাঁবু গোটাতে হয়েছে বিশ্ব পরাশক্তিকে। লজ্জাজনক এই বিদায়ের পর মার্কিন নেতৃত্ব বলছে—ভবিষ্যতে আর কোনো দেশ মেরামত করতে যুদ্ধে যাবে না আমেরিকা। জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন—

> 'বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবর্তনের এটাই সময়। এ সিদ্ধান্ত শুধু আফগানিস্তান নিয়েই নয়; অন্য যেকোনো দেশ পুনর্গঠনে বড়ো পরিসরে সামরিক অভিযান চালানোর এটাই পরিসমাপ্তি!'

ভিয়েতনাম যুদ্ধের অর্ধশত বছর পরের তিক্ত এই অভিজ্ঞতায় মার্কিনিদের তেল চিটচেটে ভাব দূর হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদীদের তাড়া খাওয়ার যে ইতিহাস, আমেরিকা তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। অতীতের দুই পরাশক্তি—ব্রিটেন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের লজ্জাজনক পরিণতিই তারা বরণ করেছে। এখন আমেরিকার এ প্রস্থান গৌরবের, না অসম্মানের, নাকি কেবলই কৌশলগত পদক্ষেপ বা ভিন্ন কোনো ইতিহাসের সূচনা—সে আলোচনাকে অতটা গুরুত্ব না দিলেও চলে। কাবুল আমেরিকার দখলমুক্ত হয়েছে, আপাতত এটাই প্রশান্তি। তবে পশ্চিমের উদ্‌বিগ্ন চোখের দৃষ্টি এখনও কাবুলের দিকে—আবারও কি পুরোনো পথে হাঁটবে তালেবান?
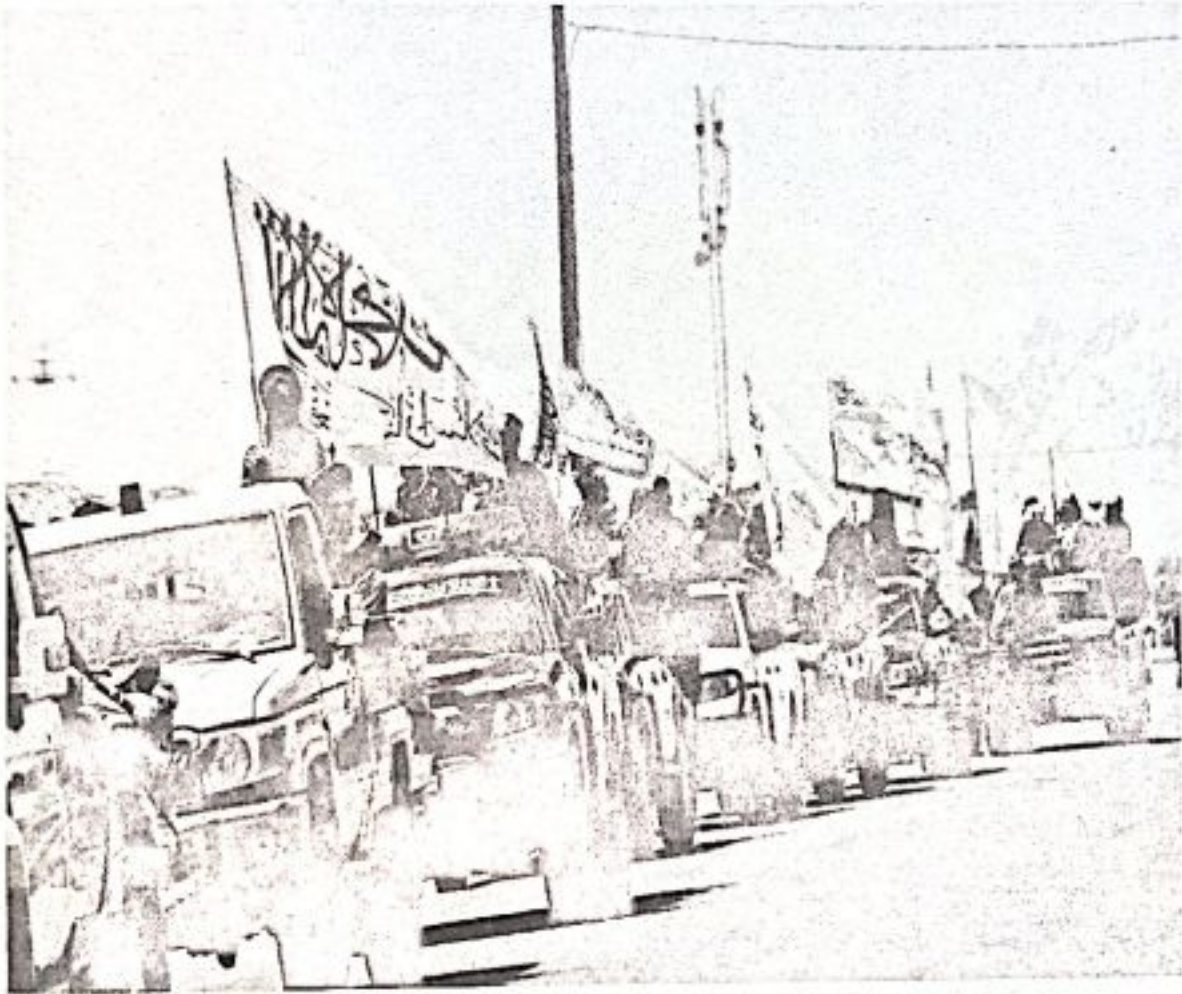
২০২১ সালে দ্বিতীয় দফায় আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সমরাস্ত্র নিয়ে কুচকাওয়াজ করছে তালেবান। ছবি : এএফপি

সাধারণত আগের সরকার যে পথে হাঁটেন, পরের সরকার হাঁটেন ঠিক তার উলটো। এ রেওয়াজ পশ্চিমে যেমন, পূর্বেও তেমন। ২০২০ সালের শুরুর দিকে মার্কিন সেনাদের ঘরে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তালেবানের সাথে

চুক্তি[১] করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। লোকেরা ভেবেছিল জো বাইডেন[২] তার পূর্বসূরির পথে হাঁটবেন না, কিন্তু হয়েছে এর বিপরীত। একটা নিষ্ফল প্রজেক্টে ২০ বছরের গাধার খাটনি আর কাড়ি কাড়ি ডলার গচ্চার বিষয়টি ট্রাম্পের মতো তাকেও ভাবিয়েছে। আমেরিকা 'ওয়ার অন টেরর' পরবর্তী আফগানিস্তানে কম করে হলেও খরচ করেছে ২ ট্রিলিয়ন ডলার! মার্কিন সাময়িকী *ফোর্বস* বলছে—তালেবান হটাতে আমেরিকার খরচ ছাড়িয়ে গেছে জেফ বেজোস, ইলন মাস্ক, বিল গেটসসহ বিশ্বের শীর্ষ ৩০ ধনকুবেরের মোট সম্পত্তির পরিমাণকেও! এই খরচের অঙ্ক কতটা বিশাল? ফোর্বস বলছে—এতই বিশাল যে, মাথাপিছু হিসাবে প্রত্যেক আফগান নাগরিকের পেছনে ব্যয় হয়েছে অন্তত ৫০ হাজার ডলার!

---

[১] কাতারের রাজধানী দোহায় যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবানের মধ্যে ঐতিহাসিক এই চুক্তিটি সই হয় ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। তখনকার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এবং তালেবানের দোহা মুখপাত্র সোহাইল শাহিন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি ছিল তালেবানের অন্যতম প্রধান দাবি। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে মূলত তালেবানকে জঙ্গি-সন্ত্রাস বলার পুরোনো ধারা থেকে সরে আসে আমেরিকা।

[২] জো বাইডেন ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ও যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম রাষ্ট্রপতি। দেশটির সিটিং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করে ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এর আগে ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৪৭তম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এই ডেমোক্রেট নেতা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছু উল্লেখযোগ্য নীতি পালটে দেওয়ার কাজ শুরু করেন। এদিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ১৫টি নির্বাহী আদেশে সই করেন। তবে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে আগের প্রশাসনের নেওয়া সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি তিনি।

উড়োজাহাজের মেঝেতে গাদাগাদি করে বসেছে সবাই। কারও মাথায় হাত, কারও কোলে শিশু, কারও কানে ফোন। ২০২১ সালে তালেবান কাবুল দখলের পর এভাবেই একটি কার্গো বিমানে দেশ ছাড়ে ৬০০-এরও বেশি সন্ত্রস্ত আফগান। ছবি : রয়টার্স।

পরিসংখ্যান বলছে, তালেবানবিরোধী যুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে ৪৭ হাজার আফগান নাগরিকের প্রাণ। সেইসাথে ৬৯ হাজার আফগান সেনা-পুলিশ আর আড়াই হাজার আমেরিকান সেনার প্রাণ ক্ষয় হয়েছে দৃশ্যমান কোনো অর্জন ছাড়াই।

কাতারে আমেরিকা ও তালেবানের মধ্যকার ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি। ছবি : এএফপি

আমেরিকার নীতিনির্ধারক মুরব্বিদের অবস্থা হয়েছে অনেকটা ব্রিটিশদের মতো। আর দড়িছেঁড়া গরুর হাল হয়েছে যুদ্ধ করতে আসা সাধারণ সেনাদের। ফলে হোয়াইট হাউজের সিদ্ধান্তে তালেবান যেমন খুশি, স্বদেশে ফেরা মার্কিন সেনারাও আছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরাও প্রায় একইভাবে ভেবেছিল, খামোখা টাকা খরচ করে ভারতবর্ষ আর প্যালেস্টাইনে কলোনি ধরে রাখার কোনো মানেই হয় না। যা নেওয়ার আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। কাজেই ঘরে ফেরা যাক। ইংরেজরা ঘরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শীতনিদ্রায় গেল আর এই সুযোগে দুনিয়ার রাজত্ব গেল আমেরিকানদের হাতে। অবশ্য ইংরেজ দুনিয়া ছোটো হয়ে আসার আরও নানাবিধ কারণ আছে। তবে অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যা হলো খরচের খাত কমানো। কারণ, যুদ্ধপরবর্তী দুর্বল অর্থনীতি নিয়ে ব্রিটেন নিজেই পঙ্গু হতে বসেছিল। আমেরিকা যে আফগানিস্তান ছেড়ে গেল, তারও প্রধান কারণ এই অর্থনীতি। মুনাফা যেহেতু নেই, বিনিয়োগ উঠিয়ে নেওয়াই ভালো। আর কত?

পুরোনো সব খবর ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার হাত ধরে বেশিদূর এগোতে পারেনি তালেবানহীন আফগানিস্তান। মার্কিন মাতব্বরির এই দুই দশকে আশান্বিত হওয়ার মতো কিছু নেই আসলে। নারীশিক্ষা ব্যতীত আর কোনো প্যারামিটারে

আফগানিস্তান ঠিক কী অর্জন করেছে, তার হদিস করতে গেলে যে কেউ-ই হতাশ হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তালেবানের চাইতে কাবুলের আমেরিকাপন্থি সরকার নারী অধিকারের প্রতি অনেক বেশি উদার—এটা প্রমাণ করাই ছিল মার্কিন মুল্লুকের একমাত্র অ্যাজেন্ডা। তারা মনে করেছে এটাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব। অথচ খোলা চোখেই দেখা যাচ্ছে, কাবুলে একটা হৃষ্টপুষ্ট সরকারের আসর ছিল। আমেরিকা তাকে খাইয়ে-পরিয়ে নিজ হাতে গড়েছে। প্রয়োজনে শাসন করেছে, আবার সোহাগও করেছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু এটি ছিল শহুরে শিক্ষিত নব্য ধনিক শ্রেণির এক বেখেয়ালি সরকার। গোটা শাসনকাল জুড়েই তারা ছিল চূড়ান্ত গণবিচ্ছিন্ন। সাধারণ আফগানদের নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায়নি তারা। ফলে গত ২০ বছর ধরে তিলে তিলে এক স্বার্থান্ধ এলিট শ্রেণি গড়ে উঠেছে কাবুলকে ঘিরে। অথচ সরকারে থাকা কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে সব জাতি-গোষ্ঠীরই কমবেশি প্রতিনিধিত্ব কিংবা সমর্থন ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে—এ কথা বলার সুযোগ নেই। এদের প্রত্যেকেরই অমোঘ ও অভিন্ন শত্রু ছিল তালেবান।

কেবল সেনাবাহিনী দিয়েই সরকার টেকানো যায় না; তার সাথে চাই জুতসই অর্থনীতি ও যোগ্য নেতৃত্ব। এই দুই সেক্টরেই কাবুলের আশরাফগনি সরকারের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা ছিল অত্যন্ত প্রকট।

# সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র

সাম্রাজ্যবাদের দুর্গন্ধ পশ্চিমাদের শিরায় শিরায়। পৃথিবীর যেখানেই তারা হস্তক্ষেপ করেছে—পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট যা-ই হোক না কেন, নিজেদের মতো গল্প তৈরি করে তা বাজারজাত করেছে বাকি দুনিয়ার মানুষের কাছে। এটা তাদের বহুল চর্চিত পুরোনো কৌশল। এভাবে নিজেদের সন্ত্রাসের বৈধতায় বিশ্বের সব খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে তারা গবেষণা চালায়, গণ্ডায় গণ্ডায় বই-পুস্তক আর থিসিস লিখে সয়লাভ করে ফেলে বিদ্যায়তন। সেগুলোর প্রচার-প্রসারে ব্যয় করে হাজার হাজার মার্কিন ডলার। অথচ এসব গল্প শুনেই আমরা বড়ো হই, আহ্লাদে গদগদ হয়ে বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি বিপন্ন মানবতার জন্য। এভাবে একসময় নিজেদের অজান্তেই আমরা পশ্চিমা বয়ানের বিশ্বস্ত খদ্দের বনে যাই। আর ওরিয়েন্টালিজমের[৩] চোরাবালিতে আটকে পড়ি চিরতরে।

নাইন-ইলেভেনের ঘটনার পর আমেরিকা 'ওয়ার অন টেরর' নামে কথিত ইসলামি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার লড়াইয়ের সূচনা করেছে, তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু

---

[৩] ওরিয়েন্টালিজম শব্দটি মূলত ইংরেজি; বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'প্রাচ্যবাদ'। এককথায় বললে—ওরিয়েন্টালিজম হলো পশ্চিমা গবেষকদের তরফে প্রাচ্যকে জানার, বোঝার ও আবিষ্কারের একটি বিশেষ ধারা। এই ধারণার প্রবর্তন করেন ফিলিস্তিনি চিন্তক এডওয়ার্ড সাইদ। তাঁর মতে—পাশ্চাত্যের এই গবেষণাপদ্ধতি একটা বিশেষ ধারা বা রীতি অনুসরণ করে, যার মধ্য দিয়ে প্রাচ্যের যে ছবিটা তুলে আনা হয়, তা বাস্তব থেকে অনেকটাই আলাদা। কিন্তু তারপরও প্রাচ্যের সেই বিকৃত ছবিই গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। এডওয়ার্ড সাইদ তাঁর বিখ্যাত বই *ওরিয়েন্টালিজমে* প্রাচ্যবিদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—'যিনি সামগ্রিকভাবে প্রাচ্য সম্পর্কে অথবা এর বিশেষায়িত কোনো অংশ সম্পর্কে শিক্ষা দেন, লেখালিখি বা গবেষণা করেন। তিনি নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ কিংবা ভাষাবিজ্ঞানী যে-ই হোন না কেন, তিনিই ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যতাত্ত্বিক এবং তিনি যা করছেন তা-ই ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ।'

মূলত 'ইসলাম'। আর তালেবান উৎখাত ছিল সেই লড়াইয়েরই ধারাবাহিকতা। আফগানিস্তানে তারা মূলত একটা নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেছে মাত্র। এসব বিবেচনায়, যথেষ্ট যাচাই-বাছাই ব্যতীত পাশ্চাত্যের বক্তব্য গ্রহণ করার পুরোনো মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি, নতুবা ওরিয়েন্টালিজমের ফাঁদ থেকে আমরা কখনোই নিস্তার পাব না।

মার্কিন প্রশাসন বরাবরই প্রচার করে আসছে—তালেবান অতি রক্ষণশীল, মৌলবাদী ও উগ্র ধর্মগোষ্ঠী। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোও প্রভুদের অনুসরণে তালেবান নামের সঙ্গে গুঁজে দিয়েছে জিহাদি, টেররিস্ট ইত্যাকার বিপজ্জনক ট্যাগ। এটা সত্য যে, মূলত মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও চেহারা ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তাড়িত নয়; বরং তারা মনে করে, শরিয়াহ আইনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ।

আফগানরা বিশেষ করে পশতুনরা অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ জাতি। অতিথির জন্য প্রয়োজনে নিজেদের বুক পেতে দিতেও দ্বিধা করে না তারা। এ রকম গল্প আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর কাছেও শুনেছি। পাঞ্জাবিদের পর এই পাঠান বা পশতুনরাই পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী। পাক-আফগান সীমান্তবর্তী উভয় অংশে এদের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তালেবানের নিয়ন্ত্রণও তাদেরই হাতে। কারণ, তালেবানের 'পাওয়ার হাউজ' বলে খ্যাত মাদরাসাগুলো গড়ে উঠেছে আফগান-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায়। সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় এই মাদরাসাগুলো পরিণত হয়েছিল এক একটা মুজাহিদ প্রশিক্ষণ শিবিরে। আমেরিকা যখন আল-কায়েদা নেতা লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বারবার তালেবানের ওপর চাপ প্রয়োগ করছিল, তালেবান তখন তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রমাণ দেখাতে বলে। কিন্তু এই আহ্বানে আমেরিকার কোনো সাড়া মেলেনি। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সমঝোতার সকল দুয়ার বন্ধ করে দেন। তালেবান ছিটকে পড়ে কাবুলের ক্ষমতা থেকে, তছনছ হয়ে যায় আফগান নাগরিকদের সাজানো সংসার।

আফগানরা নির্বিষ ঢোঁড়াসাপ নয়, খারকুশ পর্বতের দৃঢ়তা তাদের অন্তরে। আগ্নেয়াস্ত্র আর সাক্ষাৎ মৃত্যুর সাথেই তাদের নিত্য বসবাস। যে বয়সে তারা বরফঢাকা পাথরের পাহাড় ডিঙিয়ে কাবুল নদীতে পানির স্রোত নামায়,

সে বয়সে আমরা গরুর দুধ নিয়ে হাটে যাই, ভোরবেলা লাঙল নিয়ে মাঠে নামি কৃষাণ বাবার পিছু পিছু। কিন্তু আফগানদের রক্তে বইছে বহুকালের বিদ্রোহী চেতনা। তারা বহু বিদেশি শক্তির আগ্রাসন দেখেছে, আবার দারুণ দাপটে শত্রু খেদিয়ে ছিনিয়ে এনেছে মুক্তির সূর্য।

আফগান ইতিহাসের ছবি খুব পরিষ্কার। তিন দশক আগে **'নজিবুল্লাহ'**[৪] নামের একটা কমিউনিস্ট আপদ রেখে কাবুল ছেড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই আপদ অবশ্য বেশিদিন টিকতে দেয়নি আফগান মুজাহিদরা। এই সংগ্রামী ধর্মগোষ্ঠী থেকেই পরবর্তী সময়ে জন্ম নিয়েছে তালেবান। তারা শুরু থেকেই জানত, বিদেশি সাহায্য ব্যতীত তাদের ঠেকাতে পারে—এমন কোনো অভ্যন্তরীণ শক্তি আফগানিস্তানে নেই। তালেবানের জাতশত্রু **'নর্দান এলায়েন্স'**[৫] এখন কার্যত মৃত। উত্তরের নেতাদের আগের সেই পেশিশক্তি আর নেই, একই সঙ্গে কমেছে তাদের জনবল ও জনপ্রিয়তা। আহমেদ শাহ মাসুদ কিংবা বুরহান উদ্দিন রাব্বানি—কেউই আর পৃথিবীর বুকে বেঁচে নেই। আবদুল রশিদ দোস্তামের মতো সুবিধাবাদী যুদ্ধবাজ নেতার ওপর আগের মতো আস্থা নেই উজবেকদেরও।

আফগানিস্তানে পশতুন তালেবানের বাইরে উল্লেখ করার মতো জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী আপাতত দুইটা—একটা তাজিকদের আরেকটা উজবেকদের। কিন্তু বাইরের সমর্থন আর সহায়তা ছাড়া এরা কখনোই তালেবানের জন্য বড়ো

---

[৪] মুহাম্মাদ নজিবুল্লাহ ছিলেন আফগানিস্তানের সর্বশেষ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রপতি। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। সাধারণভাবে তিনি নজিবুল্লাহ বা ড. নজিব নামে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরপরই একা হয়ে পড়েন সোভিয়েতপন্থি এই শাসক। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি কাবুলে জাতিসংঘের দপ্তরে অবস্থান করেন। তালেবানরা কাবুল অধিকার করার পর জনসম্মুখে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তাকে।

[৫] ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে উত্তর আফগানিস্তানে জাতিগত কয়েকটি যোদ্ধা বাহিনী মিলে তালেবানবিরোধী জোট গঠিত হয়েছিল। জামায়াতে ইসলামির বুরহানউদ্দিন রাব্বানির কমান্ডার আহমেদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বে 'নর্দান অ্যালায়েন্স' নামে সেই জোট সশস্ত্র লড়াই চালিয়েছিল তৎকালীন তালেবান শাসনের বিরুদ্ধে। সেই জোটে ছিল তাজিক, উজবেক, হাজারা, শিয়াসহ আরও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিপুলসংখ্যক সেনা। ২০০১ সালে মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে তালেবানদের ওপর যুগপৎ আক্রমণ শুরু করে তারা। অসংখ্য তালেবান যোদ্ধা এতে নিহত হয়।

কোনো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারেনি। এই দুই গ্রুপ, কাবুল সরকার এবং ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ব্যতীত মার্কিন পশ্চাদপসরণে আর কারোরই অখুশি হওয়ার কথা নয়। সাধারণ আফগানরা অন্তত এ কারণে খুশি যে, তালেবান বিদেশিদের নিজ বাসভূম থেকে তাড়াতে পেরেছে। কারণ, তারা রুশ আর মার্কিনিদের এক পাল্লাতে রেখেই মাপতে পছন্দ করে। উভয়েই আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী এবং অন্তর্গতভাবে সন্ত্রাসী। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তালেবানই আফগানদের প্রথম ও একমাত্র পছন্দ।

কিন্তু তদুপরি বিগত দুই দশক ক্ষমতার বাইরে থাকা তালেবানের পুনরুত্থানের প্রকৃত রহস্য কী? তালেবান নিজেই সব সামলেছে? কাবুল, জালালাবাদ, গজনি আর কান্দাহারে কী করে বিনা বাধায় ঢুকে পড়ল তারা?

# তালেবান পুনরুত্থানের রহস্য

তাজিকিস্তান সীমান্তবর্তী একটি আফগান প্রদেশ 'বাদাখশান'। কাবুল থেকে তার সড়ক দূরত্ব প্রায় পৌনে চারশো কিলোমিটার। ৯০-এর দশকের মধ্যভাগে কান্দাহার নামের যে শহর থেকে তালেবান তাদের রণযাত্রা শুরু করে, বাদাখশান সেখান থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে।

মানচিত্রে বাদাখশান। এটি সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট ও প্রয়াত আফগান জামায়াত নেতা বুরহান উদ্দিন রাব্বানির জন্মস্থান। ছবি : *বিবিসি*

কান্দাহার থেকে শরিয়াহ রাষ্ট্র গড়ার ব্রত নিয়ে তালেবানরা উত্তরে গজনি-কাবুলের দিকে এগোতে থাকলে, একসময় সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা অপরাপর মুজাহিদিন গ্রুপগুলো চলে যায় কাবুলের উত্তর-পশ্চিমে বাদাখশানসহ অন্য প্রদেশগুলোতে। নর্দান অ্যালায়েন্সের যাত্রাও এই উত্তরেই,

পাঞ্জশির নামের ছোট্ট এক প্রদেশে। ১৯৯৬ সালে কাবুল দখল করতে পারলেও তালেবান যেসব এলাকায় ঢুকতে পারেনি, তার মধ্যে বাদাখশান ও পাঞ্জশির অন্যতম।

প্রায় ২৫ বছরের মাথায় এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। তালেবান এবার আগেভাগে যেসব শহর ও প্রদেশ দখল করেছে, বাদাখশান ও এর রাজধানী ফাইজাবাদও রয়েছে তার মধ্যে। এই তালিকায় আরও আছে তাখার ও কুন্দুজ; যেখানে পশতুনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। সবশেষে পাঞ্জশিরেও ওড়ানো হয়েছে তালেবানের সাদা পতাকা। পশতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়—এমন শহরগুলো তেমন বড়ো কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই এবার তালেবানের হাতে চলে গেছে। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল, যেখানে বাঘা বাঘা সব তালেবানবিরোধী যুদ্ধবাজদের আখড়া, সেখানে এই নির্ঝঞ্ঝাট জয় আক্ষরিক অর্থেই বিস্ময়কর! একই কথা পুরো উত্তর-পশ্চিমের জন্যও প্রযোজ্য। কারণ, এই অঞ্চলেই একসময় দাপুটে বিচরণ ছিল তালেবানবিরোধী যুদ্ধবাজ নেতা আহমেদ শাহ মাসুদ, ইসমাইল খান, আবদুল রশিদ দোস্তাম ও মুহাম্মাদ আতা নুরের। প্রথমজন ছাড়া বাকিরা এখনও জীবিত। প্রবীণ বয়সেও তারা সম্মুখসারিতে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে 'হেরাতের সিংহ' ইসমাইল খান সশস্ত্র সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন তার অনুগত যোদ্ধাদের নিয়ে। কিন্তু এতসব লড়াই প্রতিরোধ সত্ত্বেও কোনোভাবেই তালেবান অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারেননি তিনি; বরং বাধ্য হয়েছেন আত্মসমর্পণ করতে।

তালেবানের এই চটজলদি জয়ের রহস্য কী? এত শক্তি তারা কোথা থেকে পেল? মূলত দুটি দিক থেকে নিজেদের ভিতকে শক্ত করেছে তালেবান। প্রথমত, সংগঠন; দ্বিতীয়ত, কূটনীতি। শরিয়াহ আইন প্রয়োগের প্রশ্নে তালেবান হয়তো একচুলও ছাড় দেবে না। কিন্তু রাজনীতি ও কূটনীতিতে এখনকার তালেবানকে বেশ পরিপক্ক আচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। এখন আর তারা নিরঙ্কুশ পশতুনদের সংগঠন নয়। কাবুল কবজায় নেওয়ার পর যে মন্ত্রিপরিষদ তারা গঠন করেছে, তাতে অন্তত তিনজন তাজিক ও একজন উজবেক জাতিগোষ্ঠীর লোক রয়েছেন। যাকে সেনাপ্রধান করা হয়েছে, তিনিও পশতুন নন; তাজিক। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, উজবেক ও তাজিকদের নিয়ে আসার ব্যাপারে তালেবান আগের থেকে অনেক বেশি উদার এবং পরিপক্ক। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে শিয়া হাজারাদেরও কেউ কেউ সংগঠনটিতে ভিড়েছেন।

তালেবানে যোগ দেওয়া তাজিক নেতাদের সমর্থনেই বাদাখশান ও পাঞ্জশিরের মতো তাজিক অধ্যুষিত প্রদেশ সহজে কবজা করতে পেরেছে তারা। মার্কিন সাময়িকী ফরেন *পলিসির* এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও এই পরিবর্তনের বিষয়গুলো উঠে এসেছে। সাময়িকীটি তালেবান নেতৃত্ব ও সংগঠন নিয়ে কিছু ফ্যাক্ট তুলে ধরেছে। এতে বলা হয়েছে—তাজিক, তুর্কমেন এবং উজবেক নেতাদের অনেকেই তালেবানে যুক্ত হচ্ছেন। এ কারণেই পশতুন এলাকার বাইরেও শক্ত ভিত গড়ার সুযোগ পেয়েছে তালেবান। বাদাখশানের অনেক তাজিক যোদ্ধাই তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। একই পথে হেঁটেছে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তুর্কমেনিস্তান সীমান্তবর্তী ফারিয়াব প্রদেশের তুর্কমেন এবং উত্তরের জাওজান প্রদেশের উজবেক যোদ্ধারা। এই জাওজানেই জন্ম নিয়েছিলেন বিতর্কিত যুদ্ধবাজ নেতা আবদুল রশিদ দোস্তাম।

তালেবান তাদের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ঢেলে সাজিয়েছে। ২০২১ সালের শুরুতে পশতুনদের বাইরে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বেশ কয়েকজনকে জায়গা দেওয়া হয়েছে 'রেহবারি শূরা' বা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদে। বিভিন্ন প্রদেশে আশরাফ গনি সরকারের সমান্তরালে যে 'ছায়া সরকার' তালেবান চালু করেছিল, সেখানেও কিছু গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল পশতুনদের বাইরে থেকে। এর মধ্য দিয়ে তারা মূলত বার্তা দিতে চেয়েছে, কোনো জাতিগত বিভেদ তাদের লক্ষ্য নয় এবং পশতুনরা একাই ক্ষমতার স্বাদ নিতে চায় না। মূলত শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রই তাদের মূল লক্ষ্য। ফলে তাজিক, উজবেক, তুর্কমেন ও হাজারাদের মধ্যকার ধর্মভীরু অংশ তালেবানের এই কথাকে বিশ্বাস করেছে এবং অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে তাদের সাথে। অথচ একসময় আফগানিস্তানে জাতবিভেদ ছিল ধর্মের চেয়েও বড়ো এবং স্পর্শকাতর অনুসঙ্গ। আর সেজন্য গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ও আহমেদ শাহ মাসুদ উভয়েই ইখওয়ানের আদর্শ লালন করলেও জাতিগত বিভেদ তাদের একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। রাব্বানি-মাসুদদের জামায়াত যখন মডারেট হতে হতে গা উজাড়ের দশা, তখনও ইখওয়ানের পুরোনো আদর্শেই অটল ছিলেন হেকমতিয়ার। এরপর জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে তিনি গড়ে তোলেন 'হিজব-ই ইসলাম'। আফগান জামায়াতের ওপর আস্থা হারিয়ে হিজব-ই ইসলামকে সমর্থন দেয় পাকিস্তান জামায়াত, এমনকি একই কাজ করে মাতৃসংগঠন ইখওয়ানও।

তালেবানের দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম বড়ো কারণ জনসমর্থন ও অদম্য মনোবল। আর তা সম্ভব হয়েছে তৃণমূলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারার কারণে। বাইরে থেকে অনেকেই মনে করেন; তালেবানের জনসমর্থন একদমই নগণ্য। নেহায়েত অস্ত্র আর গায়ের জোরেই দেশ দখল করেছে তারা। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থাদৃষ্টে এ ধারণায় পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপনের জো নেই। যেহেতু তালেবানের উত্থান হয়েছে পশতুন এলাকার মাদরাসাগুলোতে, কাজেই শুরু থেকেই পশতুনদের সহমর্মিতা ও সমর্থন পেয়ে এসেছে তারা। আফগানিস্তানের ৪২ শতাংশেরও বেশি মানুষ পশতুন। তার মানে দেশের অভ্যন্তরে তাদের বড়ো একটা সমর্থকগোষ্ঠী আছে। এখন তো তাজিক-উজবেকদের মধ্যেও তালেবানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। এই জনসমর্থন আর শৃঙ্খলা না থাকলে আমেরিকার কোটি কোটি ডলারের আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত একটি বাহিনীকে কেবল পুরোনো কালাশনিকভ রাইফেল দিয়ে বিধ্বস্ত করা কল্পনাতীত ব্যাপার।

অতীতের রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কট্টরপন্থা থেকে বেরিয়ে গণমুখী হওয়ার চেষ্টা করছে তালেবান; যোগাযোগ বাড়াতে চাইছে বহির্বিশ্বের সাথে। তাদের নেতা মোল্লা আবদুল গনি বারাদার 'কীভাবে মানুষের মন জয় করা যায়' নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন। সেই পুস্তিকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তালেবানের তৃণমূল পর্যায়ে। কাবুল পুনর্দখলের আগে তালেবান যেসব এলাকা জয় করেছিল, সেখানেই নিজস্ব সরকার কায়েম করেছিল তারা। এ ছাড়া অপরাধীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে তারা ছিল অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত। সাধারণ আফগানদের মধ্যে তালেবানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ার এটাও অন্যতম এক কারণ। এভাবে দ্রুত বিচারের সংস্কৃতি চালু হওয়ার কারণে তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় এখন চুরি, ছিনতাইয়ের মতো ছোটোখাটো অপরাধ একদমই কমে গিয়েছে। এজন্য সমাজের এলিট গোষ্ঠী ছাড়া বাদবাকি সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ছে তাদের ওপর। আর এটাকে পুঁজি করেই রাজনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছে তালেবান।

তালেবান যোদ্ধারা বিদেশি শক্তির প্রতি ঘৃণাবাদকে কাজে লাগিয়ে আফগান সেনাদের মনোবল ধসিয়ে দিয়েছে। তারা আফগান সরকার ও তাদের সেনাবাহিনীকে জনগণের কাছে উপস্থাপন করেছে আমেরিকা ও ন্যাটোর দোসর হিসেবে। জনগণের পাশাপাশি সাধারণ সেনাদের অনেকেই তা বিশ্বাস করেছে। ফলে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়ার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে তারা।

কৌশল হিসেবে এই মাইন্ড গেমটি দারুণ কার্যকর ফল বয়ে এনেছে তালেবান যোদ্ধাদের জন্য। এজন্য নিতান্ত সাধারণ অস্ত্র নিয়ে তারা যেখানেই হামলা চালিয়েছে, আধুনিক সব অস্ত্র ও সামরিক যান ফেলে পালিয়ে গেছে আফগান সেনারা। হেরাত, কান্দাহার, গজনি, জালালাবাদ, মাজার-ই শরিফ; এমনকি কাবুলেও তাদের খুব একটা গুলি ছোড়ার দরকার পড়েনি। উলটো দলে দলে অস্ত্র ও পোশাক ফেলে আত্মসমর্পণ করেছে সাধারণ সৈনিকরা। তালেবানের এই রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের কারণেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে মার্কিন মদদপুষ্ট কাবুল প্রশাসন। আফগান সেনাবাহিনীর দ্রুত ভেঙে পড়ার আরেকটি কারণ তাদের সামরিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। আধুনিক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হলেও আহমেদ শাহ মাসুদদের মতো দক্ষ সেনানায়ক তারা পায়নি। ফলে পতন ঘনিয়ে এসেছে কল্পনাতীত দ্রুততায়।

সামরিক বিজয়ের পাশাপাশি কূটনীতিতেও সফল তালেবান। কাতারের দোহায় আশরাফ গনি সরকারকে পাশ কাটিয়ে আমেরিকা ও তালেবানের মধ্যে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার-সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়েছে, ২০০১ সালে কাবুল ছাড়ার পর এটিই ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো বিজয়। কারণ, চুক্তিটি তালেবানকে একরকম বৈধতাই দিয়ে দেয়। ফলে আমেরিকার খাতায় তালেবান এখন আর কোনো জঙ্গি সংগঠন নয়। এজন্য তালেবান প্রশ্নে পশ্চিমা মিডিয়া, রাজনীতিক ও বিশ্লেষকদের ভাষা ও শব্দচয়ন নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। যাদের একসময় সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বলে আখ্যা দিত, সেই তালেবানকেই এখন আফগানিস্তানের প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মেনে নিয়েছে তারা।

২০২১ সালের ১৫ই আগস্ট চারদিক ঘিরে ফেলে কাবুলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তালেবান যোদ্ধারা। যুদ্ধে এটা পুরোনো কৌশল বটে, তবে এর কার্যকারিতা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। ইতিহাস এই বিজয়কে মনে রাখবে। কারণ, একটা রাজধানী শহর তারা দখল করতে পেরেছে কোনো রকম প্রাণহানি ও রক্তপাত ছাড়াই। নিঃসন্দেহে এটা সাম্প্রতিক রাজনীতির ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত!

আফগানিস্তানের প্রধান শহরগুলো হলো কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, মাজার-ই শরিফ, জালালাবাদ ও কুন্দুজ। আর জাতিগত গোষ্ঠীগুলো হলো—পশতুন, তাজিক, হাজারা, উজবেক, আইমাক, তুর্কমেন, বালুচ, গুজ্জর, আরব, ব্রাহুই, কিজিলবাশ, পাশাই, কিরগিজ, সাদাত, পামিরি প্রভৃতি। আফগানিস্তানের মেরুদণ্ড তার এই উপজাতিরা। তবে সংখ্যার বিচারে পশতুন তথা পাঠানদের সংখ্যাই বেশি।

আর প্রধানত এই সংখ্যাগুরু পশতুনদের নিয়েই গড়ে উঠেছে তালেবান। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশ থেকে আসা কিছু ভাড়াটে যোদ্ধাও যুক্ত হয়েছে তাদের সাথে। এদের অনেকেই নিয়মিত বেতনে কাজ করে। তাদের আয়ের উৎস নিয়েও আছে নানা প্রশ্ন।

বিশাল অঙ্কের যুদ্ধব্যয় ও ক্ষয়-ক্ষতি বিবেচনায় আফগানিস্তানে দীর্ঘ ২০ বছরের সংসার গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা। নিজ দেশ থেকে বহুদূরের এক পার্বত্য ভূখণ্ডে একটা পুতুল সরকার বসিয়ে দীর্ঘ দুই দশক বেহুদা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ব্যতীত আমেরিকার সত্যিকার অর্থে কোনো অর্জন নেই। কাবুলে তারা একটা সরকার বসিয়েছিল বটে, তার পুলিশ এবং সেনাবাহিনীও ছিল। কিন্তু সেই সরকারে যা ছিল না, তা হলো শৃঙ্খলা ও মনোবল। আমেরিকার সহায়তা ছিল বলেই তালেবানকে এতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল এই বিশৃঙ্খল আর্মি। ফলে মার্কিনিরা আজ যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, কাবুলের জন্য তখন তালেবান ভিন্ন কোনো অভিভাবকই আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তালেবানের হাতেই যদি সব ছেড়ে যেতে হবে, তাহলে ২০ বছর ধরে জারি রাখা লড়াইয়ের বৈধতা থাকল কই? অবশ্য আমেরিকা এখন আর আফগান যুদ্ধের বৈধতা-অবৈধতার তর্ককে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সেনাদের ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার যে চাপ ভেতর থেকে আসছিল, গোড়া থেকে সেই চাপ আফগান যুদ্ধেও ছিল। আপাতত সেদিক থেকেই কিছুটা স্বস্তি পেতে চায় আমেরিকা। কিন্তু সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা কি তালেবানে আছে? অতীত অবশ্য সেই সাক্ষ্য দেয় না। প্রথম শাসনে একলাই হেঁটেছে তারা। পুনরায় সেই 'একলা চলো' নীতি বজায় থাকলে তা হবে সাধারণ আফগানদের জন্য সমূহ বিপদের কারণ।

# আফগানিস্তান সাম্রাজ্যবাদীদের গোরস্থান

'যদি কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে শায়েস্তা করতে চাও, তাকে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দাও'—কেউ একজন এ রকম একটা কথা লিখে গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দেয়ালে। সময়টা তখন ২০০৬। ততদিনে আফগানিস্তানে আমেরিকাপন্থি সরকার বসেছে, সাদ্দাম শাসিত বাথ পার্টির পতন ঘটেছে ইরাকে। চারিদিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সভা-সেমিনারের জয় জয়কার। বক্তারাও বারবার বলে চলেছেন—'সাম্রাজ্যবাদই সব সন্ত্রাসের গোড়া!'

সমুদ্রবন্দরবিহীন আফগানিস্তানকে সন্তানের মতো আগলে রেখেছে হিন্দুকুশ পর্বতমালা। পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে যোগাযোগের জন্য যেদিক দিয়ে মহাসড়ক তৈরি করা হয়েছে, সেই সংযোগস্থলে এসে মিলেছে তিনটি পর্বতমালা—কারাকোরাম, হিমালয় আর হিন্দুকুশ। মধ্য এশিয়া কিংবা পারস্য ভূখণ্ড ছুঁয়ে এই আফগান ভূমি ধরেই বহু বিদেশি শাসক আক্রমণ করেছে ভারতবর্ষ; শাসন করে গেছে শতকের পর শতক ধরে। কিন্তু তাদের কেউ-ই আফগানিস্তানে থিতু হতে পারেননি। এ তালিকায় মোঘলরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন পারসিক ও গ্রিকরা। আফগান ভূখণ্ডে টিকতে পারেনি ইতিহাসের কুখ্যাত খুনি চেঙ্গিস খানের মোঙ্গলবাহিনীও।

৯/১১ হামলায় তালেবানের প্রকৃত দায় কতটুকু—তার পূর্ণাঙ্গ সুরাহা না হলেও বুশের ঘৃণার আগুনে ভস্ম হয়ে যায় আফগানিস্তান। আমেরিকা ও ন্যাটোর যৌথ আকাশ হামলায় ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ে তালেবান। কিন্তু কখনোই তারা রণাঙ্গন ছাড়েনি, এক মুহূর্তের জন্যও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি আফগানিস্তানের রাজনীতি থেকে। কাবুলে তালেবান যোদ্ধাদের বীরদর্পে প্রত্যাবর্তনই তার প্রমাণ বহন করে।

বিদেশি শক্তি কেন আফগানিস্তানে টিকতে পারে না? এই রহস্যের খোঁজ করা জরুরি। আফগানিস্তান দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। স্থলবেষ্টিত এই বিশাল ভূখণ্ডকে নিরাপত্তা দেয় পাথরাবৃত দৈত্যাকার পর্বতমালা। ফলে অধিকাংশ সময় সীমান্তের বড়ো একটা অংশই থাকে রক্ষীসেনা মুক্ত। মাসের পর মাস দলবল নিয়ে লুকিয়ে থাকার মতো পাহাড়-জঙ্গলের অভাব আফগানিস্তানে নেই। পাহাড় আর জঙ্গল মানেই সেখানে সাহসী আর লড়াকু যোদ্ধাদের আখড়া।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে অস্ত্র হাতে গাড়িতে করে ছুটছে একদল তালেবান যোদ্ধা। ছবি : রয়টার্স

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজরা মনে করল, রুশরা আফগান ভূমি কবজা করতে পারলে ভারত সীমান্তে চলে আসাটা তাদের জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। কারণ, আফগানিস্তান তখন ব্রিটিশ আর রুশ সাম্রাজ্যের বাফার স্টেট। ভারতবর্ষ যেখানে ব্রিটিশদের কাছে 'দুধেল গাই', সেখানে আচমকা রুশদের আগমন নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। সম্পদের ভাগাভাগি, লুটপাটের হিসাব-নিকাষ প্রভৃতি আশঙ্কায় আগ বাড়িয়ে আফগানিস্তান দখল করে নেয় ইংরেজ বাহিনী। ১৮৩৮ সালে কাবুল জয় করে প্রথমেই আফগানিস্তানের আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে সরিয়ে দেয় তারা। তার বদলে মসনদে বসানো হয় শাহ শুজা দুরানিকে। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা অবশ্য উপজাতিদের দাবড়ানি খেয়ে অচিরেই আফগানিস্তান ত্যাগ করে। আবারও ক্ষমতায় ফেরেন দোস্ত মুহাম্মাদ।

এ ঘটনার ১৪০ বছর পর আফগানদের হাতে মার খেয়েছে ব্রিটিশদের প্রতিপক্ষ সোভিয়েত রাশিয়া। আফগানদের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়ে কাবুলে ঢুকে পড়েছিল তারা। হাফিজউল্লাহ আমিনকে হত্যা করে তদস্থলে বসায় মদ্যপ বাবরাক কারমালকে। এক দশকের অর্থহীন লড়াই শেষে তারাও বুঝতে পারল, আফগানিস্তানে দখলদারত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। খালি হাতে ফিরে গেল হাজার হাজার সোভিয়েত সেনা। পেছনে রেখে গেলে গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল ভান্ডার। সেইসাথে শত শত কেজিবি এজেন্ট।

ইংরেজরা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়িয়েছে তিন থেকে চার শতক ধরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ অবধি তারাই ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী মাতব্বর। একচেটিয়াভাবে শাসন করেছে ভারতবর্ষ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, মিশর, সুদান, ঘানা, উগান্ডা, নাইজেরিয়া, কেনিয়াসহ দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। এর বাইরেও কিছু দেশ অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে শাসন করেছে এরা, যার জ্বলন্ত প্রমাণ ইরান। ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে একেবারে পায়ের ওপর পা তুলে; অথচ ভারতবর্ষের পাশের দেশ আফগানিস্তান ছিল সেদিক থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম।

তালেবানের কবজির জোর জানতে আমেরিকার সময় লেগেছে অন্তত ২০ বছর। দুই দশকের ব্যবধানে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে তারাই এখন সবচেয়ে অপ্রাসঙ্গিক ফোর্স। এই দীর্ঘ সময়ের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে তালেবানকে তো নির্মূল করা যায়নি, উলটো তাদের সাথেই করতে হয়েছে সমঝোতা। এটা নিশ্চিতভাবেই আমেরিকার জন্য নৈতিক পরাজয়। মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে এই সত্য এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তালেবানকে কথায় কথায় জঙ্গি বা সন্ত্রাস বলার অভ্যাস ত্যাগ করে তাদের ইতিবাচক শব্দচয়ন সেই অমোঘ বাস্তবতার দিকেই আমাদের মনোযোগী করে তোলে।

ভয়াবহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সাধারণ আফগানদের নিয়তির ওপর ছেড়ে দিয়ে গেছে মার্কিন প্রশাসন। পশ্চিমের মার্কিন মিত্ররাই এখন আফগানদের পরিণতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তটস্থ। অবশ্য পশ্চিমাদের কুম্ভীরাশ্রুর সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। তারা ইরাককে ধ্বংস করে দিয়েও কেঁদেছে; লিবিয়াকে রক্তে ভাসিয়ে মানবতার বুলি আওড়েছে বিশ্ব মিডিয়ায়।

এ ইস্যুতে বাইডেন প্রশাসনের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার। ২০ বছর আগে কাঁধে নেওয়া বোঝা আমেরিকানরা যেকোনো মূল্যে নামাতে চেয়েছে মাত্র। ২০২১ সালের পহেলা মে'র মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সেনা সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। যারা মনে করতেন বাইডেন ট্রাম্পের নীতিসমূহ পালটে দেবেন, তাদের খানিকটা অবাকই করলেন তিনি। এবারে মার্কিনিদের সুর আলাদা। তারা বলছে—যুক্তরাষ্ট্রে নেতা পালটায়, নীতি পালটায় না।

আফগানিস্তানে দীর্ঘ যুদ্ধ চালাতে আমেরিকার প্রায় আড়াই হাজার সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ২০ হাজারের বেশি। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, যে উদ্দেশ্যে মার্কিন সেনারা ২০০১ সালে সেখানে গিয়েছিল, তা পূরণ করতে পেরেছে তারা। ফলে এই প্রস্থান তাদের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক! মার্কিনিদের অনুপস্থিতি তালেবানকে শক্তিশালী করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, এতে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু কুড়ি বছরের যুদ্ধ আফগানদের ক্ষতিও করেছে বিস্তর। তবে তালেবান ও অন্যান্য আফগানদের সমন্বয়ে যদি একটি বহুপক্ষীয় সরকার গঠন সম্ভব হয়, তাহলেই কেবল এই ভগ্নদশা থেকে আফগানিস্তানের উত্তরণ ঘটতে পারে। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে আফগানিস্তানে সিভিল ওয়ারের ঝুঁকি থেকেই যাবে। সম্প্রতি এর আভাসও মিলেছে অল্পবিস্তর। আশরাফ গনি পালিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেশটির একেবারে শেষ প্রান্তে পাঞ্জশিরে বসে কয়েকজন নেতা তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্য পাঞ্জশিরও তালেবান দখলে নিয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহীরা হাল ছাড়েনি এখনও।

দশকের পর দশক গৃহযুদ্ধের পরও কখনো পরাস্ত হয়নি পাঞ্জশির। দেড় থেকে দুই লাখ মানুষের বসবাস এই উপত্যকায়। জাতিগতভাবে এদের প্রায় সবাই তাজিক। আশির দশকে সোভিয়েত বাহিনী এবং নব্বইয়ের দশকে তালেবানকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন এই পাঞ্জশিরের যোদ্ধারা। সেই প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন তাজিক নেতা প্রয়াত আফগান বীর আহমেদ শাহ মাসুদ। সোভিয়েত বিরোধী লড়াইয়ে বীরত্বের জন্য তাঁকে ডাকা হয় 'পাঞ্জশিরের সিংহ' নামে। আফগানদের নিকট তিনি 'জাতীয় বীর' হিসেবেও স্বীকৃত।
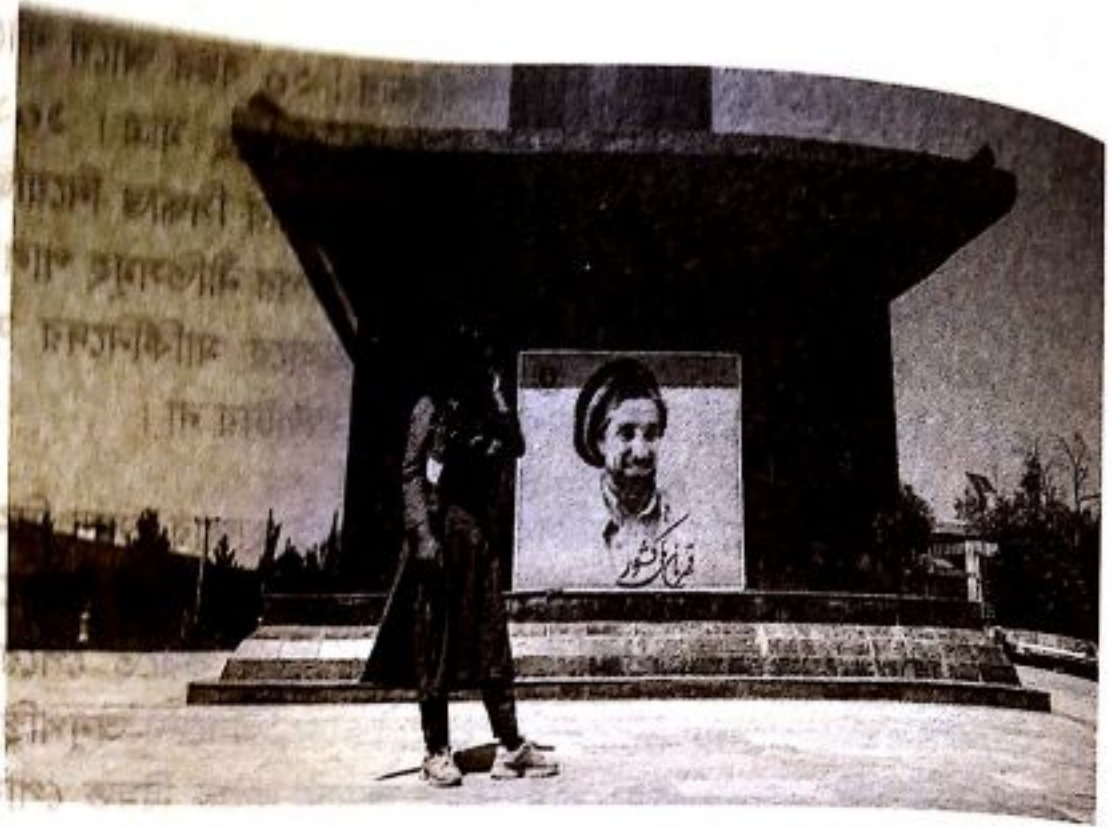
কাবুলে এক তালেবান যোদ্ধা। পেছনে আফগানিস্তানের 'জাতীয় বীর' খ্যাত শাহ আহমদ মাসুদের ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবি : *এএফপি*

দৃশ্যত তালেবানের পুনরুত্থানে সবচেয়ে বেশি খুশি চীন, আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো তারই প্রতিবেশী দেশ ভারত। মূলত এর মধ্যেও রয়েছে ভূ-রাজনৈতিক বোঝাপড়ার নানান হিসাব-নিকাশ। চীন এই আশঙ্কাও করছে যে, অচিরেই তালেবানের শিকারে পরিণত হতে পারে তাদের জিনজিয়াং[৬] পলিসি। কিন্তু ২০ বছর পর কাবুলে ফিরে প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই তালেবান বলেছে—তাদের মাটি প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। চীন এই বক্তব্যে আশাবাদী হতেই পারে। চীনের মতো নতুন সম্ভাবনা দেখছে রাশিয়া, তুরস্ক, কাতার আর তালেবানের পুরোনো মিত্র পাকিস্তানও। এখন তালেবানের সামনে দুটি পথ খোলা। হয় তারা সব জাতিগোষ্ঠীকে এক করে সামনে এগোবে, নতুবা আগের মতোই একলা হাঁটবে। তবে ইতিহাস সাক্ষী, দ্বিতীয় পথে রক্তই ঝরবে কেবল।

---

[৬] জিনজিয়াং চীনের একটি প্রদেশ। উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলের আগের নাম 'পূর্ব তুর্কিস্তান'। সেটি পরিবর্তন করে এ অঞ্চলকে জিনজিয়াং নাম দিয়েছে চীন সরকার। এখানে মুসলমানদের ধর্ম-কর্মের কোনো স্বাধীনতা নেই। ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলের প্রায় ১০ লাখ উইঘুর নর-নারীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে ইন্টার্নমেন্ট ক্যাম্পে। চীন সরকার এ বন্দি শিবিরের নাম দিয়েছে 'চরিত্র সংশোধনাগার'। মূলত এই সুন্দর নামের ছদ্মাবরণে উইঘুর মুসলমানদের ওপর চরম অত্যাচার, নির্যাতন ও পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে চীন। আন্তর্জাতিক মিডিয়া একে বলছে রয়ে-সয়ে গণহত্যা।

# হিটলার, হলোকাস্ট, জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদ

জার্মানির একনায়ক হিটলার জেলে বসে নিজের আত্মজীবনী লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন *মাইন ক্যাম্ফ*, বাংলায়—*আমার সংগ্রাম*। জার্মানি তখন ভয়াবহ এক বিপদের দ্বারপ্রান্তে। উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপদ। কথিত আছে, হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হওয়ার পর প্রত্যেক নবদম্পতিকে বইটি 'গিফট' করা হতো। হিটলারের চোখে জার্মানির আপদ ছিল দুটি—কমিউনিজম আর জুডাইজম। তিনি বিশ্বাস করতেন, দুনিয়ার সব খারাপের মূলে আছে ইহুদিরা। বইটির প্রতিটি পাতা ইহুদি ও কমিউনিস্টদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও জাতি বিদ্বেষে ঠাসা। রাষ্ট্রমাত্রই চায় তার রাজনৈতিক দর্শন তৃণমূলে ছড়িয়ে পড়ুক। মানুষ রাষ্ট্রের মতো করেই সবকিছু ভাবুক। আর যদি সেই রাষ্ট্রদর্শন হয় জাতীয়তাবাদ, তাহলে তাকে ফ্যাসিবাদে রূপ দেওয়া তো খুবই সহজ। একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সর্বস্তরে তার চিন্তা-দর্শন ছড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তেই ফ্যাসিবাদী রূপ ধারণ করতে পারে। এজন্য বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই, আমজনতার বড়ো একটা অংশ রাষ্ট্রের মতো করে ভাবলেই হলো। জার্মানি আর ইতালিতে এই কৌশলটিই অবলম্বন করেছিল হিটলার-মুসোলিনি চক্র।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে সেই ফ্যাসিবাদের ভয়ংকর রূপ দেখেছিল বিশ্ব। হিটলারের হাতে মারা পড়েছিল লাখ লাখ ইহুদি, কমিউনিস্ট আর জিপসি। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে বলা হয় 'হলোকাস্ট'। সেই নারকীয় হলোকাস্ট থেমে গেছে, নামকাওয়াস্তে হলেও বিদায় নিয়েছে ফ্যাসিবাদ; কিন্তু যুদ্ধ থামেনি। সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের রেষারেষি অচিরেই ইউরোপকে বিভক্ত করে ফেলল পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে। পূর্ব ইউরোপের মোড়ল হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর পশ্চিমের দেশগুলো হাঁটল গণতন্ত্রের পথে, নেতৃত্বে থাকল যুক্তরাষ্ট্র।

এভাবেই দুই পরাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের[৭] শুরু। কালক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের মধ্য দিয়ে সেই ঠান্ডা লড়াইও কাগজে-কলমে বিদায় নিয়েছে। এখন নতুন অভিশাপ নিয়ে হাজির হয়েছে প্রক্সিওয়ার[৮]। এ যেন নতুন বোতলে পুরোনো মদ!

[৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার টানাপোড়েনকে বলা হয় স্নায়ুযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাজ্য ও জার্মানিকে পেছনে ফেলে নতুন দুটি বৃহৎ শক্তি দাঁড়িয়ে যায়। একটি যুক্তরাষ্ট্র, অপরটি সোভিয়েত ইউনিয়ন। লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো মার্কিন ব্লকে যোগ দেয়, আর পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত কর্তৃত্ব। পরবর্তী চার দশক এই দুই মহাশক্তি সারা বিশ্বে ছক কষে যে অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়েছিল; তাই কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধ বলে পরিচিত। যেহেতু দুই দেশের হাতেই পরমাণু অস্ত্র ছিল, তাই সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকিতে যায়নি তারা। পরোক্ষ যুদ্ধই ছিল তাদের একমাত্র কৌশল। যেমন : ১৯৬২ সালের কিউবা সংকট, কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং আফগান গৃহযুদ্ধ।

[৮] প্রক্সিওয়ার বলতে সাধারণত দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতময় একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে কোনো পক্ষ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে না এবং অন্যের প্রতি প্রকাশ্যে শত্রুতাও স্বীকার করে না। তাদের স্বার্থরক্ষায় লড়াই করে ছোটো ছোটো রাষ্ট্র বা মিলিশিয়া বাহিনী। বর্তমানে ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, সুদান প্রক্সিযুদ্ধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দেশগুলোতে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, মিশর, তুরস্ক, আরব আমিরাত, কাতার, ইজরাইল, ইরান, যুক্তরাজ্য প্রক্সি লড়াইয়ে লিপ্ত আছে। মূলত স্নায়ুযুদ্ধের সাথে এর বড়ো কোনো পার্থক্য নেই। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই স্নায়ুযুদ্ধ শব্দটি তার গুরুত্ব হারায়।

# বণিকের ছদ্মবেশে পারস্যে ইউরোপের গুপ্তচর

পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে ক্লান্ত সূর্য। পরিযায়ী পাখির দল ছুটে যাচ্ছে সাইবেরিয়ার দিকে। দক্ষিণে শীত কাটিয়ে নীড়ে ফিরছে ওরা। এমনই এক শান্ত বিকেলে মাতাল বাতাসের ধাক্কায় শূন্যে লাফিয়ে ওঠা পানিকে দুই দিকে সরিয়ে পারস্যের বন্দরে ধেয়ে আসছে অতিকায় এক বাণিজ্য জাহাজ। রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে সেটি থেমে গেল বন্দরের জেটিতে। ততক্ষণে সূর্য হারিয়ে গেছে উচ্ছল সমুদ্রের শেষ প্রান্তে। চারিদিকে হাতছানি দিচ্ছে সান্ধ্যরাতের ছায়া। এ জাহাজ শ্বেতাঙ্গ বণিকদের। তারা ইউরোপ থেকে পারস্যে এসেছে ব্যাবসার কাজে। অবশ্য পারস্যে তারাই প্রথম ইউরোপীয় নন। বসবাস ও ব্যাবসাসূত্রে আগে থেকেই শ্বেতাঙ্গদের আনাগোনা আছে এখানে। এই জাহাজে করে আসা বণিকদের সঙ্গী হয়েছে ছদ্মবেশী একদল গুপ্তচর। বণিকরা পারস্যের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে গেছে। কেউ ফার্সের পথ ধরেছে, কেউ গিয়েছে কেরমানশাহে। কারও গন্তব্য আবার সৌন্দর্যের নগরী ইসফাহান। বণিকদের ভিড়ে মিশে যাওয়া গুপ্তচরদের নেতৃত্বে আছেন এজেন্ট সিডনি রেইলি। দলটি পারস্যে এসেই পাহাড়ে-জঙ্গলে, পুরোনো সব উপাসনালয়ের আশপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই শ্বেতাঙ্গ গুপ্তচরের দল যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তিনি একজন ধর্মযাজক। এই ধর্মযাজক বড়ো হয়েছেন ব্রিটেনে, যদিও তার পূর্বপুরুষদের বসতভিটা অস্ট্রেলিয়ায়। লন্ডনে যত নামি-দামি ব্যবসায়ী আছে, তাদের অনেকের সাথেই তার ওঠাবসা। ব্রিটিশ সরকারের অ্যাসাইনমেন্ট—যে করেই হোক, তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কারণ, এর সাথে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন জড়িত!

ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান আর ফরাসিরাও বসে নেই। তারা 'সমুদ্রের রাজা' ব্রিটেনকে খেদিয়ে বিশ্ব পরাশক্তি হতে চায়। শত্রুপক্ষের সেই উচ্চাভিলাষ ঠেকাতেই এজেন্ট রেইলির পারস্য মিশন। কিন্তু একজন ধর্মযাজকের কাছে সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার কী জাদুর কাঠি থাকতে পারে?

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন 'ইরান' নামে কোনো দেশের অস্তিত্ব ছিল না পৃথিবীতে। এর নাম ছিল পারস্য, পশ্চিমাদের ভাষায় যা 'পারসিয়া'। দুনিয়াতে যদি পাঁচটি শক্তিধর সাম্রাজ্যের নাম নিতে হয়, পারস্যকে বাদ দিয়ে সে তালিকা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। পুরোনো সব সভ্যতার প্রসঙ্গ এলেও আসবে পারস্যের নাম। সম্রাট সাইরাস দ্যা গ্রেটের হাতে গড়া পারস্য সাম্রাজ্যই পৃথিবীর প্রথম পরাশক্তি। অনেকের মতে, তিনিই পৃথিবীর প্রথম সম্রাট। সাসানিদ আমলে ইরাক, কুয়েত টপকে নীলনদের দেশ মিশরকেও স্পর্শ করেছিল এই সাম্রাজ্য।

# ইরানের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা দেয়াল 'জাগ্রোস'

ইরানের প্রতিরক্ষায় দৈত্যাকার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাগ্রোস পর্বতমালা। পর্বত পেরোলেই পারস্য সাম্রাজ্য। অতীতের রোমান সাম্রাজ্য এসে এখানেই থমকে গিয়েছিল। জাগ্রোস এই দুই সাম্রাজ্যকে দড়িতে বেঁধেছে এখানে। ফলে এটা ছিল এক অর্থে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী বাফার জোন। তারও অনেক পরে রুশ আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাঝে এ রকম বাফার স্টেট হিসেবে কাজ করেছে কাশ্মীর, আফগানিস্তান। অতীতে দুই ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যকার সংঘাত এড়ানোর জন্য উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে একরকম মুক্তভূমি ঘোষণা করা হতো, যা কোনো পক্ষই দখল করত না। সেটাকেই বলা হয় বাফার স্টেট বা বাফার জোন। সেলজুকরাও[1] বাইজেন্টাইন সীমান্তে এ রকম একটা বাফার জোন বানিয়ে তার নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল অঘুজ তুর্কিদের হাতে। এই যাযাবরদেরই একটা দল পরবর্তী সময়ে গড়ে তুলেছিল উসমানীয় সালতানাত।

জাগ্রোসকে মাঝে রেখে দুই পাশেই বহু বছর যাবৎ আলাদা ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতির চর্চা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম থেকে প্রথমে রোমানদের দলছুট অংশ—

[1] সেলজুক হলো একটি সুন্নি মুসলিম সাম্রাজ্য, যারা ১০ থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য শাসন করেছে। এই সাম্রাজ্যের স্থপতি সুলতান তুঘরিল বেগ। তিনি জাতিতে ছিলেন অঘুজ তুর্কি। বারেবারে মোঙ্গল আর বাইজেন্টাইনদের হামলা ও নিজেদের মধ্যকার হানাহানিতে একসময় এই সাম্রাজ্য ভেঙে ছোটো ছোটো আমিরাতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে এই সাম্রাজ্য উসমানীয় ও মোঘলদের হাতে চলে যায়।

বাইজেন্টাইনদের[১০] সাথে প্রকৃতি ও অগ্নি উপাসক এবং পরে সুন্নিপ্রধান উসমানীয়দের[১১] বিপরীতে সাফাভিদের[১২] হাত ধরে জাগ্রোসের পূর্বে চর্চিত ও বিকশিত হয়েছে শিয়া মতবাদ। অবশ্য সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর এখন পশ্চিমের দিকে, বিশেষত ইরাকে একচ্ছত্র সুন্নি শাসন আর নেই। তবে পূর্বাংশে তথা ইরানে শিয়া ইসলামের চর্চা বাড়ছে ক্রমান্বয়ে। তাদের হাত ধরেই এসেছে ১৯৭৯ সালের বিপ্লব, ইরানে উৎখাত হয়েছে ২৫০০ বছরের পুরোনো পারস্য রাজতন্ত্র। বিপ্লবের পর নতুন যৌবন পায় সাফাভি সাম্রাজ্যের হাতে পুষ্ট হওয়া শিয়া ধর্মতত্ত্ব। এই ধর্মবিশ্বাস বহু বছর ধরে ভোগান্তিতে রেখেছে প্রতিবেশী আরবদের।

পারস্য উপসাগরের শীতল হাওয়া সুউচ্চ জাগ্রোস পর্বতের দেয়াল বেয়ে মাইলের পর মাইল সবুজ অরণ্য ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ইরানের মূল ভূখণ্ডে। ত্রয়োদশ শতকে ইতিহাস কুখ্যাত ভয়ংকর 'খুনে শিকারি' মঙ্গোলদের পা পড়েছিল এই জাগ্রোসের তলায়। তারও বহু আগে এখানে পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। জাগ্রোসের নিচে এসে আশ্রয় নিয়েছিল একদল বেদুইন।

---

[১০] ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে পড়া পূর্ব অংশটিকেই বলা হয় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য টিকেছিল ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত। সে বছর উসমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর হাতে তাদের রাজধানী কন্সট্যান্টিনোপলের পতন হয়।

[১১] উসমানীয় সালতানাত পশ্চিমাদের কাছে অটোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন উসমান গাজির পিতা আরতুগ্রুল গাজি। ১২৯৯ সালে অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত আরতুগ্রুল গাজি সেলজুক কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ার দায়িত্ব পান। প্রথম দিকে সেলজুকদের প্রতি অনুগত থাকলেও একসময় তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ধীরে ধীরে একটি বড়ো সালতানাত গড়ে তোলেন। একসময় এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশে বিস্তৃত হয় উসমানীয় সাম্রাজ্য। ৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সাম্রাজ্য টিকেছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান তুরস্ক অটোমান সাম্রাজ্যেরই উত্তরসূরি।

[১২] পারস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী রাজবংশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি সাফাভি সাম্রাজ্য। সপ্তম শতকে মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের পর এটি অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই রাজবংশ ইসনা আসারিয়া তথা ১২ ইমামপন্থি শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৫০১ থেকে শুরু হয়ে টানা ১৭২২ সাল পর্যন্ত সাফাভি শাসন চলে। তবে পরবর্তী সময়ে আরও একবার ১৭২৯ থেকে ১৭৩৬ সাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্তকালের জন্য তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। আধুনিক ইরান, আজারবাইজান, বাহরাইন ও আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, উত্তর ককেসাস, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত, আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানের বিরাট অংশ সাফাভি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুন্নিপ্রধান উসমানীয় ও মুঘল সাম্রাজ্য ছিল এই সাম্রাজ্যের শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী।

কৃষিকর্মে অদক্ষ হওয়ায় তারা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল পশুপালন। তৃণভূমির খোঁজে ভেড়ার পাল নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়াত তারা। এমনই এক যাযাবর পরিবারে বেড়ে ওঠা যুবক সাইরাস। ভেড়ার পালের রাখাল সাইরাস গোষ্ঠীপ্রধানের পদ ভাগিয়ে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকেন, একদিন তিনিই হবেন দুনিয়ার বাদশাহ্। সত্যি সত্যি ক্ষমতায় বসে পারস্যের মানচিত্র বদলে দিয়েছিলেন তিনি। প্রথমে নানার সাম্রাজ্য মিদিয়া, এরপর লিডিয়া এমনকি ব্যাবিলনও নিয়ে নেন পায়ের তলায়; গড়ে তুললেন শক্তিশালী আকামেনিদ সাম্রাজ্য। ইতিহাসের প্রথম যে পারস্য সাম্রাজ্যের কথা আমরা জানি, এটিই সেই আকামেনিদ সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য গ্রাস করেছিল আজকের আফগানিস্তানকেও। পারস্যের বাদশাহি চেয়ারে বসে সাইরাস নিছকই আর সম্রাট থাকেননি; ইতিহাস শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে তাকে। ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ, সংস্কৃতি আর জাতিসত্তার মানুষকে তিনি এক ছাদের নিচে নিয়ে এসেছিলেন। সেই জৌলুসেরও অবসান হয়েছিল অবশেষে। এরপর শাসনক্ষমতায় আসে সেলুসিডরা এরপর পার্থিয়ানরা। অতঃপর সাসানিদ, সাফাভি আর কাজারদের হাত ধরে আজকের ইরান।

# তৈমুরের দরবারে বুলবুল-ই সিরাজ

'কালো তিল কপোলে সেই সুন্দরী,
আপন হাতে ছুঁলে হৃদয় আমার,
বোখারা তো কোন ছার, সমরখন্দও
খুশি হয়ে তাকে দেবো উপহার।'

রক্ত ঝরানো যাদের নেশা, হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের নীতি। মঙ্গোলদের কথাই ধরা যাক; ভর দুপুরের তেতে ওঠা রোদ, দৈত্যের মতো ধেয়ে আসা বালুঝড় কিংবা হিমাচল থেকে উড়ে আসা হু হু হাওয়ার স্পর্শ মাড়িয়ে তারা ছুটে গেছে আফ্রিকা-ইউরোপের প্রান্তে। ১২৬০ সালে মিশরের **মামলুকদের**[১৩] হাতে মার খাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো শক্তি মোঙ্গলদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। বলতে পারেনি—'আমরা তোদের রুখে দিলাম!'

বিশাল চারণভূমি ডিঙিয়ে ক্ষিপ্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে রুদ্ধশ্বাসে শত সহস্র কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া মোঙ্গলদের বলা যেতে পারে খুনে অভিযাত্রীর দল।

---

[১৩] মিশরের মামলুকরা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মামলুক শাসন কায়েম করেছিল। কিপচাক ও অন্যান্য অনেক তুর্কি জনগোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত দাস সৈনিকদের মাধ্যমে এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মামলুকরা সরাসরি সুলতানের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিতেন। সুলতান তাদের জন্য নীলনদের রাওজা দ্বীপে একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে দেন। এখানে মামলুকরা সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ধর্মীয় ও আদর্শিক দীক্ষাও গ্রহণ করত। সময়ের সাথে সাথে তারা বিভিন্ন মুসলিম সমাজে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে লেভান্ত, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাগিয়ে নেয় সুলতানের পদ। ১২৬০ সালে আইন জালুতের যুদ্ধে মামলুক সালতানাত মোঙ্গল বাহিনীকে পরাজিত করে।

শত্রুর রক্তের মধ্যেই এরা আজীবন খুঁজে গেছে নিজেদের টিকে থাকার শক্তি। কিন্তু রক্ত ঝরিয়ে ভূমির দখল নিলেই কী আর শাসক হওয়া যায়!

মঙ্গোলরা হায়েনার মতো ভিন্নজাতির লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দখল করেছে একের পর এক জনপদ, বিস্তীর্ণ চারণভূমি। কিন্তু বিশাল ভূখণ্ডের মালিকানা তো আর শাসক হওয়ার শর্ত নয়। মঙ্গোলরা তাই না হতে পেরেছে শাসক, না ঘটাতে পেরেছে কোনো সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মুঘলরা। ভারতবর্ষের মানুষের খাদ্যাভ্যাস আর লাইফস্টাইলই তারা বদলে দিয়েছে ৩০০ বছরের শাসনে।

মঙ্গোলদের সাথে মিল আছে মধ্য এশিয়ার ত্রাস তৈমুরের। বিদেশিদের কেউ তাকে বলে তাইমুর, কেউ-বা বলে তিমুরলেইন। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিসের মতো তৈমুরেরও ছিল রক্ত আর সাম্রাজ্যের নেশা। তার অস্থির স্বভাব আর আগ্রাসী তলোয়ার কখনোই প্রতিবেশী শাসকদের থিতু হতে দেয়নি। এই যুদ্ধবাজ তৈমুরের রাজধানী ছিল সমরখন্দ। এটি বর্তমান উজবেকিস্তানের একটি শহর। মধ্য এশিয়া থেকে বের হয়ে আসা উন্মত্ত খুন তৈমুরের তলোয়ার রক্ত ঝরিয়েছে তুর্কমেন, আরব, পারসিয়ান আর উসমানীয়দের। সেই তৈমুরের সাম্রাজ্যে বসেই প্রেয়সীর জন্য কবিতা লিখে ঝড় তুলে দিয়েছেন পারস্যের এক কবি—হাফিজ সিরাজি।

তাঁর পুরো নাম খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ হাফিজ-ই-সিরাজি। পারসিয়ানরা এই সুফি কবিকে আদর করে ডাকে 'বুলবুল-ই-সিরাজ'। কবি সিরাজ মধ্য এশিয়ার ঐতিহাসিক নগরী বোখারাকে গণনাতেই রাখেননি। বোখারা তো বটেই, প্রিয়তমার গালের তিলের জন্য তিনি ছেড়ে দিতে চেয়েছেন তৈমুরের সমরখন্দকেও। হাফিজ তাঁর প্রিয়তমাকে তৈমুর সাম্রাজ্যের রাজধানী দিয়ে দেবেন, সম্রাট তা মানবেন কেন? সুতরাং, কবিকে তলব করা হলো তৈমুরের দরবারে। রাজদরবারে কী জবাব দিয়েছিলেন বুলবুল-ই সিরাজ?

> 'মহান সম্রাট! আসলে আপনি ভুল শুনেছেন। কবিতায় "সমরখন্দ ও বোখারা"র পরিবর্তে হবে "দো মণ কন্দ ও সি খোর্মারা"। আমি তো প্রিয়ার গালের তিলের বদলে দুই মণ চিনি আর তিন মণ খেজুর দিতে চেয়েছি মাত্র!'

হাফিজ কি আসলেই তৈমুরকে এমন উত্তর দিয়েছিলেন? কারও কারও মতে, হাফিজ এই কথা বলেননি, তৈমুরের সামনে এমন কথা বলার সাহস মূলত কেউ-ই রাখতেন না। রাজদরবারে ক্ষমা চেয়ে নেন হাফিজ। তৈমুর খুশি হয়ে মূল্যবান উপহার আর অর্থকড়ি দেন তাঁকে। পারস্যের আরেক কবি শেখ সাদিকে নিয়েও আছে এমন অনেক মুখরোচক গল্প। শেখ সাদি, উমর খৈয়াম আর ফেরদৌসীর মতো অনেক রত্নকে গর্ভে ধরেছে পারস্য। তার বুকে ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে ইসফাহানের মতো নান্দনিক নগরী। ইসফাহান দেখলেই যেন পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্য দেখা হয়ে যায়। আর সেজন্যই তো বলা হয়—'শাহরে ইসফাহান, নেসফে জাহান।'

মুঘল সম্রাটদের মাতৃভূমি এই পারস্য। বাবর থেকে নাদির শাহ পর্যন্ত অনেক বিজেতা খাইবার পাস দিয়ে ভারতে এসে সাম্রাজ্য গড়েছেন। আবার কেউ কেউ এসে সম্পদ লুট করে ফিরে গেছেন নিজের দেশে। নাদির শাহ যাওয়ার সময় নিয়ে গেছেন ময়ূর সিংহাসন আর কোহিনুর হীরকখণ্ড। কিন্তু লুণ্ঠিত সম্পদ ভোগ করার ভাগ্য হয়নি তার। স্বদেশে ফেরার আগেই যাত্রাপথে খুন হয়েছেন আততায়ীর হাতে। সেই কোহিনুর এখন ব্রিটিশ রানির মাথায় শোভা পাচ্ছে। কিন্তু ময়ূর সিংহাসন কোথায়, সেই তথ্য আজও অজানা।

মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর জিন্দেগির বড়ো একটা অংশ বিয়ে-শাদি করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। হয়তো এটাই ছিল তার কাছে এক অ্যাডভেঞ্চার। এত বেশি পত্নী-উপপত্নীর বহর খোদ সম্রাটকেই বিভ্রাটে ফেলে দিত মাঝে মাঝে। সকালে ঘুম ভেঙে যে নারীকেই সামনে পেতেন, ভাবতেন—'আরে! এ তো আমারই স্ত্রী।' গিন্নির অভাব নেই আরবদেরও। প্রতিবেশী ইরানিদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটা থাকবে না, তা কী করে হয়? পাহলভি পরিবারের আগে কাজার রাজবংশ ১৫০ বছর ধরে পারস্য শাসন করেছে। তাদের কাছেও বিয়ে-শাদি ছিল ডাল-ভাত। কাজাররা কেন এত বিয়ে করতেন? বই-পত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই। কী সেই প্রয়োজনীয়তা?

ইরানের দুর্গম গ্রামগুলোতে ছিল জমিদারি শাসন। আবার আরবদের মতো গোত্রভিত্তিক শাসনও জারি ছিল কোথাও কোথাও। গোত্রপ্রধানের কথা ও কর্মকেই চূড়ান্ত আইন বলে গণ্য কার হতো সেখানে। সাধারণ জনতার মধ্যে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাবও ছিল বিস্তর। তাই রাজধানীর বাইরে সম্রাট ঠিকমতো

হুকুমত কায়েম করতে পারতেন না। মানুষের কাছে সম্রাটের চাইতে জমিদার কিংবা গোত্রপ্রধানের কথার গুরুত্ব ছিল বেশি। ফলে চাপ সামলাতে তারা স্থানীয় জমিদারদের হাতে অল্পবিস্তর ক্ষমতা ছেড়ে দিতেন। কিন্তু এই জমিদাররা বিগড়ে গেলেই বিপদ। তাই রাজ্যের শৃঙ্খলার স্বার্থে জমিদার ও রাজপরিবারের বন্ধন ছিল অত্যন্ত জরুরি। এজন্য প্রভাবশালী গোত্র ও জমিদারদের সাথে বিয়ের মাধ্যমে রক্তের সম্পর্ক গড়তেন পারস্য সম্রাটরা। এতে করে সম্রাটের প্রতি একটা অনুগত গোষ্ঠী গড়ে উঠত, সহজ হতো রাজ্য পরিচালনা। এ রকম বহুবিবাহের অবিশ্বাস্য রেকর্ড আছে ফতেহ আলি শাহের ঝুলিতে। প্রাদেশিক ক্ষমতাসীন পরিবারগুলোকে হাতে রাখতে শতশত বিয়ে করে সন্তানের স্রোত বইয়ে দেন কাজার বংশের এই সম্রাট। তবে তার তুলনায় নাসিরুদ্দিন শাহ ছিলেন তুলনামূলক ভদ্রলোক। তিনি বিয়ে করেছেন মাত্র ৭০টি!

পারস্যের পরিবর্তিত নাম এখন ইরান। দেশটিতে এখন আর রাজতন্ত্র নেই, রাজাও নেই। বিদায় নিয়েছে জমিদারি শাসন তথা সামন্তবাদও। কাজার শাসন পায়ে ঠেলে একজন জেনারেলের হাত ধরে এসেছিল পাহলভি শাসন। তাও দূর হয়েছে ১৯৭৯ সালের এক গণ আন্দোলনে। মুহাম্মাদ রেজা পাহলভিকে তাড়ানোর পর ইরানের ভাগ্য এখন ঝুলে আছে শিয়া মতাবলম্বী শীর্ষ নেতাদের হাতে।

# গুপ্তচররা ধর্মযাজককে খুঁজে পেয়েছেন

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট সিডনি রেইলি যে ধর্মযাজকের খোঁজে দলবল নিয়ে বেরিয়েছেন, অবশেষে পাওয়া গেছে তাকে। ধর্মযাজকের নাম উইলিয়াম নক্স ডা'আরসি। উইলিয়াম একই সঙ্গে ভূতত্ত্ববিদ ও প্রকৌশলী। ইতিহাস নিয়েও গভীর পড়াশোনা আছে তার। পারস্যের ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে এই ভূতত্ত্ববিদের মনে কোনো একভাবে ধারণা জন্মেছে—প্রাচীন পারস্যের অগ্নিদেবতা অরমুজের উপাসনালয় যেসব এলাকায় রয়েছে, হয়তো সেখানকার পাহাড়ে-জঙ্গলে মিলতে পারে তেলের প্রাকৃতিক ভান্ডার। উইলিয়ামের পারস্য মিশন সে কারণেই।

উইলিয়াম তেলের সন্ধানে পারস্যের বিস্তীর্ণ ভূমি চষে বেড়িয়েছেন। লন্ডনের কিছু ব্যাংক আগাম অর্থকড়িও দিয়েছে তাকে। কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেলেও উইলিয়াম কোনো সফলতা দেখাতে পারছেন না; ফলে তার পেছনে আর অর্থ লগ্নি করার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না ব্রিটিশ ব্যাংকগুলো। উইলিয়াম বারবার হতাশ হয়েছেন, কিন্তু পারস্য ছাড়েননি। রুশ-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হালুয়া-রুটির ভাগাভাগিতে পড়ে অনেক আগেই পারস্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল বিশ্ব অর্থনীতি থেকে। উনবিংশ শতকে এসে তারা বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়ায়। পারসিক জনশক্তির বাজার তৈরি হয় রাশিয়ায়। উত্তর পারস্যের মানুষ রাশিয়ার বাজারে কৃষিপণ্য আর শ্রমিক সরবরাহ করতে থাকে। আর দক্ষিণের ইসফাহান, ফার্স আর কেরমান শাহ থেকে ব্রিটিশ ভারতে রপ্তানি হতে থাকে কার্পেট এবং তোয়ালে। অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থনীতির চাকা সচল করে ফেলে পারস্য।

পারস্যের সম্পদে লালসা জাগে বিদেশিদের। সেই সম্পদ লুটে নিতে সবার আগে প্রয়োজন পারস্যে ঢোকার জলপথটিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া। কিন্তু কে আগে পারস্য উপসাগর নিয়ন্ত্রণে নেবে—তা নিয়ে শুরু হলো বিবাদ। ব্রিটিশরা মনে করল পারস্যের সম্পদে তাদের হক সবার থেকে বেশি। কারণ, জলদস্যুদের

কবল থেকে পারস্যে ঢোকার জলপথ নিরাপদ করতে তাদের দীর্ঘদিন লড়াই করতে হয়েছে সেখানে। শতশত ইংরেজকে জীবন দিতে হয়েছে, খরচ হয়েছে মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ। কিন্তু পারস্যের প্রতিবেশী রুশ সাম্রাজ্য কেন ঘরের দুয়ারে বিদেশি উৎপাত মানবে?

বিদেশিদের সরব উপস্থিতি নিয়ে পারস্যের সম্রাটও ছিলেন যথেষ্ট বিব্রত। কাজার রাজবংশ বিদেশি অর্থে আধুনিকায়নের পথ বেছে নিয়েছে সত্য, কিন্তু সেটার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্রাট চেয়েছিলেন রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে, যাতে বাইরের লোকদের উৎপাত কমানো যায়। কিন্তু কাজারদের প্রশাসনিক অদক্ষতা আর দুর্বল নীতির কারণেই নাক গলানোর সুযোগ পেয়েছে বিদেশিরা। রাজস্ব আদায়ে কাজাররা কার্যকর কোনো সিস্টেম গড়ে তুলতে পারেনি। রাজস্ব ছাড়া রাষ্ট্রের কোষাগার ভরবে কী দিয়ে? দেশ কীভাবে চলবে? সরকারি কর্মচারীদের বেতনই-বা হবে কী করে? ফলে প্রতিবছরই দেখা যেত, বাজেটে বড়ো অঙ্কের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

ব্যক্তির মতোই রাষ্ট্রের নিজের যখন কোনো অর্থ থাকে না, ধার-দেনা করে চলতে হয় তাকে। পারস্যেরও তা-ই হলো। কিন্তু এর ফলে পারসিকরা আটকে গেল দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে। এই চক্র ভেঙে দেওয়ার উপায় সামনে নিয়ে এলো বিদেশিরা, বিশেষ করে ইংরেজরা। ঋণের ভারে জর্জরিত কাজার বংশের সম্রাট নাসিরুদ্দিন ১৮৭২ সালে ব্যারন জুলিয়াস ডি রয়টার নামে এক ব্রিটিশ নাগরিককে পারস্যের খনি উন্নয়ন, রেল ও ট্রাম সড়ক নির্মাণ, মহাসড়ক আর শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার পূর্ণ অধিকার দিয়ে দিলেন। এর বিনিময়ে পারস্য সাম্রাজ্য পেল নগদ দুই লাখ ডলার। এ ছাড়াও চুক্তি হলো—প্রতি বছর ৬০ শতাংশ মুনাফা পাবে পারস্য। এ যেন বিদেশি শক্তির হাতে কোনো সাম্রাজ্যের পুরোপুরি আত্মসমর্পণ। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো জ্বালানি তেলের ভান্ডারে হাত পড়ে ব্রিটিশদের, পরবর্তী অর্ধশত বছর যারা অস্থির করে রেখেছিল পৃথিবীকে।

রয়টার যে বছর পারস্যের তেলখনি, মহাসড়ক, রেল ও ট্রাম সড়ক উন্নয়নের কন্ট্রাক্ট পান, তার দুই দশক পর আরেকটা ঘটনা ঘটে। মেজর তালবত নামের এক ইংরেজকে পারস্যে তামাক বেচা-কেনার পারমিট দেওয়া হয়। পারস্যে তখন দুই বিদেশি পরাশক্তির সহাবস্থান চলছে। ইংরেজদের পাশাপাশি আছে রুশরাও। এই দুই শক্তি রীতিমতো ভাগাভাগি করে লুটপাট করত পারস্যের সম্পদ। কিন্তু রুশরা যেহেতু পারস্যের প্রতিবেশী, তারা কখনোই চায়নি পারস্য ব্রিটিশদের হাতে একেবারেই জিম্মি হয়ে পড়ুক। কাজেই পারস্যকে ব্রিটিশমুখী পলিসি থেকে ফেরাতে

চেষ্টা করে তারা। অনেক চেষ্টার পর রুশরা শাহের এই দুইটি চুক্তিই বাতিল করাতে পেরেছিল বটে, কিন্তু চতুর ব্রিটিশরা তা পুষিয়ে নিয়েছিল অন্যভাবে।

শিগগিরই দক্ষিণ পারস্যে ব্রিটিশ কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোর আনাগোনা বেড়ে গেল। পারস্যের সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের ঠিকাদারি পেতে শুরু করে এসব কোম্পানি। অবকাঠামোগত উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাবও পড়ল পারস্যের অর্থনীতিতে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ল। ইসফাহান, বুশেহর, সুলতানাবাদ আর তাবরিজের কার্পেট ফ্যাক্টরিগুলোতে প্রচুর অর্থ লগ্নি করল ইংরেজরা। তবে সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে। কিছু ব্রিটিশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের অনুমতি দেওয়া হয় সেখানে। আর তখনই দৃশ্যপটে আসে একটি তেল কোম্পানি; যার নেপথ্যে ছিলেন সেই ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদ ও ধর্মযাজক উইলিয়াম।

বিংশ শতক ছুঁইছুঁই। পারস্যের সম্রাট তখন মোজাফফর উদ্দিন। পূর্বসূরিদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক বেশি উদার ও দিলখোলা লোক। তাঁর পরিকল্পনায় পারস্যের শহর আর বন্দরগুলো আধুনিক চকচকে হলো। রেলপথ আর শিল্পের বিকাশ ঘটাতে উইলিয়ামের শরণাপন্ন হলেন পারস্য সম্রাট। পারস্যকে সমৃদ্ধ করতে মোজাফফরের দরকার ছিল নগদ অর্থ, আর উইলিয়ামের প্রয়োজন ছিল পেট্রোলিয়াম অয়েল। পারস্যের শাহ অর্থের বিনিময়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পেট্রোলিয়াম খনি অনুসন্ধান করার প্রস্তাব দিলেন উইলিয়ামকে। এমনকি চাইলে যেকোনো সময় পেট্রোলিয়াম উত্তোলন এবং বিক্রিও করতে পারবে সে।

উইলিয়াম পারস্যকে ভালোভাবে জানতেন। তাই শাহের প্রস্তাবে অমত করেননি। সম্রাট নগদ পেলেন ২০ হাজার ডলার। এ ছাড়া, খনি থেকে পাওয়া পেট্রোলিয়াম বিক্রি করে বছরে যে অর্থ আসবে তারও ১৬ শতাংশ রয়্যালটি দেওয়া হবে পারস্য সম্রাটকে। এই চুক্তিটি সই হয় ১৯০১ সালে, যা ডা'আরসি কনসেশন নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে রুশ সীমান্তসংলগ্ন একটি প্রদেশ ছাড়া পুরো পারস্যেই একক অধিকার পেয়ে যায় উইলিয়ামের কোম্পানি। চুক্তির ৬ বছর পর ইরানকে নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছায় দুই মুরব্বিরাষ্ট্র ব্রিটেন ও রাশিয়া। কোনো ধরনের বিরোধে না জড়িয়ে তারা আপসে পারস্যকে লুটেপুটে খাবার সিদ্ধান্ত নেয়। উত্তর পারস্য আর ককেশাস অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণ পায় রাশিয়া; আর ব্রিটেনকে দেওয়া হয় পারস্য উপসাগর সংলগ্ন এলাকার দখলদারিত্ব। এভাবে কার্যত দুই ভিনদেশি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কলোনিতে পরিণত হয় পারস্য।

# পারস্যে তেলখনি আবিষ্কার

পারস্য সম্রাটের সাথে চুক্তির সাত বছর পর আজকের **খুজেস্তান**[১৪] প্রদেশে তেলখনি খুঁজে পায় উইলিয়ামের লোকজন। এই উইলিয়ামই প্রথম ব্যক্তি—যিনি পারস্য উপসাগরের উত্তরে, ইরানের মূল ভূখণ্ডে তেলের খনি খুঁজে পান। কিন্তু এই তেল যে দ্রততম সময় বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতি উলট-পালট করে দেবে, তা ধারণাও করতে পারেননি তিনি।

সিডনি রেইলির নেতৃত্বে যে গুপ্তচর দলটি পারস্যে আসেন, উইলিয়ামের সাথে তাদের দেখা হয় ১৯০৫ সালে। তারা উইলিয়ামকে একরকম ধোঁকা দিয়েই একটি কোম্পানির সাথে চুক্তিতে রাজি করায়। কোম্পানিটির নাম 'বার্মা অয়েল কোম্পানি'। তৎকালীণ বার্মা, বর্তমান মিয়ানমারে এই কোম্পানি তেল অনুসন্ধান করত। কিন্তু সেখানে বহুদিন ধরে কোনো তেলের খনি পায়নি তারা। কোম্পানির হতাশ হয়ে পড়া নীতি নির্ধারকরা এসে ভর করেন উইলিয়ামের ওপর। পারস্যে এসে 'বার্মা অয়েল কোম্পানি' হয়ে যায় 'অ্যাংলো পারসিয়ান অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি'। পর্দার অন্তরালে এই প্রক্রিয়ায় নেপথ্য ভূমিকা রেখেছেন একজন ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল। উইলিয়াম পারস্যে যে প্রবহমান তেলখনি খুঁজে পেয়েছেন, চুক্তির মাধ্যমে সেই খনির ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারল ব্রিটেন।

---

[১৪] পারস্য উপসাগরের তীরে ইরাক সীমান্তবর্তী ইরানি প্রদেশ খুজেস্তান। ইরাকের বসরা সংলগ্ন এই প্রদেশ আরব অধ্যুষিত। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় খুজেস্তানকে নিজের প্রদেশ দাবি করে আক্রমণ করেছিল ইরাক। খুজেস্তান ইরানের প্রাচীনতম প্রদেশ এবং ইরানি জাতির জন্মভূমি হিসেবেও উল্লেখ করা হয় একে। আর্য পার্সি জাতির লোকরা এখানেই প্রথম বসতি স্থাপন করে।

কিন্তু ইংরেজরা ধূর্ত জাতি। তারা সামনাসামনি কিছুই করেনি। ব্রিটিশ সরকার যে এই তেল কোম্পানির অংশীদার, সে তথ্য গোপন থাকে সবার কাছে। চতুর ব্রিটিশরা সামনে নিয়ে আসে লর্ড স্ট্রাথকোনা নামের এক স্কটিশ ব্যবসায়ীকে। তাকেই কোম্পানির হর্তাকর্তা বলে প্রচার করা হয়। সিডনি রেইলির মাধ্যমে এভাবেই নিজেদের জন্য তেলখনি নিশ্চিত করেছিল ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু তেল নিয়ে ব্রিটিশদের এত আগ্রহের হেতু কী?

# মসলার যুদ্ধ

উনবিংশ শতাব্দী। বাণিজ্যের ডালা নিয়ে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ বণিকের দল ততদিনে পৌঁছে গেছে দুনিয়ার সব দূরবর্তী প্রান্তে। পনেরো শতকেই মসলার গন্ধ শুঁকে শুঁকে ভারতের কালিকটে এসে উপস্থিত হয় পর্তুগিজ জাহাজ। মসলার প্রধান গোডাউন তখন ভারতের মালাবার উপকূলে। আর কালিকট হলো সেই গোডাউনের সিংহদ্বার।
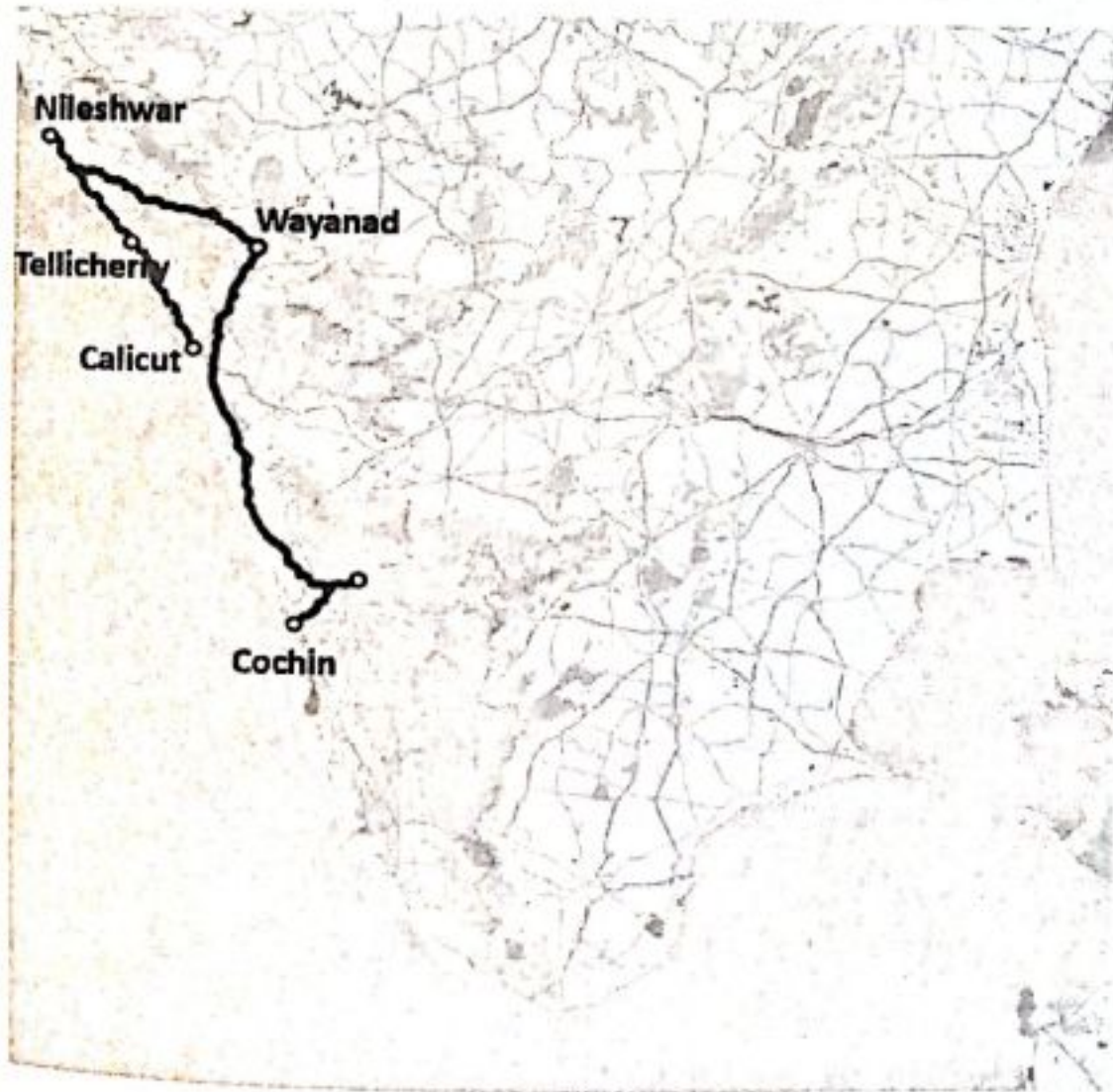
ভারতের মালাবার উপকূল। উৎস : অথেনটিক ইন্ডিয়ানটুরস.কম

ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরাই প্রথমে কালিকটের গুরুত্ব টের পায়। মালাবারে এসে তারা গায়ের জোরে দখল করে নেয় কোচিন আর গোয়া। কিন্তু মসলার সিংহদ্বার ভাঙতে পারেনি। কালিকট তখন আরব বণিকে ঠাসা। ভারতের গোলমরিচ আর এলাচ তাদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপসহ পৃথিবীর প্রায় সব ভূখণ্ডে। অথচ কালিকটই মসলা চাষাবাদের একমাত্র জায়গা ছিল না। মসলার চাষের প্রধান কেন্দ্র আরও দূরে—হাজার হাজার মাইলের পথ পেরিয়ে মালয় উপদ্বীপ আর ইন্দোনেশিয়াতে। বিপুল পরিমাণ লবঙ্গ চাষ হতো সেখানকার দ্বীপাঞ্চলজুড়ে। সেই মসলাও ইউরোপে যেত আরব বণিকদের হাত ধরে। পথ ছিল সেই কালিকট বন্দর। তাই মসলার প্রধান চাষাবাদের কেন্দ্র কালিকট না হলেও নিঃসন্দেহে এটা ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

ইউরোপে মসলার প্রধান সরবরাহকারী তখন ভেনিসীয়রা। মিশরীয় আরবদের কাছ থেকে সস্তায় মসলা কিনে কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করে চকচকা হতে থাকল ভেনিস। সম্ভাবনাময় এই ব্যবসায় ভাগ বসাতে চাইল ইউরোপের আরেক গোষ্ঠী পর্তুগিজ। তারা সরাসরি ভারতে এসে মসলা নিয়ে যেতে চাইল। তখনও ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়নি। কোন পথ ধরে আসবে তারা?

১৪৯৮ সালের মে মাসের কোনো একদিন কালিকটের মানুষ দেখল, তাদের বন্দরে এসে ভিড়েছে কামানসজ্জিত কিছু জাহাজ। জাহাজগুলো পর্তুগিজদের। আর দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইতিহাসের কুখ্যাত নাবিক ভাস্কো দা গামা। তারা এসেছে কামান দাগিয়ে মালাবারের মসলার বাণিজ্য দখল করতে! আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে ভারত মহাসাগর হয়ে ভারতে এসে পৌঁছেছে ভাস্কো দা গামা। বলা হয়ে থাকে, তিনিই জলপথটির আবিষ্কার; যদিও তিনিই প্রথম ব্যক্তি কি না—এ নিয়ে এখনও অস্পষ্টতা ও বিতর্ক আছে। গামার পর আরও অনেকেই এই অঞ্চলে এসে কামান দাগিয়েছে, কিন্তু কালিকটের বাজার বাগাতে পারেনি তারা। বাণিজ্যকুঠিও স্থাপন করতে পারেনি কোথাও। তাতে কী? কামানের জোরে ততদিনে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরেও পর্তুগিজরা দুর্জেয় শক্তি হয়ে গেছে। পরবর্তী ১৫০ বছর ইউরোপের মসলা বাণিজ্যের একচেটিয়া নেতৃত্ব ছিল তাদেরই হাতে।

কয়েক শতাব্দী ধরেই কালিকট ছিল মসলা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। কালিকটে তাড়া খেয়ে পর্তুগিজরা ঘাঁটি গেড়েছিল কোচিন আর গোয়াতে। তাদেরই আরেকটা দল গিয়ে দখল করতে চেয়েছে ইন্দোনেশিয়ার মসলা সমৃদ্ধ দ্বীপগুলো। কিন্তু ডাচদের কাছে পাত্তা পায়নি তারা। পর্তুগিজদের হটিয়ে দিয়েই ইন্দোনেশিয়ায় কলোনি গড়ল তাদের তুলনায় নেহায়েত ছোট্ট রাষ্ট্র নেদারল্যান্ডের বণিক গোষ্ঠী। ভারববর্ষের নীলকরদের মতো সেখানেও শোষকশ্রেণির জন্ম হলো। এলো মহাজনি প্রথা। কৃষকদের জায়গাজমি হাতছাড়া হয়ে চলে যেতে থাকল ডাচদের প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে।

মসলা নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ ও মালাক্কাতে পর্তুগিজ আর ডাচরা যখন রণাঙ্গন কাঁপাচ্ছে, তখনই সামনে এলো নতুন এক প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতের বুকে উঁকি দিলো ইংরেজ বেনিয়া। ধীরে ধীরে সমুদ্রের খবরদারিও তাদের হাতে চলে গেল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকে সমুদ্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল ব্রিটিশ নৌশক্তি। এরা পণ্যের বাজার একরকম দখলই করে ফেলল। বাইরের চাহিদা অনুযায়ী নিজেরাই বানাতে থাকল নানারকম পণ্য। ব্রিটিশ পণ্য ছিল গুণে-মানে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও অতুলনীয়। ইংরেজরা যা-ই বানাত, সেটাই বাজারে টিকে থাকত দশকের পর দশক ধরে। এভাবে বাণিজ্য ও নৌশক্তি—দুটোতেই প্রভূত উন্নতি অর্জন করে ইংরেজরা।

ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে থাকা কয়লা, স্টিল আর পণ্য জাহাজে করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। এই ইংরেজ আধিপত্য কায়েম হয়েছিল তার নৌশক্তির জোরে। ফলে পারস্যের পেট্রোলিয়াম অয়েলে যখন ব্রিটিশ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলো, ইংরেজদের শক্তি বেড়ে গেল বহুগুণ। শতাব্দী না পেরোতেই মিশরে মুরব্বির আসনে বসল ব্রিটেন। উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষে আসার পথকে নিরাপদ রাখা। ভারতবর্ষে আসার দক্ষিণ রুট ঠিক রাখতে তারা এমনকি একদল সেনা মোতায়েন করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়।

দুই মহাসাগরের মিলনস্থল দক্ষিণ আফ্রিকায় সবার আগে কলোনি গড়েছিল ডাচরা। তাদের পথ ধরে ফরাসিসহ ইউরোপের অন্যান্য শক্তিগুলো এখানে এলেও ডাচরাই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিককার কথা। তখনও সুয়েজ খাল খনন করা হয়নি। ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষ আসতে হতো আফ্রিকার পুরো পশ্চিম উপকূল ঘুরে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন তখন পরিচিত ছিল উত্তমাশা অন্তরীপ (কেপ অব গুড হোপ) নামে। ইংরেজরা আফ্রিকার এই উপকূল বাগিয়ে নিতে চাইল, যাতে ভারতবর্ষ যেতে প্রয়োজনে খানিক জিরিয়ে নেওয়া যায়। ফলে উনবিংশ শতকের একেবারে শুরুতেই ডাচদের হটিয়ে কেপটাউন দখল করে নেয় ইংরেজরা। তারপর থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকা পরিণত হয় ব্রিটিশ কলোনিতে।

ভারতবর্ষ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ মূলত একটাই—বাণিজ্য সম্ভাবনা আর সম্পদের প্রাচুর্য। এই উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মানে বড়ো একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে ছিটকে পড়া।

# পেট্রোলিয়ামের ভূ-রাজনীতি ও ব্রিটেন

ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষে এসেছিল বাণিজ্যিক কারণে। নিউজিল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে গিয়ে তারা যেভাবে থেকে গেছে, সন্তান-সন্ততি পয়দা করে থিতু হয়েছে, সে রকম বাসনা নিয়ে তারা ভারতে আসেনি। একচেটিয়া বাণিজ্যই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। যে বছর ইংরেজরা মিশর দখল করেছিল, সে বছরই (১৮৮২) পেট্রোলিয়ামের ভূ-রাজনীতিতে তারা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল এক নৌ অ্যাডমিরালের মাধ্যমে। ইনিই সেই অ্যাডমিরাল, যিনি ভূতত্ত্ববিদ উইলিয়ামের সাথে পারস্যের তেল সম্পদ ভাগাভাগির আয়োজনে যুক্ত ছিলেন।

মাটির নিচের তেল যে শিগগিরই পুরো দুনিয়ার সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের নিয়ামক হয়ে উঠবে, ইংরেজদের আগে তা কেউই টের পায়নি। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর শীর্ষ অফিসার ফিশার সরকারকে পরামর্শ দেন—

> 'দেখ, ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে তেলের। জার্মানিকে ঠেকাতে হলে আজ হোক কাল হোক বিশ্বের তেলখনিগুলো দখল বা নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে।'

ব্রিটিশরা তখনও ক্ষমতার কেন্দ্রে, তবে তাকে একচ্ছত্র আধিপত্য বলা চলে না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্রমেই শক্তি অর্জন করছিল। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানিতে তখন লোহা ও ইস্পাত শিল্পের জয়জয়কার। সেই শিল্পের আশীবাদে জার্মানরা কদিন পরপরই সমুদ্রে ভাসাতে শুরু করেছে বাণিজ্যিক ও সামরিক ফ্লিট। ব্রিটেন বিপদ দেখেছে তখনই। ইউরোপের দুই পরাশক্তির মধ্যে ঠোকাঠুকি চলতে থাকল সমুদ্রের বুকে। ব্রিটেন ও জার্মানির বাইরে তৃতীয় দেশ হিসেবে যোগ দিলো ফ্রান্স।

ফরাসি ও জার্মানরা তখন পাগলা কুকুরের মতো কামড়াকামড়িতে ব্যস্ত। আজকের পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়া এই ক্ষমতার লড়াইয়ে একদম অনুপস্থিত, গণনারও বাইরে। ফ্রান্স চেয়েছিল জার্মানদের একতা ভেঙে তাদের শক্তিমত্তা ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু চ্যান্সেলর বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানি এগোতে থাকল প্রবল প্রতাপে। জার্মানির এই উত্থান ইংরেজদের জন্যও ছিল অস্বস্তিকর।

ইংরেজ নেভাল অফিসার ফিশার ভেবে দেখলেন কয়লা দিয়ে সমর জগতের নেতা হওয়া যাবে না। প্রয়োজন এর থেকেও কার্যকর জ্বালানি। কারণ, কয়লাচালিত জাহাজ, তেলচালিত জাহাজের তুলনায় কিছুই না। কয়লার জাহাজকে পূর্ণ ক্ষমতায় তুলে আনতে সময় নষ্ট হয়, দরকার হয় বিপুল জনশক্তি। কয়লাচালিত জাহাজের আরেকটা বড়ো দুর্বলতা হলো, ১০-১২ মাইল দূর থেকেও এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় তার বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর জন্য। ফলে শত্রুপক্ষের নজরদারিতে পড়ে যাওয়ার একটা শঙ্কা থেকে যায়। সবকিছু ভেবে-চিন্তেই ফিশার সব ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজকে তেলচালিত জাহাজে রূপান্তর করার পরামর্শ দেন।

বিপ্লব সব সময় সশস্ত্র হয় না। নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা কিংবা প্রযুক্তির ব্যবহারও বিপ্লবে রূপ নিতে পারে। আর এই বিপ্লবটা আসে ভেতর থেকে, অনেক দিনের ভাবনার পরিণতি হিসেবে। ফিশার যে নতুন চিন্তার খোরাক জোগালেন, তা বিশেষ গুরুত্ব পেল না শুরুতে। কারণ, পরিবর্তনকে সবাই ভয় পায়। অবশ্য দেরিতে হলেও ফিশারের ভাবনা ঠিকই প্রভাবিত করেছিল ব্রিটিশ সরকারকে। কয়েক বছর বাদেই তার দৃষ্টান্ত মিলল। ততদিনে পদোন্নতি পেয়ে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর চিফ অব কমান্ডার বনে গেছেন ফিশার। আর তার নির্দেশনায় তেলের খোঁজে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ গুপ্তচররা। এদেরই একটি দল পারস্যে এসেছে এজেন্ট সিডনি রেইলির নেতৃত্বে। সবকিছুই চলছে ফিশারের ব্লু-প্রিন্ট মোতাবেক। এজেন্ট সিডনি রেইলি ভূ-তত্ত্ববিদ উইলিয়ামের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললেন—

> 'দেখ, আমরা একটা তেল কোম্পানি করছি। এটা খ্রিষ্টানদেরই। আমাদের শেয়ারহোল্ডার হিসেবে রাখতে পারো। বিনিময়ে পারস্যে তেলখনি আবিষ্কার আর উত্তোলনে যত অর্থ লাগে আমরা দেবো।'

সিডনি রেইলি যে কোম্পানির কথা বলেছিলেন, বর্তমান বিশ্ব সেটাকে চেনে 'ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম' নামে। এটিই তখনকার 'অ্যাংলো পারসিয়ান অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি'।

পারস্যের তেলখনি তো ব্রিটিশদের কবজায়। তাহলে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানদের ভবিষ্যৎ কী? শত্রু যখন এতটাই এগিয়ে, জার্মানরা আর বসে থাকে কী করে! কিন্তু ততদিনে চ্যান্সেলরের পদ থেকে বিসমার্ককে সরিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধবাজ কাইজার (জার্মান সম্রাটের উপাধি) দ্বিতীয় উইলিয়াম। রগচটা কাইজার গেলেন অটোমান সুলতানের দরবারে। কন্সট্যান্টিনোপল সফর থেকে ফিরেই তিনি হাত দেন 'বার্লিন-বাগদাদ রেলওয়ে' নামের এক নতুন প্রজেক্টে। বিশ্বরাজনীতিতে শুরু হয় নতুন মেরুকরণ।

বার্লিন-বাগদাদ রেল প্রজেক্ট জার্মানির জন্য সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিলো। এবার অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে ইউরোপের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে জার্মান পণ্য। আর এদিক থেকে সহজেই ইউরোপে পৌছে জ্বালানি তেল। এই রেলপথ পুরো এশিয়ার সাথে অটোমানদের যেমন সহজ সংযোগ ঘটাবে, তেমনি সস্তায় এবং কম সময়ের মধ্যে জার্মান পণ্য পৌছে যাবে এশিয়ার বিশাল অঞ্চলে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে। ফলে বড়ো একটা এলাকাজুড়ে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির বাজার তৈরি হবে। আর রাজনীতি ও অর্থনীতি—দুই দিক থেকেই লাভবান হবে জার্মান ও অটোমানরা।

ঠিক এখানেই নিজেদের বিপদ দেখল ব্রিটিশরা। বার্লিন-বাগদাদ রেল প্রজেক্ট তাদের সামনে নতুন এক চ্যালেঞ্জ। এ অঞ্চলে ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মিত্র রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে এই প্রজেক্ট। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে সামরিক সুবিধাও পাবে জার্মানি। তাহলে তো কিছু একটা করতেই হয়!

মিশরের সুয়েজখাল তখন ব্রিটেন আর ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে। আরেক গুরুত্বপূর্ণ জলপথ পারস্য উপসাগরেও গিজগিজ করছে ব্রিটিশ সামরিক ও বাণিজ্যিক তরি। ইংরেজদের ভয়, এই দুই রুট ধরে যেকোনো সময় ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত হানতে পারে জার্মান-তুর্কি বাহিনী। অবশ্য তার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তেলের ভূ-রাজনীতি। ডয়েচে ব্যাংকের মধ্যস্থতায় যে জার্মান কোম্পানি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, তাদের রেললাইনের উভয় পাশের ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত

এলাকায় তেলখনি খোঁজার এখতিয়ার দিয়েছেন অটোমান সুলতান। এই ২০ কিলোমিটারের মধ্যে পড়ে গেছে সে সময়কার সবচেয়ে বড়ো তেলসমৃদ্ধ এলাকা মসুল। বর্তমান ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী এটি। যদি রেললাইনটি শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হতো, তাহলে মেসোপটেমিয়ার সম্ভাব্য তেলখনিগুলোতে একক প্রবেশাধিকার পেয়ে যেত জার্মানি। ফলে ব্রিটেন এই প্রজেক্ট ভন্ডুল করতে উঠে-পড়ে লাগল। অবশ্য রেললাইনের কাজ ৩০০ মাইল বাকি থাকতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাগদাদ চলে যায় ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে প্রকল্পটির কাজও বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯৩০ সালের দিকে আবারও রেললাইনের কাজ শুরু হয়, কিন্তু ততদিনে জার্মানি চলে গেছে মাঠের বাইরে।

# ব্রিটেনের অটোমানবিরোধী ষড়যন্ত্র

অসন্তুষ্ট ব্রিটেন শত্রুর দুর্বল জায়গাগুলোতে হানা দিতে লাগল। অটোমানদের 'সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না' টাইপের একটা উচিত শিক্ষা দেওয়ার পথ খুঁজতে লাগল তারা। এজন্য প্রথমেই টার্গেট করল ছোট্ট উপসাগরীয় ভূখণ্ড কুয়েতকে। আরব উপদ্বীপের এই দেশটি অটোমানদের অধীনে থাকলেও জাতীয়তাবাদী আরব নেতারা তুর্কি শাসনের প্রতি ছিলেন চরম বিরক্ত। অপেক্ষার প্রহর গুনছিল বিকল্প কোনো পরাশক্তি আগমনের। রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তখনকার কুয়েত নেতা মুবারক আল সাবাহকে কাছে টেনে নেয় ব্রিটেন। অটোমানদের বিরুদ্ধে এটা ছিল ইংরেজদের ট্রাম্প কার্ড। শাত আল আরবের পাশেরই একটি বন্দর 'বন্দর-ই সুয়াখ'। এই বন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় ব্রিটেন। কুয়েত-ব্রিটেনের এই সমঝোতা বার্লিন-বাগদাদ রেল প্রজেক্টের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। কারণ, বন্দরটির নিয়ন্ত্রণ হাতে না থাকলে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করা অসম্ভব। বন্দরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ সোনা ও অস্ত্র দেওয়া হয় কুয়েতকে। কয়েকবছর পর কুয়েত শেখ ব্রিটিশ সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেয়, ব্রিটিশ মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে নিজ ভূখণ্ডে তেল অনুসন্ধান ও উত্তোলনের অনুমতি দেবে না তারা। ফলে অন্তত একটি দেশের তেলবাণিজ্যে প্রবেশের পথ হারায় জার্মানি এবং আরও একটি তেলভান্ডার যুক্ত হয় ব্রিটেনের বহরে।

মেসোপটেমিয়া যে একটি তেলসমৃদ্ধ এলাকা—এ ব্যাপারে অবগত ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের সবাই। ইরানের পর এই অঞ্চলে তেলের আবিষ্কার বিশ্বঅর্থনীতি ও সামরিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বড়ো ধরনের যুদ্ধের গ্রাউন্ড তৈরি করে দেয়। ব্রিটিশ সরকার খুজেস্তানের আবাদানে তেল শোধনের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের এক আরব গোত্রপ্রধানের কাছ থেকে জমি লিজ নেয়।

খুজেস্তানের তখনকার নাম ছিল আরবিস্তান। আর আবাদান এলাকাটি পারস্য উপসাগরের উত্তরে ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায় অবস্থিত।

জার্মানি তখন পর্যন্ত তেলের কোনো খনি নিশ্চিত করতে পারেনি। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট—ব্রিটেনের পর জার্মানিই হলো দ্বিতীয় দেশ, যারা তেলের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই জার্মান সরকার আর শিল্প মালিকরা বুঝতে পারে, তেলই হবে ভবিষ্যৎ অর্থনীতির জ্বালানি। কেবল ডাঙার পরিবহনের জন্য নয়; বরং সামুদ্রিক জাহাজের জন্যও তা সমরূপ সত্য। যে রুট ধরে বার্লিন অবধি রেললাইন যাওয়ার কথা ছিল, অচিরেই সেই মসুল ও বাগদাদের মধ্যবর্তী এলাকায় তেলের সন্ধান পায় ভূতত্ত্ববিদরা। জার্মানদের কপাল খুলেই গিয়েছিল প্রায়; এমনকি তেল উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় কোম্পানি গড়ার প্রস্তাবও উঠেছিল জার্মান পার্লামেন্টে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ জার্মানির সেই পাকা ধানে মই তুলে দেয়।

একসময় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর দায়িত্ব নেন উইনস্টন চার্চিল। ফিশারের মতো তিনিও পিছিয়ে থাকতে চাননি। শিগগিরই বুঝতে পেরেছিলেন, একই আয়তনের তেলচালিত জাহাজ কয়লাচালিত জাহাজ থেকে কয়েকগুণ বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন। বারবার জ্বালানি ভরার ঝামেলাও নেই তাতে। তাঁর উদ্যোগেই ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজগুলোতে জ্বালানি হিসেবে তেলের ব্যবহার শুরু হয়।

১৯১২ সালের দিকে পুরো পৃথিবী যে পরিমাণ তেল উৎপাদন করত, তার ৬৩ শতাংশই উত্তোলন করত যুক্তরাষ্ট্র একা। বাকি তেলের ১৯ শতাংশ আসত তৎকালীন রাশিয়ার বাকু থেকে আর ৫ শতাংশের মতো উৎপাদন করত মেক্সিকো। তখনও ব্যাপক আয়তনে তেল উৎপাদন শুরু করতে পারেনি অ্যাংলো পারসিয়ান এক্সপ্লোরেশন অয়েল কোম্পানি। কিন্তু ব্রিটেনের বরাবরই লক্ষ্য ছিল যেকোনোভাবে পারস্য উপসাগরে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। চার্চিলের অনুরোধেই গোপনে অ্যাংলো পারসিয়ান কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ার কিনে নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। যদি নিজেরা পেট্রোলিয়াম নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর তেল রিজার্ভ ঠেকাতে পারত, তাহলে আরও কয়েক দশক হয়তো ব্রিটেনের একাধিপত্য চলত বিশ্বব্যাপী।

# আরব-ইজরাইল দহরম-মহরম

রাজনীতিতে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা চিরস্থায়ী নয়। জামাল আবদেল নাসেরের যে মিশর একসময় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের খাস মিত্র, তার আমূল বাঁক বদল ঘটে আনোয়ার সাদাতের আমলে। মূলত মিশর এবং ইজরাইলের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পরই সবকিছু বদলে যায়। সাদাত বুঝতে পারেন, ব্রিটেন কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন আর মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রক নয়; বরং চালকের আসনে বসেছে আমেরিকা। কাজেই মিশরও ডিগবাজি দিলো মার্কিন অর্থ আর অস্ত্র সহায়তার আশ্বাসে। তাদের নতুন মিত্র হলো আমেরিকা। আবার ৫৬-এর সুয়েজ যুদ্ধের সময় যে ইজরাইলকে মার্কিনিরা তেমন গুরুত্বই দেয়নি, ৬৭-এর আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পর সেই ইজরাইল প্রশ্নে পলিসি পালটাতে শুরু করল আমেরিকা। ওয়াশিংটন দেখল, মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইল একটা বৃহত্তর পরাশক্তি। তাকে হারানোর কেউ নেই বললেই চলে। কাজেই আরবদের চেয়ে ইজরাইলকেই তার বেশি প্রয়োজন। এতে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিও ঘুরে গেল ১৮০ ডিগ্রি। অনেকেই বলে থাকেন; ইজরাইল মূলত মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সাপোর্ট ঘাঁটি ছাড়া আর কিছুই না।

আরবরা যে ইজরাইলের বিরুদ্ধে চার-চারটা যুদ্ধ করল, সেই দেশটিকে এখন আর বিপজ্জনক মনে করে না তাদের নেতারা। ইরান, হামাস, হিজবুল্লাহ আর মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের কাছে বরং অধিকতর বিপজ্জনক ইস্যু। আরব রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলো ইজরাইলকে কার্যত মেনে নিচ্ছে, তাদের সাথে বাণিজ্য করছে, দূতাবাস খুলছে, চালু রাখছে নিয়মিত বিমান যোগাযোগ। এমনকি আমিরাতের মতো দেশ নাগরিকত্ব পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে ইজরাইলি ইহুদিদের। দুবাইয়ে দাঁড়িয়ে ইজরাইলি মন্ত্রী ঘোষণা করছেন—কোনো স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বরদাশত করা হবে না। যে পূর্ব ইউরোপ রাশিয়ার প্রভাবে

সমাজতন্ত্রকে অপরিহার্য মতাদর্শ হিসেবে নিয়েছিল, তারা এখন রুশদের মনে করে এক নম্বর শত্রু। তাই রাশিয়ার নিকট প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও পোল্যান্ড আর জার্মানিতে মার্কিন সেনা ঘাঁটি রয়ে গেছে এখনও। আবার মার্কিনিদের দীর্ঘদিনের মিত্র পাকিস্তান আর তুরস্ক হাতছাড়া হয়ে গেছে ট্রাম্পের অতিরিক্ত ভারতপ্রীতির কারণে। এদিকে পাকিস্তানের আরবমিত্র আমিরাত এবং সৌদি ঝুঁকেছে তারই চিরশত্রু ভারতের দিকে। রাশিয়াকে পাশ কাটিয়ে আমেরিকার সাথে বাড়ছে ভারতের ঘনিষ্ঠতা, ফিলিস্তিনিদের প্রতি অতীতের সহানুভূতিশীল রাষ্ট্র ভারতের ভান্ডারে প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে ইজরাইলি মরণাস্ত্র। শত্রুতা-মিত্রতার এই রসায়ন রূপ বদলাতে থাকবে মনুষ্য সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত।

আরও একবার বার্লিন-বাগদাদ রেলওয়ে প্রজেক্টে ফেরা যাক। নিজের মিত্র রাশিয়াকেও এবার 'হুমকি' হিসেবে দেখতে শুরু করেছে ব্রিটেন। বার্লিন-বাগদাদ রেল প্রকল্পের গতি রুদ্ধ করা গেছে বটে, কিন্তু রুশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রেল প্রজেক্ট—ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণ করবে। কুয়েতে আরও একটি রেল প্রজেক্টে হাত দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে তারা। ব্রিটেনের নতুন আপদ তাহলে রাশিয়া! ইংরেজরা চোখের সামনে বিশাল এক অঞ্চলের তেল থেকে বঞ্চিত হওয়ার সমূহ বিপদ দেখতে পায়। এ রকম একটা টেনশনের মধ্যেই মেক্সিকোতে পাড়ি জমায় ব্রিটেন। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের তেল সম্পদে তখন মার্কিনিদের একক আধিপত্য। ফলে মেক্সিকোর তেল নিয়ে শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিরোধে জড়াতে হলো তাদের। এই তেলযুদ্ধ শেষপর্যন্ত ভেনিজুয়েলা অবধি গড়ায়। আর এরই মধ্যে বেজে ওঠে বিশ্বযুদ্ধের দামামা।

# তেল বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে জার্মানির পতন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। যুদ্ধটা যারা শুরু করেছিল সেই জার্মানদের তর্জন-গর্জন উবে গেল কয়েক বছরের মধ্যেই। জলে, স্থলে, আকাশে মিত্রশক্তির মার খেয়ে জার্মান নেতৃত্ব যখন ছন্নছাড়া, ঠিক তখনই জার্মানদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো একগাদা শর্ত। যুদ্ধে বিজয়ী নেতারা প্যারিসের ভার্সাইয়ে বসে ঠিক করে দিলেন—জার্মানরা কত কদম হাঁটবেন, কেমন গতিতে দৌড়াবেন, ঘাড়ে কয়টা বন্দুক রাখবেন, কামানের সাইজ হবে কত ইত্যাদি।

এত সব শর্ত ডিঙিয়ে জার্মানির উদ্ধত হওয়ার কোনো সুযোগই থাকল না। ফলে দুর্বল জার্মানিকে আর নিজের জন্য হুমকি মনে করল না ব্রিটেন। তেল বাণিজ্যে ব্রিটেনের এবারের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপের কেউ নয়; আটলান্টিকের ওপারের দেশ যুক্তরাষ্ট্র। ভার্সাই সম্মেলনে জার্মানির ডানা ছেঁটে দেওয়ার পর ব্রিটেন তখনও বিশ্ব পরাশক্তি, পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। এই অবস্থায় কারও কাছেই তাদের নত হওয়ার কথা নয়। তেল বাণিজ্যও তাদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর তৎপরতায় বিরক্ত হয়ে ব্রিটেনকে হাঁটতে হয় সমঝোতার পথে। এরই ধারাবাহিকতায় সাতটি ব্রিটিশ ও মার্কিন কোম্পানি মিলে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে সারা বিশ্বের পেট্রোলিয়াম অয়েলের ওপর। এদের কারণে কখনোই তেল খনির ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেনি অন্য কোনো কোম্পানি। যে সাত কোম্পানি মিলে কার্টেল তৈরি করেছিল, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী ছিল ব্রিটেনের শেল কোম্পানি ও যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কারও জন্যই শুভ ছিল না। মিত্রশক্তি জয়ী হলেও ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশকে সাম্রাজ্য ছোটো করার মতো অপ্রিয় কাজে

হাত দিতে হয়। সে মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও গুটিয়ে আনেন ক্লেমেন্ট এটলি[১৫]। ধীরে ধীরে ভারত, প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে আসে তারা। দেরিতে হলেও একই পথে হাঁটে ফ্রান্স। বিশ্বযুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়া ব্রিটেন ইরানের মোসাদ্দেক সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেয় আমেরিকার সহায়তায়। এর পর থেকে ওয়ার্ল্ড অর্ডারের চাবি কেবলই যুক্তরাষ্ট্রের হাতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের দশকগুলোতে শিল্প কারখানা আর যানবাহনের জন্য জ্বালানির সরঞ্জাম ছিল কয়লা। ১৮৯০ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়—জার্মানি তখন ৮৮ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করত, যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি ব্রিটেন করত ১৮২ মিলিয়ন টন অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি। এর ২০ বছর পরের পরিসংখ্যানে অবশ্য বিশ্বকে চমকে দেয় জার্মানি। দেশটির কয়লার উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ২১৯ মিলিয়ন টন; যেখানে ব্রিটেনের উৎপাদন গিয়ে ঠেকে ২৬৪ মিলিয়ন টনে। মানে ব্রিটেনের তুলনায় বেশ উন্নতি হয়েছে জার্মানির। তারা বুঝতে পেরেছে, যদি আধুনিক বাণিজ্য জাহাজ এবং এগুলোকে রক্ষার জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী না থাকে, তাহলে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। অথচ তখন সমুদ্রের রাজা ব্রিটেন। কিছুতেই তারা নিজেদের একাধিপত্য ছাড়তে রাজি নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের বছরগুলোতে বাণিজ্য জাহাজের দিক দিয়ে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, নরওয়ে—এদের কারও ধারে-কাছেও ছিল না জার্মানি। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগ মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যায়। অসামান্য উন্নতির স্বাক্ষর রেখে ব্রিটেনের পরেই জায়গা করে নেয় জার্মানি। তাদের এই অগ্রগতির পেছনে রয়েছে ইস্পাত এবং প্রকৌশল শিল্পের ত্বরান্বিত বিকাশ। আর এই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ছিল কয়লা। শত্রুরা অবাক হয়ে দেখল মিশর, ভারতবর্ষ ও আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বে জার্মান পতাকা উড়িয়ে বীরদর্পে ভেসে বেড়াচ্ছে বিরাটকায় সব জাহাজ। জার্মান বাহিনীতে আধুনিক সব যুদ্ধজাহাজের সংযোজনে উদ্‌বেগ বাড়িয়ে দেয় ব্রিটিশ শিবিরে। তারা ভাবতে থাকে, জার্মানির অর্থনৈতিক উত্থানের বিপরীতে জলদি কিছু করা দরকার।

[১৫] ক্লেমেন্ট এটলি ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা এবং ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। এর আগে যুদ্ধ চলাকালে উইনস্টন চার্চিলের কোয়ালিশন সরকারের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

নতুবা পরাশক্তি হওয়া থেকে জার্মানদের ঠেকানো যাবে না। আর ঠিক তখনই আসে পেট্রোলিয়াম অয়েলের চিন্তা। ব্যাস, শুরু হয়ে যায় তেলের জন্য লড়াই।

এতদিন যেসব জাহাজ কয়লায় চলত, ধীরে ধীরে তেলচালিত জাহাজে রূপ নিতে শুরু করল সেগুলো। ইংরেজ অ্যাডমিরাল লর্ড ফিশার মনে করতেন, সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ এবং তেলশক্তি ভবিষ্যতে তাদের ভূ-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। তার এই আগাম চিন্তা অমূলক ছিল না মোটেই। একটা কয়লাচালিত মোটরকে পূর্ণ শক্তিতে নিতে চার থেকে নয় ঘণ্টা সময় লাগে। অন্যদিকে তেলচালিত মোটরের ক্ষেত্রে সেটা বড়োজোর ৩০ মিনিট। ইংরেজরা সবার আগে জ্বালানি তেলের গুরুত্ব বুঝেছিল সত্য, কিন্তু তাদের হাতে কোনো তেল ছিল না। তেল সরবরাহের জন্য তাদের নির্ভর করতে হবে রাশিয়া, আমেরিকা কিংবা মেক্সিকোর ওপর। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে যখন তেলের নিয়ন্ত্রণ, তখন সম্ভাব্য কোনো যুদ্ধে জ্বালানির জোগান পাওয়া একেবারেই অনিশ্চিত। মিলতেও পারে, আবার না-ও মিলতে পারে। কাজেই এই ঝুঁকি ব্রিটেন নেবে কেন? কীভাবে তেল সরবরাহ নিরাপদ করা যাবে, তার জন্য কমিটি গঠন করে দেয় ব্রিটিশ নৌবাহিনী। এ সময় পারস্যের মূল ভূখণ্ড ও উপসাগরে ইংরেজদের তেমন উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল না। পারস্যও ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরের অংশ।

বুশেহর আর বন্দর-ই-আব্বাসে ব্রিটিশ কনস্যুলেট খোলা হলো। সেইসাথে পারস্য উপসাগরে মোতায়েন করা হলো নৌ জাহাজ, যাতে লুটপাটের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ভারতীয় উপনিবেশের ধারে-কাছে ঘেঁষতে না পারে অন্য কোনো শক্তি। এর কয়েকবছর পরই ব্রিটিশ এজেন্ট সিডনি রেইলির হাত ধরে পারস্যের তেলে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু হয় ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়।

# মার্কিন তেল বাণিজ্যে রাশিয়ার হানা

**রকফেলারকে**[১৬] টেক্কা দেওয়ার মতো তেল ব্যবসায়ী আমেরিকাতে কেউ ছিল না। সেখানকার ৯০ শতাংশ তেলের ব্যাবসাই নিয়ন্ত্রণ করত তাঁর স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি। এমন না যে রকফেলার রাতারাতি সফল হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কথা-কাজে আড়িপাতা ছিল তার লোকদের নিয়মিত কাজ। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীরা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কোনো খনির সন্ধান পেয়েছে—এসব তথ্যের পেছনে ছুটত রকফেলারের লোকজন। এ রকম গুপ্তচরবৃত্তিই ছিল রকফেলারের মতো লোকদের মুনাফাখোরে পরিণত হওয়ার প্রধান অবলম্বন।

বিশ্ব তেলের বাজারে স্ট্যান্ডার্ডের মতো মার্কিন কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে প্রথম আঘাত হানে রাশিয়া। কমিউনিজম পতনের আগ পর্যন্ত আজকের স্বাধীন আজারবাইজান সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল। আজ থেকে ঠিক ১৫০ বছর আগে প্রথমবারের মতো আজারবাইজানের বাকুতে তেলখনির সন্ধান মেলে। এই খনির ওপর চোখ পড়ে আলফ্রেড নোবেলের ভাই লুডউয়িগ নোবেলের। তাকে বলা হতো রাশিয়ার রকফেলার। বাকুর তেল বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে খুব একটা দেরি হয়নি নোবেলের। যুগের ব্যবধানে তেল উত্তোলনে অনেক দূর এগিয়ে যায় রাশিয়া। সে সময় আমেরিকা যে পরিমাণ তেল উৎপাদন করত, তার এক-তৃতীয়াংশ তেল উৎপাদন করতে সক্ষম হয় রাশিয়া। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ তেল রাশিয়ার প্রয়োজন নেই। ফলে তার দরকার আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার। এমতাবস্থায় রাশিয়ার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে রথসচাইল্ড পরিবার।

---

[১৬] পুরো নাম জন ডেভিসন রকফেলার। মার্কিন তেল ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তিনিই স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম আমেরিকান হিসেবে রকফেলার এক বিলিয়ন ডলার সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেন। এজন্য তাকে বলা হয় সর্বকালের সেরা ধনকুবের একজন।

# তেল বাণিজ্যে রথসচাইল্ড পরিবার

রাশিয়া যে সময় তার জ্বালানি তেল বিশ্ববাজারে প্রবেশ করাতে চেয়েছে; তখন রথসচাইল্ড পরিবারের কেউ থাকে লন্ডনে, কেউ প্যারিসে আবার কেউ-বা মিলানে। ফ্রান্সে রথসচাইল্ড পরিবারের ব্যাংকগুলো যারা দেখাশোনা করতেন, তেল বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার এই সুযোগটি তারা হাতছাড়া করতে চাইলেন না। ইউরোপে এতদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনীতি আর শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ করে প্রচুর ব্যাবসা করেছে রথসচাইল্ড পরিবার। সেই পরিবার আড্রিয়াটিকের তীরে এসে একটা রিফাইনারি বানাল। কৃষ্ণসাগরের বাতুম বন্দর থেকে বাকু অবধি নির্মিত হলো রেল সড়ক। এ পথ দিয়েই বাকুর তেল পৌঁছে গেল ইউরোপে। রথসচাইল্ডদের হাত ধরে রাশিয়ার তেল বাণিজ্য শুরু হলো ব্রিটেনের সাথে।

রথসচাইল্ডরা যখন বাকুতে এসে সরাসরি তেলখনি কিনে নিচ্ছিল, এবার নোবেলদের সাথেই শুরু হলো তাদের প্রতিযোগিতা। শিগগিরই তেল বাণিজ্যের এই প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয় আরেক অয়েলম্যান মার্কুস শ্যামুয়েল। এই এলাকায় রথসচাইল্ড পরিবারই ডেকে এনেছিল তাকে। উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় তেল সরবরাহ নির্বিঘ্ন করা। রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানিকে টপকাতে চাইলেন শ্যামুয়েল। তার প্রতিষ্ঠিত 'এম শ্যামুয়েল কোম্পানি' নাম বদলে হয় 'শেল ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি'। এবার তেল বাণিজ্যে কয়েকটা শক্তিশালী পক্ষ দাঁড়িয়ে গেলে। রকফেলার, রথসচাইল্ড, শ্যামুয়েল আর নোবেলরা জড়িয়ে পড়লেন তেলযুদ্ধে।

স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়াতেও বড়োসড়ো ধাক্কা খায়। সেখানে তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে 'রয়্যাল ডাচ কোম্পানি'। বিংশ শতকের

শুরুতেই রয়্যাল ডাচ কোম্পানির সাথে নিজের কোম্পানিকে একীভূত করেন শ্যামুয়েল। দুই কোম্পানি মিলে নতুন নাম হয় 'রয়্যাল ডাচ শেল'। পারস্যে তেল আবিষ্কৃত হওয়ার পরপরই দৃশ্যপটে এলো 'অ্যাংলো পারসিয়ান অয়েল কোম্পানি'। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা প্রথম বাণিজ্যিক তেল পারস্য তথা ইরান থেকেই আসে। আর এই তেল কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা আমরা এর মধ্যেই জেনে গেছি।

## সেভেন সিস্টার্স-এর হাতে বিশ্ব তেলের বাজার

১৯১১ সালে আদালতের নির্দেশে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানিকে ভেঙে কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া হয়। আজ আমরা যে এক্সন, মবিল ও শেভরনের মতো বড়ো কোম্পানিগুলোকে দেখি, এ সবগুলোর আদি কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড অয়েল। বিংশ শতকে রাশিয়া ছিল তেলের সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী। কিন্তু দ্রুতই ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস ও ওকলোহামায় তেলখনি আবিষ্কৃত হলে আমেরিকা পরবর্তী ৫০ বছরের জন্য নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ব তেলের বাজারে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে উপস্থিতি জানান দেয়। এ ছাড়া 'টেক্সাকো' ও 'গালফ অয়েল' নামে নতুন দুটি কোম্পানি আসে। এতে তেল কোম্পানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় সাতটি। একটা সময় এই সাত কোম্পানি একজোট হয়ে বিশ্ব তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এগুলো হলো—এক্সন, শেভরন, মবিল, টেক্সাকো, গালফ, বিপি এবং শেল। এদের একত্রে বলা হতো সেভেন সিস্টার্স। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পৃথিবীর চার-পঞ্চমাংশ তেলের মালিক ছিল এই সাত কোম্পানি। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ তেলের ট্যাংকারও ছিল এদের দখলে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সারা বিশ্বে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করত যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু পরের ৫০ বছর যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন কমে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে তা অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যায়। রাসায়নিক শিল্পগুলো যখন কয়লার বদলে পেট্রোলিয়াম অয়েলকে জ্বালানি হিসেবে গ্রহণ করল, তখন কাঠ, ধাতু ও সুতার জিনিসের জায়গা দখল করল নাইলন আর প্লাস্টিক। সেইসাথে যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন ও ট্যাংকে কয়লার পরিবর্তে বাড়তে থাকল তেলের ব্যবহার। এতে সামরিক যানের গতি বেড়ে গেল বহুগুণ।

# প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি বদলে দেয় তেল

জ্বালানি তেলই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ ঠিক করে দেয়। যে নৌরুট দিয়ে জার্মানির ক্রয়কৃত তেল আসত, সে রুটে অবরোধ আরোপ করে মিত্রপক্ষ। জবাবে ভিন্ন রুটে অবরোধ দেয় জার্মানি। তারা সমুদ্রে সাবমেরিন মোতায়েন করে আমেরিকা থেকে আসা ব্রিটেনের তেলের জাহাজ আটকে দেয়। সর্বোচ্চ তেল উৎপাদনকারী যুক্তরাষ্ট্র তখন মিত্রপক্ষের বড়ো সরবরাহকারী। যুক্তরাষ্ট্র জার্মানদের এই তেলরুট অবরোধকে ভালোভাবে নেয়নি। ফলে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে গেল তারা। মূলত আমেরিকাকে যুদ্ধে ডেকে এনেছিল ব্রিটেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ব্রিটেন নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছিল। এবার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট হাতছাড়া হওয়ার পথে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই আমেরিকা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা তৈরি হবে তারই হাত ধরে।

মিত্রপক্ষের বাধায় রোমানিয়ার তেলক্ষেত্রে ঢুকতে পারছিল না জার্মানি। ফলে শীঘ্রই লুব্রিকেন্ট সংকটে পড়ল তারা। জার্মানদের রেল চলাচল ও যুদ্ধবিমানের ওড়াওড়ি ১৯১৭ সালের মধ্যেই তেল সংকটে অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তেলখনি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বনেতাদের আগ্রাসী তৎপরতা থামেনি। নাৎসি নেতা হিটলারের লক্ষ্য ছিল প্রতিবেশী পোল্যান্ড আর সোভিয়েত ইউনিয়নের তেলখনিগুলো দখলে নেওয়া। মিত্রপক্ষের বাধায় যখন সেটি সম্ভব হলো না, জার্মানি পড়ল গ্যাসোলিন সংকটে। অক্ষশক্তির আরেক দেশ জাপান চেয়েছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিজে তেলের খনি নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু মার্কিন সাবমেরিন জাপানমুখী তেলের বেশকিছু ট্যাংকার ডুবিয়ে দেয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দুবছর তীব্র জ্বালানি সংকটে পড়তে হয় জাপানি যুদ্ধবিমান ও জাহাজগুলোকে। জাপানি বাহিনীর গতিও একরকম স্থবির হয়ে যায়।

# ব্রিটেনকে ডিঙিয়ে পরাশক্তি হওয়ার দৌড়ে আমেরিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগ মুহূর্তে বিশ্বের ১৪ শতাংশ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ছিল ইংরেজদের হাতে। কিন্তু শিগগিরই তাদের খারাপ সময় এলো আর আমেরিকা এগোতে থাকল আপন গতিতে। আসলে ব্রিটেন তখন আর 'ইকোনমিক কন্ট্রোলার' ছিল না। ফলে নতুন মাস্টারের পথে এগোল যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধ শুরুর আগে থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র মোটামুটি ভালো একটা অবস্থানেই ছিল। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ শিল্পপণ্য উৎপাদন করত দেশটি। মাত্র কয়েক বছর বাদেই ইউরোপ যখন যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি শিল্পপণ্যের বাজার চলে গেল সমুদ্রের ওপারের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই মূলত আমেরিকার হাতে সম্মিলিত ইউরোপের একক মাতব্বরি ধসে যায়। সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ না হলে একক অর্থনীতির দেশ হিসেবে ইউরোপকে কখনোই অতিক্রম করতে পারত না আমেরিকা।

সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ এর আগে কয়েকশো বছর ধরে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ একক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে তাদের টপকে গেল আমেরিকা। বলা যায়, এই যুদ্ধটাই মার্কিনিদের ভাগ্য খুলে দিয়েছে। অবশ্য নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে ততটা খুনোখুনি বা নির্যাতনের পথ বেছে নিতে হয়নি তাদের। ঠিক যেমনটা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ, আফ্রিকাতে ফরাসি এবং লাতিন আমেরিকাতে স্প্যানিশরা করেছে। এমনকি হিটলারের মতো কোনো কিলিং ফ্যাক্টরিও খুলতে হয়নি আমেরিকানদের। তারা বরং অপেক্ষা করেছে। অনেকে তো বলে থাকেন—চূড়ান্ত বিচারে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, যা তাদের ঐক্য ও সম্প্রীতিই বৃদ্ধি করেছে কেবল। এরপর থেকেই বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রে চলে আসে তারা।

কিন্তু যে জার্মানরা দুই-দুইটি মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তির নেতৃত্ব দিলো, যুদ্ধ শেষে কী পেল তারা? শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্বপ্ন তো ভেঙে গেছেই, সেইসাথে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের অর্থনীতি। জার্মানদের ভাগ্য তো সেদিনই ফিকে হয়ে যায়, যেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেয় আমেরিকা। এ ঘোষণার কারণ ছিল জার্মান সাবমেরিন কর্তৃক আমেরিকান জাহাজকে আক্রমণ। ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র তিন মাস আগে সদম্ভে জার্মান পার্লামেন্টে এক ঘোষণা দিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল এডওয়ার্ড ভন কাপেল্লা—

> 'আমেরিকানরা আমাদের তীরে পৌঁছতে পারবে না। তার আগেই আমাদের সাবমেরিন তাদের জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেবে। কাজেই যুদ্ধে তাদের হস্তক্ষেপের প্রভাব জিরো, জিরো এবং জিরো।'

অথচ কোনো বাধা ছাড়াই আমেরিকা ফ্রান্সে এলো। উড্রো উইলসন কংগ্রেসে বললেন—

> 'আমরা এখন আর কোনো প্রভিন্সের বাসিন্দা না, যুদ্ধ আমাদের বিশ্বের নাগরিক করেছে।'

ঠিকই তো। যুক্তরাষ্ট্র তো তখন পৃথিবীর মেয়রই বটে। কিন্তু ১৯২৯ সালে মহামন্দার কবলে পড়ে হোঁচট খায় এই যাত্রা। ভার্সাই সম্মেলনের পর ব্রিটেন বড়ো সুপার পাওয়ারে রূপ নেয়। কয়েক বছরের মধ্যেই শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার প্রতিযোগিতা। কারণ, ততদিনে বিশ্ব ব্যাংকিং বাণিজ্যে ব্রিটেনকে টপকে গেছে আমেরিকা। কিন্তু এতদিনের প্রতিষ্ঠিত দৈত্যকে সরিয়ে নিজেই দৈত্যের আসনে বসা কী চাট্টিখানি কথা! তবে কি আমেরিকাই হবে ভবিষ্যতের সুপার পাওয়ার? নাকি এই ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অংশীদার হবে তারা? লন্ডন না ওয়াশিংটন—কে হবে নতুন সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার রাজধানী? ১৯২০ সালের আগ পর্যন্ত এসব একদমই স্পষ্ট ছিল না। পরের বছর ওয়াশিংটনের ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে চিঠি আসে লন্ডনে—

> 'মার্কিন রাজনীতিকরা চাচ্ছে বিশ্ব নেতৃত্ব দিতে। এমনকি "ইংলিশ স্পিকিং নেশন"-এরও নেতা হওয়ার শখ তাদের। এজন্য মার্কিনিরা চায় তাদের শক্তিশালী নৌবহর ও নৌবাণিজ্য বহাল থাকুক। আমেরিকায় পণ্য পাঠিয়ে আমরা যে ঋণ শোধ করছি, তা-ও তারা আর দেখতে চায় না। তারা চায় যতদিন না আমরা ঋণ শোধ করি, ততদিন আমরা একটা "ভেসেল স্টেট" হিসেবে থাকি।'

১৮৭০ সালের আগ পর্যন্ত আমেরিকা ছিল ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ বাজার। ভারী সব স্থাপনায় বিনিয়োগ করে প্রচুর পাউন্ড কামিয়ে নিয়ে আসত ইংরেজরা। ব্রিটিশ বিনিয়োগের পছন্দের একটা খাত ছিল রেল। আরব ও ভারতীয় উপমহাদেশেও রেল নেটওয়ার্ক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা দেখা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে জার্মানিকে ১৩২ বিলিয়ন গোল্ডমার্ক (৬৬০ কোটি পাউন্ড) জরিমানা করা হয় বিজয়ী দেশগুলোর তরফ থেকে। কেন যুদ্ধ বাধালে? এটা, ওটা ক্ষতি হয়েছে...ইত্যাদি অজুহাতে বিপুল পরিমাণে ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হয় জার্মানদের ঘাড়ে। বলা হয়—ছয় দিনের মধ্যে শর্ত না মানলে শিল্পসমৃদ্ধ রূঢ় উপত্যকা দখল করে নেওয়া হবে। এরপর সাবমেরিন ব্যবহারে জার্মানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। জার্মান উপনিবেশগুলোতে তেলের ভান্ডারও দখল করে নেওয়া হলো অচিরেই। গুরুত্বপূর্ণ কয়লাখনি সমৃদ্ধ সার অঞ্চলকে ১৫ বছরের জন্য তুলে দেওয়া হলো ফ্রান্সের হাতে। এমনকি একটি তুর্কি তেল কোম্পানিতে তাদের যে ২৫ শতাংশ শেয়ার ছিল, তা-ও একরকম চাপের মুখে বাগিয়ে নিল ফ্রান্স। ১৯২০ সালের এপ্রিলে আমেরিকা ছাড়া অন্যসব জয়ী নেতারা সানরেমো সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানেই কথা হয়—মেসোপটেমিয়া (আজকের ইরাক) 'লিগ অব নেশন্স'-এর অধীনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে যাবে। আর এই শর্ত মানাতেই ঘুস হিসেবে জার্মানির অধিকারে থাকা ২৫% তেলের শেয়ার ফ্রান্সকে দিয়ে দেয় ব্রিটেন। 'Turkish Petroleum Gesellschaft' নামের ওই কোম্পানিতে থাকা এসব শেয়ার ছিল জার্মান ডয়েচে ব্যাংকের। মেসোপটেমিয়াতে পাওয়া বাকি ৭৫ শতাংশ তেলের শেয়ার অ্যাংলো-পারসিয়ান আর রয়্যাল ডাচ সেলের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের হাতেই থাকে। তেলের ভাগ পেয়ে এবার ফরাসিরাও খুলে ফেলে নতুন তেল কোম্পানি—'Française des Pétroles (CFP)'।

# রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের কৌতুক

একবার বাজারে গেছেন গর্বাচেভ। গিয়ে দেখেন—এক বিক্রেতা মাত্র একটি তরমুজ নিয়ে বসে আছে। কাছে যেতেই বিক্রেতা বলল—'তরমুজ বেছে নেন'। গর্বাচেভ বললেন—'একটাই তো তরমুজ, বেছে নেব কীভাবে?' এবার বিক্রেতার জবাব—'কেন? আপনাকে তো সেভাবেই আমরা বেছে নিয়েছি।'

মিখাইল গর্বাচেভের হাতে টুকরো টুকরো হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। দেশটিতে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে ছিল একটিমাত্র দল—কমিউনিস্ট পার্টি। রুশরা না পারত বিকল্প দলে ভিড়তে, না নির্বাচন করতে পারত কোনো স্বতন্ত্র নেতাকে। অবশ্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ধারণাই এ রকম। গর্বাচেভ হলেন সর্বশেষ কমিউনিস্ট নেতা, যাকে রুশ জনগণ বাছাই করেনি। এজন্য রাশিয়ার কমিউনিজম নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা একটু-আধটু হতেই পারে!

সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী সার্থক কথাশিল্পী শাহাদুজ্জামান তার *পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ* বইটিতে লিখেছেন—

> 'পত্রিকা লিখেছে—মাও সে তুং-এর পৌত্র ওয়াং ঝিয়াং জিও একটি মার্সিডিজ গাড়ি কিনতে চান। খবরটা পড়ে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল হামিদ হোসেনের। সাইকেল আরোহী চীনাদের মুখ মনে পড়তে লাগল তার, মনে পড়তে লাগল চীনা মেয়েদের সরল বেণী। একটা বাহুল্যহীন, বৈষম্যহীন সমাজ—এই তো চেয়েছিলেন মাও সে তুং। অথচ তার বংশধর আজ এমন বিলাসিতার জন্য উন্মুখ। সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। হামিদ হোসেন যদিও ঠিক মাও সে তুং-এর পথের যাত্রী ছিলেন না, তবুও একদিন তিনিও জীবন বাজি রেখেছিলেন একটি বিভেদহীন সমাজের স্বপ্নে।

তার আদর্শ ছিল রুশ লেলিন। তবুও মাওয়ের পৌত্রের সংবাদে হামিদ ব্যথিত হলেন। তার মনে এলোমেলো ভিড় করতে লাগল নানা ছবি, নানা কথা, নানা ভাবনা।'

প্রতিটি বিপ্লবেরই মোটামুটি সমান্তরাল একটা লক্ষ্য থাকে। আর তা হলো—বৈষম্য উপড়ে ফেলা। সমাজতন্ত্রে অবশ্য সুনির্দিষ্টভাবে 'শ্রেণিবৈষম্য' তাড়ানোর প্রতিজ্ঞা পেশ করা হয়, বলা হয় নিখিল সাম্যের কথা। গণতন্ত্রেও সাম্যের কথা আছে, ইসলামি শাসনব্যবস্থায় আছে ন্যায্যতা বা ইনসাফের বয়ান। রাশিয়াতে যে লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে সমাজতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল, তা বেশিদিন সঠিক পথে থাকেনি। বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেখানে পিছিয়ে থাকা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির জাগরণ ও ক্ষমতা বাড়লেও দ্রুতই রুশ সাম্রাজ্যের আগের সেই অভিজাততন্ত্র পুনরায় ফিরে আসে। বিপ্লবের আদর্শ পুঁজিবাদে বিলীন হয়ে যায়, সামষ্টিক চেতনা উবে গিয়ে যাবতীয় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ওঠে একজন মাত্র ব্যক্তি।

রুশদের প্রভাবে পূর্ব ইউরোপে যারা সমাজতন্ত্র কায়েম করেছিল, সময়ের পরিক্রমায় তাদেরও ছুড়ে ফেলে জনগণ। গর্বাচেভ মনে করলেন, ঠিক এই জায়গাতেই হাত দেওয়া দরকার। সংস্কার করতে গিয়ে তার হাতেই মারা পড়ল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। শেষ পর্যন্ত গর্বাচেভ বিদায় হলেন বটে, কিন্তু ক্রমশ ভেঙে খানখান হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সমাজতন্ত্র নিয়ে আরও দু-চারটা কৌতুক বলা যাক—

'এক আমেরিকান তার রুশ বন্ধুকে বলছে—"আমাদের ওখানে পুরোপুরি স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছে করলেই আমি হোয়াইট হাউজের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলতে পারি, পুঁজিবাদ নিপাত যাক।"'

'এতে গর্ব করার কী আছে?' অবাক হলো রুশ বন্ধু। বলল—'আমিও যখন-তখন ক্রেমলিনের সামনে গলা ফাটিয়ে বলতে পারি—"পুঁজিবাদ নিপাত যাক।"'

গ্রাম থেকে এক বুড়ি এসেছেন মস্কোতে বেড়াতে। শহরের মাঝখানে লেলিন আর স্ট্যালিনের মূর্তি দেখে বুড়ি জানতে চাইলেন মূর্তিগুলো কার। কেউ একজন জবাব দিলেন—

'এটা মহামতি লেলিনের মূর্তি, উনি আমাদের জারের বর্বর শাসন থেকে মুক্ত করেছেন। আর ওটা মহান স্ট্যালিনের মূর্তি, তিনি আমাদের নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করেছেন।'

'ঈশ্বর তাদের দীর্ঘজীবী করুন'—বুড়ি বললেন। 'আহা, কমিউনিস্টদের কবল থেকেও যদি এরা আমাদের মুক্ত করতেন!'

চীনও আনুষ্ঠানিক সমাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন সেখানে যা চলছে, তাকে বড়োজোর বলা যেতে পারে ছায়া সমাজতন্ত্র। শাহাদুজ্জামানের গল্পে সেই আক্ষেপের কথাই ধ্বনিত হয়েছে। চীনা সমাজতন্ত্রের আধ্যাত্মিক নেতা মাও সে তুং-কে নিয়েও বেশ কিছু মুখরোচক গল্প রয়েছে।

'আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট আনোয়ার হোজা একবার চেয়ারম্যান মাওয়ের কাছে একটি তারবার্তা পাঠালেন—

'কমরেড মাও! আমার দেশে খাবার নেই। আমরা ক্ষুধার্ত। শিগগিরই খাবার পাঠান।'

মাও সে তুংয়ের উত্তর—

'কমরেড আনোয়ার হোজা! আমাদের দেশেও উদ্বৃত্ত খাবার নেই। আপনি আপনার দেশবাসীকে কোমরের বেল্ট শক্ত করে এঁটে বাঁধতে বলুন। এতে ক্ষুধা কিছুটা উপশম হতে পারে।'

আনোয়ার হোজার জবাব—

'কমরেড মাও! আপনার বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের বেল্ট নেই। আপনি প্রচুর পরিমাণে বেল্ট পাঠিয়ে দিন।'

সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে উত্তর কোরিয়া, কিউবা এমনকি ভেনেজুয়েলাকেও রাখা চলে না। প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা সংস্করণ দাঁড়িয়ে গেছে। উত্তর কোরিয়া বা ভেনেজুয়েলার সমাজতন্ত্রকে যদি কাল মার্কসের সমাজতন্ত্র বলতে হয়, তাহলে ডিক্টেটরশিপের সংজ্ঞা আলাদা করে লিখতে হবে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন যে ধরনের বিলাসী জীবনযাপন করছেন, তা সমাজতান্ত্রিক ধারার সাথে একেবারেই খাপ খায় না। তার দেশের মানুষ পুরো বিশ্ব থেকে

একেবারে বিচ্ছিন্ন। তাদের না আছে কথা বলার স্বাধীনতা, না আছে বাইরের দুনিয়ার সাথে কোনোরকম যোগাযোগ। স্ট্যালিনের ভয়ার্ত শাসনে রাশিয়া কী পেয়েছে? তখন রাশিয়া কেবলই এক পরাশক্তি; যেখানে ধর্ম, গণমাধ্যম কিংবা জবানের কোনো স্বাধীনতা ছিল না।

জোসেফ স্ট্যালিন শহর-বন্দর উন্নয়ন করতে চেয়েছেন শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে। আর তিনি সেটি করতে চেয়েছেন প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে, গ্রামের কৃষক-শ্রমিকদের কাঁধে ভর করে। এর ফলাফল দাঁড়ায় ভয়ংকর। নজিরবিহীন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ। কোটি কোটি মানুষ কোনোরকম খেয়ে মরার মতো বেঁচে থাকে, লাখ লাখ লাশ পড়ে থাকে গ্রামে-বন্দরে। শ্রমিকদের দিয়ে একটি অভিজাত গোষ্ঠীকে তাড়িয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসা সমাজতন্ত্র এভাবেই হোঁচট খায়। এ দায় সমাজতন্ত্রের না বলশেভিকদের, নাকি কেবলই স্ট্যালিনের—সেটি ভিন্ন এক আলোচনা। সত্যটা হলো—জারের শৃঙ্খলমুক্ত হওয়া মানুষ সমাজতন্ত্রের খানা-খন্দকে পড়ে চিড়েচ্যাপটা হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে রুশরা সমাজতন্ত্র থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু সমাজতন্ত্রের কঙ্কালে যে একনায়কতন্ত্র দাঁড়িয়ে গেছে, সেখান থেকে এখনও মুক্তি মেলেনি।

# চীনা সমাজতন্ত্র যেভাবে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছিল

স্ট্যালিনের নিষ্ঠুরতম নগর উন্নয়ন পলিসি অনুসরণ করেছিল তারই প্রতিবেশী আরেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন। রুশদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিতে পারতেন চীনা সমাজতন্ত্রের আধ্যাত্মিক গুরু মাও সে তুং। কিন্তু সে পথে হাঁটেননি তিনি। একগুঁয়ে মাও আর তার কমিউনিস্ট পার্টির হেলায় চীনে দেখা দেয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। কারও কারও মতে, চার কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল এই দুর্ভিক্ষে। কেউ কেউ বলেছেন, সাড়ে তিন বা চার কোটি। সংখ্যা যা-ই হোক না কেনো; মৃত্যুর পরিমাণ যে কোটির কম নয়, এ নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। চীন নিজেও তা অস্বীকার করে না। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২, এই পাঁচ বছর মেয়াদে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা 'গ্রেট লিপ ফরোয়াড প্রজেক্ট' হাতে নিয়েছিলেন মাও সে তুং। সেই পরিকল্পনা সফল তো হয়ইনি; বরং কোটি মানুষ এর মূল্য চুকিয়েছে নিজেদের জীবন দিয়ে। সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয় ১৯৫৯ থেকে ৬১ সালের মধ্যে। চীনা কৃষকরা এই সময়টাকে দেখে 'তিনটি তিক্ত বছর' হিসেবে। পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ ছিল, বোঝা যায় তখনকার জিনজিয়াং প্রদেশের সরকারি দলের এক নেতার কথায়—

> 'আমি এক গ্রামে গিয়ে ১০০ লাশ দেখি, তারপর অন্য এক গ্রামে গিয়ে দেখি আরও শ খানেক লাশ। কেউ তাদের দিকে মনোযোগ দেয়নি। লোকজন বলছিল—শেয়াল-কুকুর মানুষের মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে। আসলে তারা সত্য বলছিল না। কারণ, আরও বহু আগেই মানুষই শেয়াল-কুকুর খেয়ে ফেলেছিল।'

কমিউনিস্টরা নিজেদের ধ্বংস করে দিয়েছে। কারণ, তারা অর্থনীতির কার্যকরী কোনো মানদণ্ড দাঁড় করাতে পারেনি। তাদের অর্থনৈতিক ভাবনা সমাজকে পুনর্গঠিত ও যুগোপযোগী করতে পারেনি। তাই যে রাশিয়াতে এই কমিউনিজম প্রথমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পেরেছিল, সেখান থেকেই শুরু হয় তার বিনাশ পর্ব। রাশিয়ার দেখানো পথে হাঁটতে গিয়ে চীনে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মারা যায় কোটি কোটি মানুষ। চীন অবশ্য এই সংকট থেকে বের হতে পেরেছিল, ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এজন্য তাকে আপস করতে হয়েছে পুঁজিবাদের সাথে। দুর্ভিক্ষের পর কী করে ঘুরে দাঁড়াল চায়না? সমাজতন্ত্রের মৌলিকত্ব কি আদৌ টিকে ছিল সেখানে?

# বলশেভিক বিপ্লব

বিশ্ব যখন প্রথম মহাযুদ্ধে ঘাম ঝরাচ্ছে, তখন নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরছে রুশরা। গৃহযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণির বিদায় হয়। জারতন্ত্র উপড়ে ফেলে বিশ্বে প্রথমবারের মতো নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে সমাজতন্ত্রীরা। রুশ সাম্রাজ্যের পরিবর্তে উত্থান ঘটে সোভিয়েত ইউনিয়নের। কেউ বলেন, এটা কমিউনিস্ট বিপ্লব, কারও কারও ভাষায় তা রুশ বিপ্লব। এই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন লেনিন। তার সাথে ছিলেন আরও দুই সহযোদ্ধা—জোসেফ স্ট্যালিন ও লিও ট্রটস্কি। কিন্তু লেলিনের মৃত্যুর পর তার সহযোদ্ধাদের রেষারেষিতে কমিউনিজমের অন্ধকার চিত্র বিশ্বের সামনে উলঙ্গ হয়ে যায়। স্ট্যালিন শুরু করেন গুম-খুনের শাসন। দেশ ছাড়তে হয় ট্রটস্কিকে, তবুও পালিয়ে বাঁচতে পারেননি তিনি। স্ট্যালিনের গোয়েন্দারা উত্তর আমেরিকায় গিয়ে ট্রটস্কিকে লাল সালাম জানিয়ে আসে।

১৯১৭ সালে রাশিয়াতে মূলত বিপ্লব হয়েছিল দুটি। একটি হয় ফেব্রুয়ারির দিকে (বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মার্চ) আর অন্যটি অক্টোবরে (বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নভেম্বর)। ফেব্রুয়ারির বিপ্লবে ক্ষমতায় এসেছিল মেনশেভিকরা। রাশিয়াকে আধুনিক পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তারা। আর নভেম্বরের বিপ্লবীরা রাশিয়াকে পরিণত করে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। এরাই বলশেভিক। এজন্যই এই বিপ্লব পরিচিত বলশেভিক বিপ্লব নামে। কাজেই মেনশেভিক আর বলশেভিক—এই দুই বিপ্লবের সমন্বিত নামই রুশ বিপ্লব।

বিপ্লবীদের ভাষায়—বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার কেন্দ্রে আছে শ্রমিক আর মেহনতি মানুষ অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত সমাজ। তারা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে যেভাবে চাইবে,

সেভাবেই চলবে রাষ্ট্রকাঠামো। প্রথম এ রকম স্যোশালিস্ট বিপ্লবের ধারণা নিয়ে এসেছিলেন জার্মান চিন্তক কাল মার্কস। তার এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই রাশিয়াতে জন্ম নেয় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা টিকেছিল ৭২ বছর। অবশ্য ফ্রান্সের প্যারিসে তারও ৪৫ বছর আগে শ্রমিকরা প্যারি-কমিউন গড়ে তুলেছিল। কাকতালীয় বিষয় হলো, আক্রমণের মুখে সেই কমিউন টিকেছিল মাত্র ৭২ দিন।

পুরো ইউরোপ একসময় গিলে খেয়েছিল সামন্তবাদীরা। ফসল ফলানো হতো দরিদ্র কৃষক আর সমাজের নিচু স্তরের লোকজনকে দিয়ে। কিন্তু এই চাষিদের না দেওয়া হতো ফসলের ভাগ, না দেওয়া হতো জমির মালিকানা। নিপীড়িত এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বলা হতো 'ভূমিদাস'। ১৯ শতকে যখন পুরো ইউরোপ শিল্পায়নের জোয়ারে ভাসছে, রাশিয়াতে তখনও খুঁটি গেড়ে বসেছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র। ইচ্ছেমতো খাজনা চাপানো হতো কৃষকদের ওপর। আর অবাধ্যদের শাসানো হতো নাইটদের[১৭] দিয়ে। ফলে ইউরোপের অন্যান্য অংশের মতো একসময় রাশিয়াতেও শোনা গেল সামন্তবাদ পতনের ধ্বনি। সামন্তবাদ টিকে থাকবেই-বা কী করে? জোর-জবরদস্তি করে ফসল ফলাতে বাধ্য করা গেলেও প্রেষণা না থাকলে উৎপাদন তো আর বাড়ানো যায় না।

প্রকাশ্যে যখন প্রতিবাদ করা যায় না, তখন চরমপন্থার আশ্রয় নেয় শোষিতরা। রাশিয়াতেও তা-ই হয়েছে। সমগ্র রাশিয়াজুড়ে গড়ে ওঠে নানা রকম গুপ্ত সমিতি। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের ঘটনা ঘটতে থাকে নিয়মিত। প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ান জার রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন।

একটা সময় পর রাশিয়াতেও পরিবর্তন এলো। ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ হলো রাশিয়ার বুক থেকে। লাখো শ্রমিকের হাড়-মাংসের ওপর দাঁড়াল কলকারখানা। এই শিল্পায়ন বগল দাবা করে নিয়ে এলো পুঁজিবাদকে। শিল্পনগরী সেইন্ট পিটার্সবার্গ আর মস্কোর জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হলো।

---

[১৭] নাইট হলেন কোনো শাসক বা দেশকে সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসেবে, বিশেষ করে সামরিক কাজের জন্য সম্মানসূচক উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। মধ্যযুগে নিম্নশ্রেণির অভিজাত হিসেবে নাইটরা বিবেচিত ছিল। তবে মধ্যযুগের শেষের দিকে এসে এই পদ বীরত্বের সূচক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মূলত নাইট হলেন একজন সামন্ত, যিনি কোনো অভিজাত ব্যক্তির যোদ্ধা হিসেবে তার রাজস্ব আদায় করে থাকেন। নাইটরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করায় পারদর্শী ছিলেন।

এখন কি আর আগের লাইফস্টাইল সম্ভব? খরচ বাড়ল ভয়াবহভাবে আর তার প্রতিক্রিয়াতেই জন্ম নিল সর্বহারা মজুর শ্রেণি।

নামমাত্র মজুরিতে দিনভর খাটানো হতো শ্রমিকদের, কিন্তু তাতেও রক্ষে ছিল না। এদেরই আবার চড়াদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হতো মালিকের দোকান থেকে। এভাবে ধনী আরও ধনী হলো আর দরিদ্ররা ঘুরপাক খেতে লাগল এক অমোঘ দুষ্টচক্রে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষের প্রতিবাদী না হয়ে আর উপায় থাকে না। খেয়ে-পরে বাঁচার দাবিতে আবারও শুরু হলো আন্দোলন। সময় গড়াতে থাকল। একসময় দুনিয়ার বুকে নেমে এলো প্রথম মহাযুদ্ধ। রুশ সেনারা তো যোগ দিলোই; সাধারণ কৃষক, তরুণ আর যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে পাঠানো হলো রণাঙ্গনে। এদের অনেকেরই কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ বা যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিল না। তিন বছরে প্রায় ২০ লাখ রাশিয়ান সৈন্য নিহত এবং ৫০ লাখেরও বেশি আহত হয়। যুদ্ধের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিতে দেখা দেয় তীব্র খাদ্য সংকট। এরই পরিণতিতে সংঘটিত হয় রুশ বিপ্লব।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিরিজ গণবিক্ষোভের পর ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস। তার পতনের পর রুশ উদারপন্থি দলগুলো মিলে সরকার গঠন করে। লক্ষ্য ছিল রাশিয়াকে একটি আধুনিক পশ্চিমা ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পথে নিয়ে যাওয়া। তাদের মূল আদর্শ ছিল ফরাসি বিপ্লব। ফেব্রুয়ারি তথা মার্চে রাশিয়ার ক্ষমতায় আসে মেনশেভিকরা। তারা চেয়েছিল রাশিয়াকে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে। কিন্তু তাদেরই পিছু পিছু ধেয়ে আসছিল আরেকটি প্রতিবিপ্লব।

৩রা এপ্রিল আরেকজন ক্যারিশমেটিক নেতা ১০ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে ভাঙাচোরা একটি ট্রাকে করে বর্তমান সেন্ট পিটার্সবার্গ বা পেত্রোগ্রাদে এসে পৌঁছালেন। তার নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ লেনিন। শুরুতেই অন্তবর্তী সরকারকে উৎখাত করার ডাক দিলেন তিনি। তার ভাষায়, ওই সরকার ছিল একটি বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সরকার। লেলিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিকরা নভেম্বরে বিপ্লবে সফল হলো। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে গেল রাশিয়া। কারণ, লেলিন মনে করতেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মূলত সাম্রাজ্যবাদী কুকুরদের মধ্যে কামড়াকামড়ি। পাঁচ বছরের গৃহযুদ্ধ শেষে ১৯২২ সালে গঠন করা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন।

# রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কারণ

সমাজতন্ত্রীরা একাধিক দলে বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে, দেশে দল থাকবে একটাই। তারাই মেহনতি মানুষের পক্ষে দেশ পরিচালনা করবে। তারা যা বলবেন এবং করবেন সেটাই আইন। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়া কমিউনিস্ট সরকার শিগগিরই মানুষের কণ্ঠ রোধ করাকে নিজেদের খাস দায়িত্ব মনে করল। বিপ্লবের নেতারাও জড়ালেন কোন্দলে। লেলিনের পর এলেন স্ট্যালিন। তার সময়েই বিশ্ব দেখল কমিউনিজমের এক ভয়ংকর চেহারা। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র কেন ব্যর্থ হলো, তার ব্যাখ্যায় মূল কারণের আশপাশে যেতে চান না এর অনুসারী গোষ্ঠী। তারা আলাপ জমান প্রাসঙ্গিকতার বাইরে গিয়ে। এখানেও তাদের আঙুল চিরশত্রু বুর্জোয়াদের দিকে। এরা মনে করেন, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার নেপথ্যে আছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুর্জোয়ারা—যারা বিপ্লব কায়েম হওয়ার পরও মুনাফার এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য মুখিয়ে থাকে।

লেনিন বলতেন, বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া বরং সোজা, কিন্তু হাজার হাজার খুদে পাতি বুর্জোয়াদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা পরিবর্তন করে তাদের সমাজকেন্দ্রিক মানসিকতা গড়ে তোলা অনেক বেশি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কী আশ্চর্য কথা! সমাজতন্ত্র যদি তৃণমূলে পরিবর্তনই না আনতে পারল, মানুষের চিন্তাকাঠামো, দর্শন, রুচি ও বিশ্বাসে আঘাত হানতে না পারল, তাহলে বিপ্লবের অর্থ কী? কার স্বার্থে কাদের নিয়ে এই বিপ্লব? যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে চিন্তা কাঠামো ও শাসন কৌশলে কোনো পরিবর্তন আসে না, কেবল শাসকগোষ্ঠী পরবর্তিত হয়, তাকে আমরা বিপ্লব বলব কোন যুক্তিতে? বরং তা বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

আদিম যুগে উৎপাদন যন্ত্রে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। মূলত ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে, ঠিক কী করতে হবে, কোন পণ্য উৎপাদন করা প্রয়োজন—এসব বিষয়ে তাদের ধারণা থাকার কথাও নয়। মানুষ আবহমান কাল থেকেই দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। একত্রে বসবাস করার এই রীতি থেকেই ট্রাইব বা গোত্র ধারণার জন্ম। তারা যেমন একসাথে শিকার করত, ভোগও করত একসাথে। কিন্তু নানারকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সাথে সাথে আদিম সমাজে ভাঙন শুরু হলো। তারা ঘরবাড়ি নির্মাণ, কৃষি কাজ, পশুপালনের দক্ষতা অর্জন করল। ফলে 'শ্রমবিভাগ' নামের ধারণা জাগ্রত হলো লোকেদের অজ্ঞাতসারেই। অর্থাৎ আগে যেমন সবাই যেকোনো কাজ একসাথে করত, সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন এলো। এবার একেক কাজ বন্টন করে দেওয়া হলো একেকজনের মধ্যে। এতে দক্ষতা ও পেশাদারত্ব বাড়ল। এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের যোগাযোগ বেড়ে গেল, চালু হলো বিনিময় প্রথা। ফলে উৎপাদন যন্ত্র বা সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার আসার ফলাফল কী দাঁড়াল?

দেখা গেল, কিছু কিছু মানুষ বেশ শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তারাই জায়গাজমির মালিক হলো। আবার সেই জমি দেখভাল করার জন্য দরকার পড়ল নিজস্ব বাহিনী। প্রভাবশালী এই মানুষগুলোই হলো খুদে রাজা, ভূ-স্বামী বা জমিদার। আর এই প্রথাটাই হলো সামন্তবাদ। কৃষকরা ফসল ফলাবে, কিন্তু জমির মালিকানায় থাকতে পারবে না। ফসলও ইচ্ছেমতো নিজের ঘরেও নিতে পারবে না, সব চলে যাবে রাজা বা জমিদারের পেটে। কৃষকের এত কষ্টের বিনিময়ে কেবল ক্ষুধা নিবারণ, নিজের আর পরিবারের। কোথাও কোথাও অবশ্য এর অন্যথা হয়েছে। কৃষকরা সেখানে জমিদারদের কাছ থেকে ফসল উৎপাদনের জন্য জমি নিতে পারত, তার বিনিময়ে দিতে হতো নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা। খাজনা দিতে না পারলে জমি কেড়ে নেওয়া হতো। ভারতবর্ষে লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই ধরনের জমিদারি ব্যবস্থা একরকম উচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন।

সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার চলে আসায় আরেকটা সংকট তৈরি হলো। যাদের হাতে কোনো সম্পদ ছিল না, তারা আগের মতোই গতর খাটিয়ে বেঁচে থাকল। আর যাদের হাতে সম্পত্তি বা উৎপাদনের উপকরণ এলো, তারা সেখান থেকে আয় করতে লাগল অঢেল অর্থ। এই আয় নিশ্চিত হলো অন্যের পরিশ্রমে।

আর শ্রমিকশ্রেণি জীবন নির্বাহ করতে লাগল শারীরিক শ্রম বিক্রি করে। এমনিভাবে আরও কিছু শ্রেণি এলো, যাদের অবস্থান প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মাঝে। অর্থাৎ কারখানা ব্যবস্থাপক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ইত্যাদি। এইভাবে এককালের আদিম জনগোষ্ঠী নানা শ্রেণিতে ভাগ হয়ে গেল। পৃথিবীতে এলো ক্যাপিটালিজম। সমাজতন্ত্র বলছে, এটা অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। সম্পত্তিতে বা উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা বা অধিকার যেমন পুঁজিবাদের প্রধান খুঁটি, তেমনি স্যোশালিজমের প্রধানতম ভিত্তি হলো উৎপাদন যন্ত্রে সবার সমান অধিকার। তাই স্যোশালিস্টরা এলো শ্রেণি বৈষম্য ভাঙার মন্ত্রণা নিয়ে। এজন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াল তারা। ভোগবাদী, বুর্জোয়ার গোষ্ঠী হটিয়ে শ্রমিক সাধারণ বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণিকে সাথে নিয়ে বিপ্লব করে বসল কিছু লোক। রুশ সাম্রাজ্য রূপ নিল সোভিয়েত ইউনিয়নে, কিন্তু এই বিপ্লব টিকল না কেন?

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র পতনের মূলে যে বিপ্লবী নেতারাই ছিলেন, এই কথা বেশিরভাগ বামপন্থি আলাপেই আনেন না। এখানেও কন্সপিরেসি থিউরি! তারা মনে করেন—পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রই সমাজতন্ত্রকে টিকতে দেয়নি। কিন্তু বেড়ায় ছিদ্র থাকলে আপনি হুলোবিড়াল আটকাবেন কী করে?

প্রথমত, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার দুর্নীতি, নৈতিক অধঃপতন আর জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি সমাজতন্ত্র পতনে ভূমিকা রেখেছে। নেতারা গণমানুষকে সম্পৃক্ত করে বিপ্লব সফর করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে আর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি তারা। সময়ের সাথে সাথে তাদের গণবিচ্ছিন্নতা বাড়ল। খেয়ালখুশিমতো পলিসি তৈরি করে চাপিয়ে দেওয়া হলো সাধারণের ওপর। জবাবদিহিতা না থাকায় কমিউনিস্টদের ভেতরেই একটা স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাভোগী শ্রেণি গড়ে উঠল। তারাই বাগিয়ে নিল রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ। জনবিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কেবল ক্ষমতার জোর বা বন্দুকের নলে কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এর সবচেয়ে বড়ো ও জঘন্য উদাহরণ স্ট্যালিন।

সমাজতন্ত্র পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো পুরোনো প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে যাওয়া। কীভাবে? এই ব্যবস্থায় কে কী উৎপাদন করবে, তার কোটা সংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। অনেকেই মনে করল,

ওই নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্য তৈরি করলেই তারা দায়মুক্ত। ফলে পণ্যের গুণগত মান নিয়ে তাদের আগ্রহ বা আন্তরিকতা ছিল না। বাজারে মানহীন জিনিস বেড়ে গেল, তাই মানুষ দেশীয় পণ্যসামগ্রী বাদ দিয়ে ঝুঁকে পড়ল বিদেশি পণ্যের দিকে। নিজেদের পণ্যের চাহিদা বাড়ুক বা না বাড়ুক, বেচা হোক বা না হোক, বেতন কিন্তু সবাই ঠিকই পেত। কারণ, সিস্টেমটাই সমাজতান্ত্রিক। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ল, রুশমুদ্রা রুবল দুর্বল হলো আর ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকল বিদেশি মুদ্রা। রুশরা চাইল, তাদের হাতে প্রচুর ডলার থাকুক। কারণ, ডলার শক্তিশালী হচ্ছে। আর তাতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি মানুষের ঘৃণা-ক্রোধ বাড়তেই থাকল।

যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল এক ডজনেরও বেশি প্রজাতন্ত্র নিয়ে, তাই এখানে নানা ভাষাভাষী ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ ছিল। তবে সংখ্যায় রুশরাই ছিল বেশি এবং সাংস্কৃতিকভাবেও তারা ছিল বেশ সমৃদ্ধ। কমিউনিস্ট পার্টি সুবিধাভোগী আর তোষামোদকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় পেছনে পড়ে থাকা জাতিগোষ্ঠীর ওপর রুশদের খবরদারি বাড়ল। অথচ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈষম্য উপড়ে ফেলে সমান অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু রুশদের আচরণে অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোকজন নিজেদের অবহেলিত ও বঞ্চিত ভাবতে থাকল। এমন অবিশ্বাস আর আধিপত্যবাদী পরিস্থিতিতে বঞ্চিতদের মাথায় ভর করল জাতীয়তাবাদ। গর্বাচেভের নীতির কারণে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুরু করল ছোটো ছোটো প্রজাতন্ত্রগুলো। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

# চীন ও সাম্রাজ্যবাদ

এই যে পৃথিবী জুড়ে এতকিছু ঘটেছে বা ঘটছে, নব্য পরাশক্তি চীন কি তাতে একদমই অনপুস্থিত? আমরা যদি চীনকে এই সাম্রাজ্যবাদের সাথে বিবেচনায় আনতে চাই, তাহলে পশ্চিমের সাথে হওয়া চীনের আফিম যুদ্ধ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। চীনকে এই যুদ্ধে জড়ানো হয়েছিল পুরোপুরি অন্যায়ভাবে, কেবলই বাণিজ্যিক স্বার্থে। ১৮ শতকের শেষের দিকে চীনের সাথে ব্রিটেনের বাণিজ্য ঘাটতি অস্বস্তিকর পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। ব্রিটেন তার পুরোনো প্রথা অনুযায়ী রৌপ্যমুদ্রা দিয়েও তার রাশ টেনে ধরতে পারেনি। একই পলিসি তারা ভারতবর্ষেও গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষে তার প্রভাব ছিল মারাত্মক। চীনের সাথে হওয়া ব্রিটেনের আফিম যুদ্ধের কারণ, প্রেক্ষাপট ও ফলাফল তুলে ধরার আগে এই পলিসির বিষয়ে একটু ধারণা দেওয়া দরকার। ভারত থেকে সম্পদ লুটপাটের বর্ণনা দিলে আশা করি বিষয়টি সকলের কাছে পরিষ্কার হবে।

# ভারতবর্ষে ইংরেজদের লুটপাটের ইতিহাস

ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে প্রায় ২০০ বছর। এই সময়ে তারা ভারতবর্ষ থেকে লুট করেছে প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার সমমূল্যের সম্পদ। মাত্র কয়েক বছর আগের এক গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য। একবার ভাবুন তো, এই অঙ্কটা ঠিক কত বড়ো! এই লুট করা ডলারের অঙ্ক ব্রিটেনের এখনকার জিডিপি থেকে ১৫/১৬ গুণ বেশি!

ইংরেজরা নিজেদের ভারতবর্ষ উন্নয়নের রূপকার ভাবতে পছন্দ করে। তারা নাকি সাম্রাজ্য গড়ে বরং ভারতের উপকারই করেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে রেল চালু করেছে, বড়ো বড়ো ব্রিজ গড়েছে, স্থাপনা তৈরি করেছে, প্রণয়ন করেছে নানাবিধ আইনকানুন। তাদের এই উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে আমরা অনেকে আবার হাততালিও দিই। ভারতবর্ষকে দেওয়া ছাড়া তাদের নাকি অর্থনৈতিক কোনো অর্জন নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি ইংরেজরা ভারতে এসেছিল নিজেদের সম্পদ বিলিয়ে দিতে? টানা ২০০ বছর ধরে এই মহান কাজটি করে গেল তারা?

কিন্তু এই ইংরেজ বদান্যতার গল্প যারা দিয়ে থাকেন, তাদের নাকেমুখে জল ঢেলে দিয়েছে একটি গবেষণা। এই গবেষণাপত্র বেরিয়েছে খোদ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে—যেখানে দেখানো হয়েছে প্রায় ২০০ বছরের ভারতবর্ষ শাসনে ইংরেজ তথা ব্রিটিশরা এই অঞ্চল থেকে ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যমানের সম্পদ নিয়ে গেছে। এটাকে বড়ো চুরিও বলতে পারেন, আবার লুটপাটও বলতে পারেন। গবেষক উৎস পাটনায়েক ১৭৬৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ট্যাক্স আর বাণিজ্য ডাটা থেকে বিশাল লুটপাটের এই অঙ্ক বের করেছেন। ইংরেজরা এই অর্থ-সম্পদ লুট করেছে অদ্ভুত এক ট্রেড পলিসি ব্যবহার করে। পূর্ণ কলোনি গড়ার আগে তারা ভারতীয়দের কাছ থেকে

চাল আর টেক্সটাইলসসামগ্রী কিনত রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে। সে সময় সব দেশের সাথে রুপার মাধ্যমেই বাণিজ্য করত তারা। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ চলে যায় ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। বক্সারের যুদ্ধে মির কাসিমের পরাজয়ের পর আরও পোক্ত হয় ব্রিটিশ আধিপত্য। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ বাণিজ্য তখন তাদের করতলে। সরাসরি রাজস্ব আদায় শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আদায় করা অর্থের এক-তৃতীয়াংশ তারা ব্যয় করে নিজেদের ব্যবহার্য ভারতীয় পণ্য কেনার কাজে। এর অর্থ হলো—ভারতীয় পণ্য কিনতে নিজের পকেট থেকে টাকা দেওয়া লাগছে না। মানে ব্রিটিশরা ভারতীয় পণ্য পেত কোনো রকম মূল্য না চুকিয়েই। আর এই টাকাটা মূলত যেত ভারতের কৃষক আর তাঁতিদের পকেট থেকে। কিন্তু অসচেতন ভারতীয়রা এই চুরি ধরতেই পারেনি। ধরবেই-বা কী করে; ইংরেজরা ট্যাক্স আদায় করতে যাদের পাঠাত, তাদের আবার ভারতীয় পণ্য কেনায় পাঠাত না। দুটি দল একই হলে হয়তো কিছুটা আঁচ পাওয়া যেত। কিন্তু ধুরন্ধর ইংরেজরা ছিল খুব সতর্ক। এই যে ভারতীয় পণ্য এরা বিনামূল্যে পেয়ে যেত; তার খানিকটা নিজেরা ভোগ করত, বাকি যা থাকত তা আবার রপ্তানি করত তৃতীয় কোনো দেশে। মানে পুঁজি ছাড়া ব্যাবসা আরকি! এইভাবে যে মুনাফা আসত, সেই অর্থ দিয়ে তারা ক্রয় করত শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। যেমন : লোহা, পিচ, কাঠ ইত্যাদি। মানে ইন্ডিয়া থেকে চুরি হওয়া অর্থ-সম্পদেই শিল্পায়ন হয়েছে ব্রিটেনে; অথচ তারাই এখন সভ্যতার ধ্বজাধারী।

সিপাহি বিদ্রোহের পরের বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ব্রিটিশ সরকার। তখন থেকেই ভারতবর্ষে শুরু হয় ব্রিটিশ রাজপরিবারের সরাসরি শাসন। এবার ট্যাক্স আদায়ের নতুন নিয়ম এবং ক্রয় সিস্টেম চালু করা হয়। রানির সরাসরি শাসন শুরু হওয়ায় ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এতদিনের একচ্ছত্র ব্যাবসা ভেস্তে যায়। অন্যান্য দেশে সরাসরি পণ্য রপ্তানির সুযোগ পায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। অবশ্য এখানেও 'কিন্তু' আছে। তখনও ব্যাবসার যাবতীয় লেনাদেনা চুকাতে হতো ব্রিটেনের তদারকিতে। কীভাবে ঘটত সেটা? কেউ যদি ভারত থেকে পণ্য কিনতে চাইত, তাদের অবশ্যই 'স্পেশাল কাউন্সিল' ব্যবহার করতে হতো। ভাবছেন এটা আবার কী জিনিস? এটা মূলত একধরনের কাগজি মুদ্রা, যা ইস্যু করত ব্রিটিশ সরকার। এই বিল তথা কাগুজে মুদ্রা পেতে হলে লন্ডন থেকে সোনা বা রুপার

বিনিময়ে ভারতীয় পণ্য কিনতে হতো। বাইরের ব্যবসায়ীরা লন্ডনে সোনায় দাম পরিশোধ করত, বিনিময়ে পেত এই বিল। সেই বিল দিয়ে তারা দাম শোধ করত ইন্ডিয়ান রপ্তানিকারক বা উৎপাদকদের। যখন ইন্ডিয়ার ব্যবসায়ীরা এই বিল স্থানীয় কলোনি অফিস থেকে ক্যাশ করত; তাদের ট্যাক্স কেটে রেখে দেওয়া হতো রুপি, যা কিনা তাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই বাস্তবে ভারতীয়দের মূলত মূল্য শোধ করা হলো না; বরং স্রেফ প্রতারণা করা হলো তাদের সাথে।

এর ফলাফল কী দাঁড়াল? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে ভারতীয়দের যখন ব্যবসায় উদ্‌বৃত্ত চলছিল, তখন জাতীয় হিসাবপত্রে দেখা গেল বিস্তর ঘাটতি। এটা কেন হলো? কারণ, টাকা তো সব ব্রিটিশদের পকেটে চলে গেছে। এরা বোঝাত, ভারত তাদের জন্য মূলত একটা বোঝা। কিন্তু প্রকৃত চিত্র ছিল একেবারে উলটো। এভাবে ইন্ডিয়ানদের হাতে যা মুনাফা আসার কথা ছিল, তা চলে গেল ইংরেজদের হাতে। মানে ভারতবর্ষ ছিল একটা সোনার ডিম পাড়া হাঁস, আর বাঘডাঁস হয়ে সেই ডিম ক্রমাগত গিলে খেয়েছে ব্রিটেন। এই কপটতার আরেকটা নেতিবাচক ফল হয়েছিল। যেহেতু পকেটে টাকার ঘাটতি, ফলে ভারতীয়রা আমদানি বাণিজ্যের জন্য ঋণ চাইল ব্রিটিশদের কাছে। এভাবে ভারতীয় জনসংখ্যার বড়ো একটা অংশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ব্রিটেন এই চুরি করা অর্থ কাজে লাগাতে শুরু করল নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারে। শুধু তা-ই নয়; ভারত থেকে লুটপাট করা টাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও অন্য বিদ্রোহী ভূখণ্ডের শাসকদের সাথে যুদ্ধ করত তারা।

কাজেই ইংরেজরা ভারতবর্ষ উন্নত করার যে গল্প দিয়ে থাকে, তা তাদের একতরফা দাবি। সেখানে সত্যতার উপস্থিতি নেই; বরং ভারতের ধনসম্পদেই তাজা হয়েছে ব্রিটেন।

আবারও চীন ইস্যুতে ফেরা যাক। চীন থেকে চা ক্রয় করত ব্রিটেন, কিন্তু চীনারা ইংরেজদের কাছ থেকে কোনো পণ্য কেনার প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে চীনের সাথে ট্রেড ব্যালেন্স বা বাণিজ্য ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনি ব্রিটেন। পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনতে সাংঘাতিক অনৈতিকতার আশ্রয় নিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি; এজন্য ভারত সাম্রাজ্যকে ব্যবহার করতেও ছাড়ল না তারা। সেই গল্পটাই এবার বলা যাক।

# আফিম নিয়ে যুদ্ধ

সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩

চীন সম্রাটের গ্রীষ্মকালীন বাড়িতে এসেছে ব্রিটিশ রাজপরিবারের একটি প্রতিনিধিদল। তারা সাথে নিয়ে এসেছে বিলেতে তৈরি একগাদা উপঢৌকন— জানালার গ্লাস, টেলিস্কোপ, এয়ার পাম্প আর লোহা ও ইস্পাতের তৈরি কিছু জিনিসপত্র। ব্রিটিশরা এসেছে বাণিজ্য সফরে; ভারতীয়দের মতো চাইনিজদের সাথেও ব্যাবসা করতে চায় তারা। ইংরেজরা বাণিজ্যের স্বার্থেই কলোনি গড়েছিল ভারতবর্ষ, আফ্রিকা আর আমেরিকাতে। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী চীনেও যদি ব্যাবসা বাড়ানো যায়, তাহলে মন্দ কি!

কিন্তু সম্রাট কিয়ানলং উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না। ইংরেজ প্রতিনিধিদল ফিরে গেল ব্রিটিশ রাজার দরবারে। সঙ্গে নিয়ে গেল চীনা সম্রাটের বার্তা—

> 'এসব জিনিসের গুরুত্ব আমার কাছে কিছুই না। আপনার দেশের জিনিস আমি ব্যবহার করব না।'

ব্রিটিশ রাজপরিবার অপমানিত বোধ করল এতে। মনে মনে ঠিক করল, যে করেই হোক প্রতিশোধ নেওয়া চাই। এরই ধারাবাহিকতায় আফিমে সয়লাব হয়ে গেল চীনের কালোবাজার। এই আফিম চীনে ঢোকানো হয়েছে সুকৌশলে, ভারতীয় কৃষকদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ ছিল চীন। সোনা, রুপা আর আফিম ছাড়া বাইরের অন্যকিছু আমদানির আগ্রহ চীনা বণিকদের কখনোই ছিল না। কারণ, এগুলোতেই ব্যাবসা হতো সবচেয়ে বেশি। আফিম যে মাদক হিসেবে ব্যবহার করা যায়—এ তথ্য তখনও চাইনিজদের কাছে

অজানা। এতদিন তারা এটা ব্যবহার করে এসেছে ছোটোখাটো রোগের ওষুধ হিসেবে। অন্যদিকে, ইউরোপ-এশিয়ায় তখন চীনের চা, সিল্ক আর চিনামাটির বাসনের প্রচুর চাহিদা। তাই ব্রিটিশ বণিকরা ঝুঁকল এই বিরাট বাজারের দিকে। এসব পণ্য কিনে নিয়ে ইউরোপ-এশিয়ায় বাণিজ্যের স্বপ্ন দেখল তারা। কিন্তু অচিরেই নতুন এক সমস্যা এসে উপস্থিত হলো তাদের সামনে। তারা চীনা পণ্য আমদানি করতে চাইলেও ব্রিটিশ পণ্য কেনায় কোনো আগ্রহ ছিল না চাইনিজদের। ফলে ট্রেড ব্যালেন্স বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এ ছাড়া চাইনিজরা কেবল রুপার বিনিময়েই পণ্য বিক্রি করত। ফলে ব্যাবসাসূত্রে ব্রিটেনের প্রচুর রুপা চলে গেল চীনের হাতে। ভারতে উৎপাদিত আফিম অবৈধভাবে চীনে পাচার করার বিনিময়ে রুপা সংগ্রহ করত ব্রিটিশ বণিকরা। সেই রুপা দিয়েই তারা চীনের চা, সিল্ক ইত্যাদি কিনত। একসময় চাইনিজরা ইংরেজদের কাছ থেকেই আফিমকে মাদক হিসেবে ব্যবহার করা শিখে ফেলে। ফলে আফিমের চাহিদাও বেড়ে যায় বহুগুণে। বিপদ আঁচ করতে পেরে চীনের তৎকালীন সম্রাট চিয়াচিং আফিম আমদানি নিষিদ্ধ করে দেন, কিন্তু ততদিনে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তার।

প্রতি সিজনে আড়াই হাজার টনের মতো আফিম ঢুকত চীনে। ব্রিটেনের ভারতীয় উপনিবেশ থেকে পাঠানো হতো এগুলো। চীনারা আফিমে বুঁদ হয়ে পড়ে রইল। অর্থনীতি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তেমনি রাজপথগুলোতে শুরু হলো নেশাগ্রস্তদের অপরাধ আর বিশৃঙ্খলা। নেশাগ্রস্তের দল ঘুরে বেড়াতে লাগল শহরের অলিতে-গলিতে। বাদ গেল না সরকারি কর্মকর্তারাও। চীনকে এভাবেই শায়েস্তা করা হয় এবং তাতে কোনো স্থল অভিযানের প্রয়োজনই পড়েনি। চীনা ভূখণ্ডে সরাসরি সশস্ত্র যোদ্ধা পাঠাতে হয়নি ইংরেজদের। অবশ্য অল্পমাত্রায় হলেও চীনে ব্রিটিশদের আফিম সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল বহু আগে থেকে।

চীন ও ভারতবর্ষে প্রথম আফিম আসে সপ্তম শতাব্দীতে। আরব বণিকরাই প্রথম সেখানে আফিম নিয়ে যান। অবশ্য তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। আফিম তখন ব্যথা নিবারক ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সপ্তদশ শতকে এসে ইউরোপীয় বণিকদের দ্বারাই চীনারা প্রথম বুঝতে পারে, মাদক হিসেবেও আফিম ব্যবহার করা যায়। এরপর আফিমের নেশায় দ্রুতই সমগ্র চীনা জাতি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে আফিম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফরমান জারি করলেন চীনা সম্রাট। এ ফরমানই মাদকদ্রব্যসংক্রান্ত

পৃথিবীর প্রথম আইন হিসেবে স্বীকৃত। যদিও সেই ফরমানে চীনে আফিমের ব্যবহার রোধ করা যায়নি। ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় কালোবাজারে ব্যাবসা ঠিকই চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভয়ংকর রূপ নিল আফিমের ব্যাবসা। কিন্তু এভাবে তো রাষ্ট্র চলতে পারে না। ফলে চীনজুড়ে শুরু হলো মাদক বাজেয়াপ্তকরণ কার্যক্রম। চোরাকারবারীদের সাথে সরকারি বাহিনীর সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। এমনই এক সংঘাতময় পরিস্থিতির অপেক্ষায় ছিল ইংরেজরা। চীন সরকার ১৮৩৯ সালে ক্যান্টনের ব্রিটিশ গুদামের সব আফিম জব্দ করল। কতিপয় মাতাল নাবিক এক চাইনিজকে হত্যা করেছিল। তবে ঘাতকদের চীনের আদালতে হস্তান্তর করতে রাজি হয়নি ব্রিটিশ সরকার। এরই জের ধরে ওই বছরই শুরু হলো চীন বনাম ব্রিটিশ প্রথম আফিম যুদ্ধ। চার বছরব্যাপী চলল সেই যুদ্ধ। যুদ্ধে শেষতক জয় হলো ইংরেজদেরই। ব্যাবসা ও বসবাসের জন্য তাদের পাঁচটি বন্দর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় চীন। ১৮৫৬ সালে চীনের সাথে ব্রিটিশরা দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে জড়ায়। এবার আর ইংরেজরা একা নয়; ফরাসিরাও যোগ দেয় তাদের সাথে। এই যুদ্ধ শেষ হয় ১৮৬০ সালে, আমদানির সুযোগ পায় ভিনদেশিরা। বিদেশিদের জন্য শহরটি একরকম ছেড়েই দেওয়া হয়। পিকিং পরিণত হয় ডিপ্লোমেটিক জোনে। দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশন স্থাপিত হয় সেখানে। সমগ্র চীনে খ্রিষ্টান মিশনারিরা অবাধে যাতায়াত করা শুরু করে।

প্রথম আফিম যুদ্ধের পর চীনকে একরকম জোর করেই বিশ্ববাজারে প্রবেশ করানো হয়েছিল। চীন হয়ে গেল পশ্চিমা অস্ত্রের জমজমাট বাজার। চীনের হাতে ইংল্যান্ডের সামরিক কারখানায় তৈরি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র গছিয়ে দিয়ে তাজা হতে শুরু করল ইংরেজরা। প্রথমে কামান, তারপরে এলো বন্দুক। উপকূলীয় শহর গুয়াংজো, সাংহাই, নিংবোসহ বিভিন্ন শহরে খোলা হলো বাণিজ্যিক অফিস। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হংকংও দখল করল তারা। চীনে এভাবে ইংরেজদের বাণিজ্য করার পথ যেমন খুলে গেল, তেমনি একসময়ের অবৈধ আফিম ব্যাবসাটাও জমে গেল প্রকাশ্য দিবালোকে।

# চীন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মাও সে তুং

গত শতকের মধ্যভাগে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছিল চীন। রুশদের আদলে দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়। রাশিয়ায় শ্রমিকরা বিপ্লবের মূল জোগানদার হলেও চীনে এই বিপ্লবের পেছনে ছিল কৃষকরা। মাও সে তুং-এর হাত ধরেই চীন প্রবেশ করে সমাজতান্ত্রিক ধারায়। চীনা কমিউনিজমের আধ্যাত্মিক গুরু মাও-কে অনেকেই আধুনিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা ভাবতে পছন্দ করেন। ভুলটা এখানেই। আজকের যে শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক চীন, তার কৃতিত্ব মাও-কে দেওয়া অন্যায় হবে; বরং এর কৃতিত্বের প্রকৃত হকদার মাওয়ের উত্তরসূরি সংস্কারপন্থি কমিউনিস্ট নেতা দেং জিয়াও পিং।

মাও-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্য কেউ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হতে পারেননি। তার দর্শন 'মাওবাদ' রক্তাক্ত করেছে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, নেপাল এমনকি শ্রীলংকার মতো দেশকেও। ১৯৪৯ সালে কীভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন মাও?

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৩৭ বছর আগে আরও একটি বিপ্লব দেখেছিল চীন। সেই বিপ্লবকে বলা হয় ঝিনহাই বিপ্লব বা চীন বিপ্লব; যার মধ্য দিয়ে উৎখাত হয়েছিল মাঞ্চু সাম্রাজ্য। গণবিক্ষোভের মুখে চীনের নাবালক সম্রাট পুয়ি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। আড়াই শতকেরও বেশি সময় পর চীনে ক্ষমতা ফিরে পায় হান জাতির[১৮] লোকরা। ঝিনহাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনকে রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়।

---

[১৮] চীনে ৫৬টি জাতির মধ্যে হান জাতির লোকসংখ্যা সবচাইতে বেশি। পৃথিবীতে হান জাতিই সর্বাধিক লোকসংখ্যার জাতি। মূল চীনের শতকরা ৯২ ভাগ মানুষ নৃতাত্ত্বিক হান জাতিভুক্ত। সংখ্যায় এরা ১২০ কোটি। বেশিরভাগ মানুষ এই হানদেরই চৈনিক বলে উল্লেখ করে থাকে। হান জাতির সভ্যতার ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। চীনের শ্রমবাজার বলতে গেলে পুরোটাই হান জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। বলা যেতে পারে, দেশটির অর্থনীতি ও উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ধারিত হয়েছে এই জাতিগোষ্ঠীর মাধ্যমে।

আর তার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট করা হয় ডাক্তার সান ইয়াৎ সেনকে। রাজতন্ত্র উৎখাত করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর তিনিই।

কিন্তু সান ইয়াৎ এই পদে বেশিদিন থাকতে পারেননি। যার সাথে সমঝোতা করে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, সেই ক্ষমতালিপ্সু কমান্ডার ইউয়ান সিকাই-এর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। কমান্ডার সিকাই চীনকে আবারও রাজতন্ত্রে ফেরাতে চাইলেন, সম্রাট ঘোষণা করলেন নিজেকে। সম্রাট ঘোষণার বছরখানেক বাদেই মারা যান সিকাই। এদিকে, সান ইয়াৎ সেন সমর্থিত গ্রুপটি বেরিয়ে এসে অন্যান্য ছোটো দলগুলোকে সাথে নিয়ে গঠন করে নতুন জাতীয়তাবাদী দল 'কুওমিনটাঙ'। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দলটির নেতৃত্ব দেন সান ইয়াৎ। তারপর তার উত্তরসূরি করা হয় চিয়াং কাইশেককে। দলীয় প্রধানের পাশাপাশি কাইশেক একসময় গণতান্ত্রিক চীনের প্রেসিডেন্টও বনে যান।

রাশিয়ার বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়েছিল ১৯২১ সালে। এই কমিউনিস্টরা সান ইয়াৎ সেনদের জোটে ঢুকে পড়েছিল। সান ইয়াৎ সেন কর্তৃত্ববাদী ছিলেন না। তার উত্তরসূরি কাইশেক ছিলেন অনেকটাই রক্ষণশীল ও কর্তৃত্ববাদী। পূর্বসূরি সান ইয়াৎ যে রকম কমিউনিস্টদের সাথে জোট গড়েছিলেন, তিনি তা আর জারি রাখতে চাইলেন না। কমিউনিস্টদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখাকে অপ্রয়োজনীয় ও দুর্বলতা মনে করলেন কাইশেক। জোট থেকে ছুড়ে ফেলে দিলেন তাদেরই ভূতপূর্ব মিত্র চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে। এই যে বিরোধ শুরু হলো, তা-ই একসময় সংঘাতে রূপ নিল। শুরু হলো সিভিল ওয়ার। শতশত কমিউনিস্ট খুন হলো, বন্দি হলো অনেকেই। দমন-নিপীড়নের মুখে বিকল্প পন্থা বেছে নিতে বাধ্য হলো কমিউনিস্টরা; যেমনটা আমরা পরবর্তী সময়ে কিউবাসহ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে দেখেছি। অবস্থাদৃষ্টে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরল তারা। কৃষকদের সংগঠিত করে সেনাবাহিনী গড়লেন মাও সে তুং। ১৯২৭ সালে হয়ে উঠলেন রেড আর্মির প্রধান সেনাপতি। সে বছরই চীনে শুরু হয় জাতীয়তাবাদী বনাম কমিউনিস্ট সংঘাত।

মাও-এর সেনাবাহিনী চরম প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। বেশিরভাগ সদস্যই হয় খুন, নতুবা ধরা পড়ে সরকারি বাহিনীর হাতে। চিয়াং কাইশেক-এর অনুগত বাহিনী বেইজিং দখল করে নিলে বিশ্ববাসীর কাছে কুওমিনটাং-ই চীনের

ক্ষমতাসীন দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। চীনের বিশাল এলাকায় জাতীয়তাবাদীদের নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকে। তাতে কিছুটা হতাশ হলেও দমে যাননি মাও; কয়েকটা প্রদেশকে টার্গেট করে সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগোতে থাকেন। দক্ষিণ হুনান আর জিয়ানজি প্রদেশে মাও-এর বাহিনী দৃশ্যপটে আসতে থাকে। বাহিনীতে নতুন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ব্যবস্থা করা হয় সামরিক প্রশিক্ষণের।

চিয়াং কাইশেক প্রশাসন মাও-কে মানসিকভাবে দুর্বল করার সব অপকৌশলই অব্যাহত রাখে। টার্গেট করা হয় মাও পরিবারের সদস্যদের। যে শহর (চাংশা) থেকে কৃষকদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে সৈন্যদল গড়েছিলেন মাও, সেই শহর থেকে আটক করা হয় তাঁর স্ত্রী ইয়াং কাইহুই ও এক পুত্র সন্তানকে। শিশুপুত্রের সামনেই হত্যা করা হয় তার মাকে। একই বছরের মে মাসে হে জিঝেনকে বিয়ে করেন মাও। পার্বত্য অঞ্চলে গড়ে তোলেন **রেড আর্মি**[১৯]। প্রায় অর্ধলাখ সদস্যবিশিষ্ট এই বাহিনীতে না ছিল প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, না ছিল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। তাদের প্রধান কৌশল ছিল ঘুপছি বা গেরিলা আক্রমণ। মানে 'হামলা করো এবং পালিয়ে যাও'।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ছায়া বা সমান্তরাল সরকার দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিরোধী বা বিদ্রোহী পক্ষগুলো সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের মতো একটা সরকার গঠন করে থাকে। কিছু কিছু দেশে অবশ্য বৈধভাবেই ছায়া সরকার গঠনের রেওয়াজ আছে। তালেবান পুনরায় কাবুল দখলের আগে যে সমস্ত প্রদেশ বা এলাকা দখলে নিয়েছিল, সেসব এলাকায় এ রকম বিকল্প বা সমান্তরাল সরকার গঠন করেই সকল প্রশাসনিক কাজ চালাত। তারা অপরাধের বিচার করত, ট্যাক্স উঠাত আবার বিপরীতে নাগরিক সেবাও দিত। 'সোভিয়েত রিপাবলিক অব চায়না' নামে মাও সে তুং এ রকমই একটি বিকল্প সরকার গঠন করেছিলেন। কিন্তু সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁর বাহিনী সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে ধনী-কৃষক আর জমিদারদের প্রতি। আনুমানিক দুই লাখ জমিদার নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তার বিরুদ্ধে।

---

[১৯] চীনা শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে রেড আর্মি তথা লাল ফৌজ গঠন করা হয়েছিল। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র বাহিনী ছিল এই রেড আর্মি। সবশেষ জাপানবিরোধী যুদ্ধের সময় তাদের জাতীয় বিপ্লব বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চীনের গৃহযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে 'পিপলস লিবারেশন আর্মি' নামে তাদের নামকরণ করা হয়—যা এখনও অব্যাহত আছে।

১৯৩৪ সাল নাগাদ জিয়াংজি প্রদেশে কমিউনিস্টদের শক্ত ভিত দাঁড়িয়ে যায়। আর ঠিক তখনই মরণকামড় দিতে শুরু করেন কুওমিনটাং নেতা চিয়াং কাইশেক। আগের চাইতেও বেশি কট্টরপন্থার আশ্রয় নেয় তার বাহিনী। কাইশেক পাঁচ লাখের বিশাল এক বাহিনীকে জিয়াংজিতে পাঠান। পার্বত্য অঞ্চলে মাও-এর রেড আর্মিকে ঘিরে ফেলে তারা। প্রথমে সেখান থেকে মাওবাদীরা পালিয়ে গেলেও পরে একই এলাকায় বহু রেড আর্মি সদস্য ও কমিউনিস্ট সমর্থকদের জড়ো করেন মাও। তাদের নিয়ে শানঝি প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন তিনি। ইতিহাসে এই দীর্ঘ পদযাত্রা 'দ্যা লং মার্চ' নামে পরিচিত।

তবে এই যাত্রাপথ মোটেও সহজ কিংবা স্বস্তিদায়ক ছিল না। পথে ছিল তুষারে আবৃত বিশাল সব পর্বত, আবার কোথাও কোথাও ছিল বড়োসড়ো জলাভূমি। মাঝে মাঝে সরকারি বাহিনী ও স্থানীয় যুদ্ধবাজদের হামলার মুখেও পড়তে হয়েছে তাদের। যে কারণে মাও-এর সেনাবাহিনী ও কমিউনিস্ট সদস্যদের বারবার পৃথক দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিতে হয়। এভাবে ক্রমাগত রাস্তা বদল করতে থাকায় কুওমিনটাং কর্মকর্তারা মাওবাদী সেনাদের গতিবিধি ঠাহর করে উঠতে পারেনি। বৈরী আবহাওয়া, বিপজ্জনক পাহাড়ি রাস্তা, স্থানীয় কুওমিনটাং সেনাদের আক্রমণ—এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে যখন মিশন সম্পন্ন হলো, তখন দেখা গেল মাত্র সাত হাজার কমিউনিস্ট সদস্য জীবিত আছেন! এই লং মার্চ মাও সে তুং-কে পার্টির নেতা হিসেবে শক্ত ভিত এনে দেয়। অবশ্য মাও-এর সেনাদল ঠিক কত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কতজন জীবিত ছিলেন, তা নিয়ে রয়েছে বিরাট বিতর্ক।

১৯৩৭ সালে চীনে আক্রমণ করে বসে তুলনামূলক ছোট্ট দেশ জাপান। শুরু করে হত্যা, সন্ত্রাস আর লাগাতার ধর্ষণ। বিদেশি আক্রমণের মুখে চিয়াং কাইশেক বেইজিংসহ চীনের উপকূলীয় অঞ্চল ও কিছু শহরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। কারণ, একই সঙ্গে দুটি ফ্রন্টে লড়াই করতে হচ্ছিল তাকে। এ অবস্থায় জাপানি আগ্রাসন ঠেকাতে বিভেদ ভুলে কমিউনিস্টদের সাথে সন্ধি করে জাতীয়তাবাদীরা। মাও সে তুং তখন এই মিত্রবাহিনীর সামরিক নেতা হিসেবে কাজ করেন। চীনে জাপানি আক্রমণের পরের বছর মাও তার তৃতীয় স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান, বিয়ে করেন অভিনেত্রী জিয়াং কিংকে। এই জিয়াং কিং-ই পরবর্তী সময়ে 'ম্যাডাম মাও' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

মাও যেমন জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, একই সঙ্গে তার লক্ষ্য ছিল কুওমিনটাং-এর কাছ থেকে চীনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেওয়া। এজন্য সে যুদ্ধে দুটি ফ্রন্ট ছিল তার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় হলে তারা চীনের কাছে দখল করা স্থানগুলো ফেরত দিয়ে দেয়। চীনে আবারও শুরু হয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। এবার পরিস্থিতি কমিউনিস্টদের পক্ষে চলে যায়। জাপানিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হাতে পেয়ে মাওবাদীরা গেরিলা হামলায় বিধ্বস্ত করে তোলে জাতীয়তাবাদীদের।

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর বেইজিংয়ের তিয়ান আনমেন চত্বরে 'পিপলস রিপাবলিক অব চায়না' প্রতিষ্ঠা করে কমিউনিস্ট শাসনের ঘোষণা দেন মাও সে তুং। অবশ্য চীন তখনও পুরোপুরি মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণে আসেনি, কিন্তু ১০ ডিসেম্বর কুওমিনটাং-এর সর্বশেষ শক্তিশালী ঘাঁটি সিচুয়ান প্রদেশের চ্যাংডু শহরও রেড আর্মি ঘিরে ফেলে। চিয়াং কাইশেক তার সৈন্যদল নিয়ে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে পালিয়ে যান দ্বীপাঞ্চলে, বর্তমানে যা তাইওয়ান নামে পরিচিত। পুরো চীনের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে মাও-এর হাতে। তাইওয়ান সংকটের সূচনাও তখন থেকেই। কাইশেকরা তাইওয়ানে গিয়ে দাবি করলেন, তারাই চীনের প্রকৃত সরকার।

# গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড

কমিউনিস্ট তাণ্ডবে চীনে গোড়াসুদ্ধ গায়েব হয়ে যায় সামন্তবাদ বা জমিদারি শাসন। জমিদারদের বহুসংখ্যক খুন হন, গ্রেফতার হন অনেকেই। তাদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে বণ্টন করা হয় দরিদ্র কৃষকদের মাঝে। মাও বিশ্বাস করতেন চীনের বিপুল জনশক্তি কাজে লাগিয়ে যৌথ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা গেলে শক্তিশালী অর্থনীতি অর্জন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে যে ফসল আসবে, তাতে দেশের চাহিদা তো মিটবেই, পাশাপাশি উদ্বৃতাংশ বিক্রি করে ঘটিয়ে ফেলা যাবে শিল্প বিপ্লব। এই ভাবনা সামনে রেখেই কমিউনিস্ট চীনে প্রথমবারের মতো গৃহীত হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। লক্ষ্য ছিল, চীনকে একটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। মাও এক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে নেন স্ট্যালিনের সোভিয়েত মডেলকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বেড়াতে গিয়ে রুশদের অগ্রগতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান মাও। ভাবেন, চীনেও এমনটা চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি! দেশে ফিরে মাও সে তুং মানুষকে শোনালেন আশার বাণী—'আগামী ১৫ বছরের মাঝেই গ্রেট ব্রিটেনকে টপকে যাবে চীন।'

যৌথ চাষাবাদে কৃষির উন্নয়ন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন চেয়ারম্যান মাও। তার পরিকল্পনা ছিল, চীনজুড়ে স্থাপিত হবে প্রচুর কলকারখানা বিশেষ করে স্টিল ফ্যাক্টরি। কিন্তু এই শিল্পায়নের জন্য চাই পাওয়ার প্ল্যান্ট, ট্রাক ফ্যাক্টরি, কেমিক্যাল শিল্প এবং জাতীয় এনার্জি সাপ্লাই নেটওয়ার্ক। এইভাবে কৃষিকে বেছে নেওয়া হয় শিল্পের জন্য পুঁজি বাড়ানোর মাধ্যম হিসেবে। কতটা কার্যকর হয়েছিল সেই প্রকল্প?

সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো চীনের কৃষকরা তখন অতিরিক্ত ফসল ফলাত না। এমনকি তারা যা ফলাত, তাদের জন্যই সেটা যথেষ্ট ছিল না। ফলে চীনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায় পোহাতে হয় গরিব কৃষকদের।

জমিজমা তো গেলই। সাথে যুক্ত হলো বিরামহীন কাজ আর কাজ। অবসর, স্বাধীনতা কোনোটাই থাকল না। দিনরাত শুধু চলতে থাকল ফসল ফলানোর আয়োজন। কৃষকরা পুকুর সেঁচে মাছ ধরে সেই মাছ বিক্রির টাকাও সরকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলো। তবে মাও-এর পাগলামি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়- যখন তাঁর মনে হলো কৃষি দিয়ে শিল্পায়নের অর্থ জোগাড় করা অসম্ভব। এবার খোদ কৃষিকেই শিল্পায়ন করতে উঠেপড়ে লাগলেন তিনি।

চীনের কৃষকদের নামিয়ে দেওয়া হলো কারখানা ও রাস্তা তৈরির কাজে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হয়েছে—তা বলা যাবে না, তবে এটি বড়ো ধরনের একটি ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের দিকে চীনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারিতে মাও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এটিই 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' নামেই বেশি পরিচিত। তার এই আগ্রাসী পরিকল্পনা নির্মমভাবে ব্যর্থ হয়। কৃষকরা আগের মতোই রাস্তা, ব্রিজ বানাতে থাকে। পুরুষ কৃষকরা রাস্তা তৈরিতে আর নারীরা কাজ করতে থাকে কৃষি জমিতে। বলা হচ্ছিল এভাবেই মাত্র ১৫ বছরে ব্রিটেনকে টপকে যাবে তারা। কিন্তু দিনশেষে চীন পিছু হটতে বাধ্য হয়। মাও-এর গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড পরিণত হয় লিপ ব্যাকওয়ার্ডে। কৃষকরা যে স্টিল বানাত, তা ছিল মানহীন এবং মূল্যহীন। আর নারীদের কৃষি অভিজ্ঞতা না থাকায় ফসল উৎপাদনও কমে যায় শোচনীয়ভাবে।

যৌথ কৃষি উৎপাদন আর শিল্পায়ন—দুটোতেই মাও-এর চিন্তা ভুল প্রমাণিত হয়। কৃষিজমিকে একীভূত করে ফেলেন এই কমিউনিস্ট নেতা। এরপর থেকেই মূলত বিলুপ্ত হয়ে যায় যাবতীয় ব্যক্তি মালিকানা। তার ধারণা ছিল, যৌথ চাষাবাদে ব্যাপক ফলন হবে আর প্রচুর খাদ্যশস্য রপ্তানিও করা যাবে বহির্বিশ্বে। প্রথমদিকে সে কিছুটা সফল হলেও ধীরে ধীরে উৎপাদন কমে যায়। প্রাদেশিক নেতারা মাও-কে সঠিক তথ্য না দেওয়ায় সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। মাও নিজেও চাটুকারদের বিশ্বাস করেন অবলীলায়। অবশ্য এটা কর্তৃত্ববাদীদের গোড়ার বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন যা-ই হোক, মাও-কে জানানো হতো তার কয়েকগুণ বাড়িয়ে। কাজেই ফসল উৎপাদন কমে এলেও পূর্বপরিকল্পনাতেই অটল থাকেন তিনি। আর অচিরেই এর ভয়াবহ প্রতিফল দেখতে পায় চীন।

মাও-এর দ্বিতীয় ভুল ছিল অনভিজ্ঞদের দিয়ে প্রচুর পরিমাণ স্টিল ফ্যাক্টরি নির্মাণের পরিকল্পনা। তার ধারণা ছিল, দ্রুত শিল্পায়ন করলেই দেশের উন্নয়ন মাথা তুলে দাঁড়াবে। এজন্য চাই প্রচুর লোহা। এই বিপুল পরিমাণ চাহিদা

মেটানোর মতো দক্ষ জনশক্তি চীনের ছিল না। দেং জিয়াও পিং, চৌ এন লাই থেকে শুরু করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সিনিয়র নেতা মাও-এর পরিকল্পনায় সমর্থন দেননি। মাও ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোষণা করলেন—যারা গ্রেট লিপের বিপক্ষে, তারা মূলত সমাজতন্ত্র এবং চেয়ারম্যানেরই বিরুদ্ধে। এই সুযোগে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো বাগিয়ে নেয় চাটুকার আর সুবিধাভোগী গোষ্ঠী।

চীনের সব গ্রামকে একত্র করে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদলে যৌথ চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছিল বহু আগেই। ব্যক্তিগত জমি বলতে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এরপর সব মিলিয়ে ২০ হাজারের বিশাল কমিউন গঠিত হলো। আলাদা ব্যারাকে রাখা হলো চাষিদের। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকত সামরিক বাহিনী। এ ধরনের যৌথ কৃষি খামারব্যবস্থা নিয়ে পাকিস্তানে একটা গল্প প্রচলিত আছে—'আইয়ুব খান একবার উদ্যোগ নিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আইল ভেঙে জমি সব এক করে ফেলবেন। তাতে বেঁচে যাবে রাষ্ট্রের শতকরা ছয়ভাগ জমি! কিন্তু শুরুটা করবেন কোথা থেকে? সরকারি কর্মকর্তারা বেছে নিলেন দিনাজপুরের চিরিরবন্দরকে। ঢাকা সফরে এলেন আইয়ুব খান। প্রকল্প এলাকা দেখার শখ হলো তার, হেলিকপ্টারে করে রওনা হলেন চিরিরবন্দরের পথে। আইয়ুবকে স্বাগত জানাতে আগেই হাজারো মানুষ জড়ো হয়েছে চিরিরবন্দরে বসানো হেলিপ্যাডে। এদের প্রত্যেকের হাতেই বাঁশের লাঠি, তির-ধনুক, ঝাঁটা আর বল্লম। প্রেসিডেন্টকে তারা নামতে দেবে না কিছুতেই। "আমাদের জমি আমরাই দেখব, আইল ভাঙার তুমি কে?"—স্লোগান ধ্বনিত হতে লাগল চারপাশে। বেদনাহত আইয়ুব খান ঢাকা ফিরে গেলেন। আর বগুড়া সার্কিট হাউজে পড়ে রইল লাখ টাকার নাশতা-পানি।' এই গল্পটি নেওয়া হয়েছে লেখক বুলবুল সরওয়ারের একটি বই থেকে।

রাজতন্ত্রের মতো সমাজতন্ত্রও যেন একক ব্যক্তিরই শাসন। প্রেসিডেন্ট বা পার্টি প্রধান যা চাইবেন, সবাই তা করতে বাধ্য। উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভেনিজুয়েলা, চীন—কাউকেই এই চরিত্র থেকে আলাদা করা যায় না। যেহেতু মাও-এর কথাই ছিল শেষ কথা, মানুষ তার কথাই মেনে চলল ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। নেতাকে ঘিরে গড়ে উঠল চাটুকার সিন্ডিকেট। মূলত সব কর্তৃত্ববাদী শাসনেই এমনটা দেখা যায়। আলজেরিয়ার আবদুল আজিজ বুতেফিকার কথাই ধরা যাক। শেষের কয়েক বছর তিনি ছিলেন নামমাত্র শাসক, তাকে সামনে রেখে দেশ শাসন করত মূলত আর্মি, ব্যবসায়ী আর একটি অভিজাত গোষ্ঠীর সিন্ডিকেট। মিশর আর সিরিয়াতেও আমরা এ রকম সিন্ডেকেটের অস্তিত্ব দেখেছি।

সুনজর ও সুবিধা পেতে চীনের প্রাদেশিক নেতারা ছুটে এলেন শীর্ষনেতা মাও সে তুং-এর কাছে। নেতার স্বপ্নই তো তাদের স্বপ্ন! মাও-এর বার্তা নিয়ে তারা নিজ নিজ প্রদেশে ফেরত গেলেন। চাপ বাড়ল কৃষক, শ্রমিক আর কারখানা মালিকের ওপর। প্রচুর ফসল ফলাতে হবে, বাড়াতে হবে স্টিল উৎপাদন, তবেই না নেতার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে। এই নেতারা কেবল কৃষক-শ্রমিকদের চাপ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি; কেন্দ্রে উৎপাদনের ভুয়া রিপোর্ট পাঠাত নিয়মিত। চাতুর্যের রাজনীতির রূপ-রস-গন্ধ দুনিয়ার সবখানেই অভিন্ন। নেতাকে খুশি রাখাতেই তো যত সব আনন্দ, নেতার আশীর্বাদেই ঘুরে যেতে পারে ভাগ্যের চাকা। চাইনিজদের ভাগ্য বদলে গিয়েছিল বটে, এমনকি বদলে গিয়েছিল পুরো জাতির ভবিষ্যৎও। একগাল হেসে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দুর্ভিক্ষ। কারণ, উৎপাদনের বড়ো একটি অংশ দিয়ে দিতে হয়েছিল সরকারি গুদামে। কে খেল আর কে উপোস থাকল—তাতে সরকারের কী যায় বা আসে!

রোজ সকালে গ্রামবাসীকে বিউগল বাজিয়ে ডেকে তোলা হতো। প্যারেড করতে করতে মাঠে নামত এই বিরাট কর্মীবাহিনী। কমিউনগুলোর বিশাল হলঘরে ছিল খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। কৃষকদের নির্দেশ দেওয়া হতো—'সরকারের পরিকল্পনামাফিক ফসল উৎপাদন করতে হবে'। প্রথমদিকে কিছু এলাকায় উৎপাদন বেড়েছিল বটে, কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখা যায়নি তা। জমির উর্বরতা যেমন কমল, উৎপাদনও নেমে এলো আশঙ্কাজনকভাবে। খাদ্য সংকট বাড়তেই থাকল। কৃষকদের কাছে খাবার না থাকার পরও কমিউন থেকে নিয়মিত ফসল যেতে থাকল বেইজিং-এর উদ্দেশ্যে। অনিবার্যভাবেই কমিউনগুলোতে শুরু হলো উপবাস। খাবারের অভাবে গরু, ছাগল, শূকর জবাই হতে থাকল। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকল ক্ষুধার্ত মানুষের মরদেহ।

চাইনিজরা যখন দুর্ভিক্ষের প্রান্তে, তখনও নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেওয়া শস্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি ভাঙতে চাননি। মহান নেতা মাও কী করে **নিকিতা ক্রুশ্চেভের**[২০] কাছে 'ছোটো' হবেন! বাঁচার জন্য যে কৃষকরা শস্য জমা

---

[২০] স্ট্যালিন পরবর্তী নেতা নিকিতা সের্গেইভিচ ক্রুশ্চেভ স্নায়ুযুদ্ধের সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যৌবনে খনিশ্রমিক এবং পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন তিনি। জোসেফ স্ট্যালিন তাকে ইউক্রেনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান নেতা হন গেওর্গি মালেনকোভ। তাকে সরিয়ে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ। ১৯৬৪ সালে নিকিতাকে অপসারণ করে শীর্ষ নেতার পদে বসানো হয় লিওনিদ ব্রেজনেভকে।

দিত সরকারের কাছে, সেই কৃষকরাই ক্ষুধার্ত থাকল, অপুষ্টিতে ভুগল এবং সবশেষে মরে পড়ে রইল কাতারে কাতারে।

অদ্ভুত এক আদেশ জারি করে মাও তার খামখেয়ালিপনাকে বিরাট উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। জনগণকে বোঝালেন চড়ুই পাখি চীনের দুশমন, এরা খাদ্যশস্য খেয়ে ফেলে। কাজেই এগুলারে ধরো, মারো, বিনাশ করে ফেলো। চড়ুইয়ের পাশাপাশি ইঁদুর, মশা এমনকি মাছিও সমগ্র চীন থেকে বিনাশ করে দেওয়ার আদেশ এলো। কারণ, ইঁদুর প্লেগ রোগের জীবাণু বহন করে। আবার ম্যালেরিয়ার বাহক মশা। সুতরাং, শুরু হলো নিধনযজ্ঞ। আর মাও-এর আদেশ অমান্য করে সাধ্য কার? চড়ুই পাখির ওপর দিয়েই ঝড়-ঝাপটা বেশি গেল।

চীনজুড়ে শুরু হলো অবাধে চড়ুই হত্যা। পোস্টার, লিফলেট, প্রচারমাধ্যম-সর্বত্রই চড়ুই হত্যার নির্দেশনা। সমগ্র চীন পাখি হত্যায় মেতে উঠল। দ্রুতই এই খামখেয়ালিপনার কুপ্রভাব পড়ল চীনে। চড়ুই কমে যাওয়ায় বেড়ে গেল পোকামাকড়ের উৎপাত। পঙ্গপালের দল লাখ লাখ হেক্টরের ফসল বিনাশ করে দিলো। চীনজুড়ে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তার অন্যতম এক কারণ এই চড়ু ই নিধন কর্মসূচি।

গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ডের মূল্য চুকিয়েছিল ৪০ মিলিয়ন মানুষ। কেউ মরেছে, কেউ মরতে মরতে বেঁচে গেছে। ১৯৫৮-৬০ সাল জুড়ে চীনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় চার কোটি মানুষ মারা যায়, কারও কারও মতে সংখ্যাটা সাড়ে তিন কোটি। এটা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়, মাও সে তুং বিপ্লবী নেতা হিসেবে সফল হলেও দেশ পরিচালনায় চূড়ান্ত ব্যর্থ। এই অবস্থা থেকে চীনকে তুলে এনেছিলেন দেং জিয়াও পিং।

## সাদা-কালো ব্যাপার না, বিড়াল ইঁদুর ধরতে পারলেই হলো

১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাস। নেতৃত্ব বাছাইয়ে বেইজিংয়ে বসেছেন চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। মাও সে তুংয়ের একের পর এক হঠকারী পলিসিতে অনেকেই বিরক্ত। সমাজতান্ত্রিক চীনের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বিগ্ন নেতাদের কেউ কেউ। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন লিউ শাও চি। শাও চি সেই নেতাদের একজন, যারা চীনকে কট্টর কমিউনিস্ট গোঁড়ামি থেকে উদ্ধার করতে চান, সংস্কার আনতে চান রাষ্ট্রনীতিতে। সিনিয়র নেতাদের সামনেই মাওয়ের 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' কর্মকাণ্ডকে ধুয়ে দেন শাও। তার মতোই আরেক নেতা দেং জিয়াও পিং। জিয়াও পিং কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের বললেন—'বিড়াল সাদা না কালো, তা বিষয় না; ইঁদুর ধরতে পারলেই হলো।'

তখনও রাষ্ট্র ক্ষমতায় মাও। তিনি রণাঙ্গনের সফল নেতা বটে, কিন্তু রাষ্ট্রনায়কের পরীক্ষায় মোটের ওপর অনুত্তীর্ণ। দলের লোকরাই বলছে, চীনের অর্থনীতিকে সবল করার বিপরীতে তা ধ্বংস করেছেন মাও। না তিনি অর্থনীতি ভালো বুঝতেন, না জানতেন দেশ চালানোর কবজাকৌশল। '৬২-এর সম্মেলনেই স্পষ্ট হয়ে যায়; যাদের নিয়ে রাজপথ কাঁপিয়ে মাও তিলে তিলে পার্টির ভিত গড়েছেন, তাদের অনেকেই বিগড়ে গেছে এখন। সহযোদ্ধারা প্রকাশ্যেই তার সমালোচনা করছে। সংস্কারপন্থিদের এমন মুহুর্মুহু চাপে পার্টির অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা থেকে একরকম ছিটকে পড়েন মাও। পরবর্তী কয়েক বছর কেবল নামকাওয়াস্তেই চীন সরকারের প্রধান ছিলেন তিনি। মধ্যপন্থি সমাজতান্ত্রিক দুই নেতা লিউ শাও চি আর দেং জিয়াও পিং কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক ধারা থেকে আলাদা করে দেন। অস্ট্রেলিয়া আর কানাডা থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের জন্য আনা হয় গম। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি দৃশ্যমান হয় এতে। কিন্তু গোঁড়া কমিউনিস্টরা কি সংস্কারকে অত সহজে মেনে নিতে পারে? শিগগিরই মাওপন্থিরা লিও আর দেং-এর সংস্কারে পুঁজিবাদের

গন্ধ খুঁজে পায়। মাওবাদীরা সংস্কারবিরোধী শিবির গড়ে তোলে, সংঘাতের আভাস দেখা দেয় কমিউনিস্টদের বিভিন্ন গ্রুপে।

দলের মধ্যে ক্ষমতাহীন হয়ে নিজের হারানো ইমেজ ও শক্তি ফিরে পাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন মাও। সংস্কারবিরোধী অংশ সেই পথ অনেকটাই পরিষ্কার করে দিলো। মাও-এর বিভিন্ন লেখা একত্র করে *চেয়ারম্যান মাওয়ের উক্তিসমগ্র* নামে একটি বই বাজারে আনা হলো। সারা বিশ্বে এটি পরিচিতি পেল *লিটল রেড বুক* নামে। বইটির প্রচ্ছদ ছিল উজ্জ্বল লাল রঙের। চীনা সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে শুরু করে যুদ্ধ পরিচালনার কলাকৌশল সম্পর্কে মাও কী ভাবতেন—এ সবই ছিল বইটির বিষয়বস্তু। মাওবাদীদের জন্য লাল বইয়ের ফলাফলও ছিল বেশ ইতিবাচক। রাতারাতি এটি সাধারণ মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিলো বিত্তবানদের বিরুদ্ধে। ফলে তা কমিউনিস্টদের জন্য শাপেবর হলেও চীনের ইতিহাসকে ঠেলে দিলো এক দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের দিকে। লাল বই দ্বারা প্রভাবিত লোকগুলো গুরুর বিরোধিতাকারীদের শায়েস্তা করার পথ বেছে নিল। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো অসংখ্য মানুষের ঘরবাড়ি। সংস্কারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা গণরোষ সামনে এনে মাও ফিরতে চাইলেন পূর্ণ ক্ষমতায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঘোষণা দিলেন একক কর্তৃত্বে। তরুণদের ডেকে ডেকে বলা হলো—'পুরোনো প্রথা ভেঙে দাও, সমাজতন্ত্র শক্তিশালী করো'। তরুণরা গুরুর কথায় সাড়া দিলো। অনুগত এ তরুণদের দিয়েই গড়া হলো 'রেডগার্ড'। চীনে শুরু হলো নতুন উৎপাত।

তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে লাল বই হাতে রেড গার্ড সদস্যরা

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তরুণদের নিয়ে গড়া মাওয়ের রেড গার্ড অ্যাকশনে নামল, চীন পরিণত হলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এক ভয়াল জনপদে। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা আসবাবপত্র ভেঙে দিতে লাগল। এমনকি কারও চুল বেশি লম্বা মনে হলে তাকে ধরে চুল কেটে দিত তারা। নেতার হুকুম—পুরোনো সব নষ্ট করে দিতে হবে। হোক সেটা প্রথা কিংবা ঐতিহ্য। চারটি পুরোনো জিনিসের বিরুদ্ধে শুরু হলো মাওবাদীদের অভিযান। পুরোনো অভ্যাস, পুরোনো ধ্যানধারণা, পুরোনো ঐতিহ্য আর পুরোনো সংস্কৃতি। ফলে পুরোনো সব শিল্পকর্ম, ছবি কিংবা লেখা যা পাওয়া গেল, সব ধ্বংস করা হলো। এমনকি তারা মন্দিরে আগুন দিলো, পুড়িয়ে ফেলল অন্যান্য উপাসনালয়ও। অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করল ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী আর শিক্ষকদের। রেড গার্ডের বিশেষ টার্গেট ছিল ভূ-স্বামী আর শিক্ষকরা। ক্লাসরুমে শিক্ষকদের গালাগালি আর অপমান করা ছিল মাওবাদী ছাত্রদের নিয়মিত কর্ম। শিক্ষকদের মাথায় তারা গাধার টুপি পরিয়ে দিত। এমনকি থুতু ছিটিয়ে দিত কারও কারও গায়ে। রেড গার্ডের কথা না শুনলেই প্রকাশ্যে অপমান আর হেনস্থার শিকার হতো প্রত্যেকে। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে চীনে বহু ধরনের সমস্যার জন্ম হয়। অনেকেই জানতেন না, ঠিক কী কারণে বিপ্লবে শামিল হয়েছেন তারা। কলকারখানায় কাজ করা শ্রমিকরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ায় উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমতে থাকে। চীনের শিল্প উৎপাদন নেমে আসে ১৪ শতাংশে। এতে মাওবাদীদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হলেও সাধারণ চাইনিজদের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

রেড গার্ডের গুণ্ডামির সুযোগে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ কর্তৃত্ব ফিরে পান মাও সে তুং। সংস্কারপন্থি লিউ শাও চি-এর ঠাঁই হয় কারাগারে। সেখানেই মারা যান তিনি। নির্বাসনে পাঠানো হয় আরেক সংস্কারবাদী দেং জিয়াও-কে। রেড গার্ডের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাননি দেং-এর স্বজনরাও। চারতলা ভবনের জানালা দিয়ে নিচে ছুড়ে ফেলে দেং-এর ছেলেকে পঙ্গু করে দেয় তারা। ১৯৬৯ সালে মাও ঘোষণা দেন সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছে। যদিও তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই কথিত বিপ্লব থামেনি। আর এই পুরো সময়জুড়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করেছেন তার কাছের লোকজন।

কুখ্যাত বিপ্লবী নেতা মাও সে তুং মারা গেলেন ১৯৭৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। তার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় ফিরলেন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কারপন্থি নেতারা।

চীনের প্রেসিডেন্ট হলেন দেং জিয়াও পিং। আজকের সমাজতান্ত্রিক চীনের যে পুঁজিবাদী চেহারা, এর কৃতিত্ব বা গালাগাল তারই প্রাপ্য। অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে কট্টর সমাজতন্ত্রের খোলস থেকে বের করে অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই তিনি এই রূপ দিয়েছেন। পুঁজিবাদী ও আধুনিক বিশ্বের সাথে যুক্ত করে চীনকে দাঁড় করিয়েছেন বিশ্ব পরাশক্তি হিসেবে। দেং বিদেশি প্রভাব থেকে চীনকে মুক্ত করেছেন, অবদান রেখেছেন ঐক্যবদ্ধ জাতি বিনির্মাণে। তার রেখে যাওয়া চীনই এখন পৃথিবীর অন্যতম সুপার পাওয়ার।

দেং চেয়েছিলেন দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংস্কারের বীজ বপন করতে। '৬২-এর সম্মেলনেই তার প্রমাণ মেলে। আর এ কারণে তাকে কয়েকবারই কমিউনিস্ট পার্টির কট্টর নেতাদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে, বহিষ্কৃত হতে হয়েছে দলীয় পদ থেকে। এমনকি দূর জনপদে নির্বাসিতও হতে হয়েছে তাকে। পারিবারিকভাবে রেড গার্ডের হাতে অপদস্থ হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, তবুও দমে যাননি দেং জিয়াও। অদম্য সাহস নিয়ে এগিয়ে গেছেন স্বপ্ন জয়ের মিশনে। তার হাত ধরেই চীন এখন বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি। তবে এতকিছুর জন্য চীনকে অপেক্ষা করতে হয়েছে মাও সে তুং-এর মৃত্যু পর্যন্ত।

# যেভাবে পরাশক্তি হলো চীন

চীন এখন 'পঞ্চম ড্রাগন'। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই স্বস্তির যাত্রা শুরু করেছে দেশটি। এর মধ্যে তার নীতিতে, বিধিতে আর আচরণে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এক সন্তান, দুই সন্তান নীতি থেকে বেরিয়ে সবশেষে গ্রহণ করেছে তিন সন্তান নীতি। সংস্কারের ডানায় ভার তুলে দিয়ে চীন আপাতত সফল। কিন্তু গত কয়েক দশকের এই সংস্কারের ধারা কতটা সমাজতান্ত্রিক ছিল, সে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। অস্বীকার করার উপায় নেই, সেখানে সংস্কার যতটা ভারী হচ্ছে, ততটাই হালকা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। তবে সমাজতন্ত্রের মুখোশ টিকে থাকায় স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে সহজে।

সমাজতন্ত্রের চিরাচরিত ফর্মুলা ডিঙিয়ে চীন কেন অর্থনৈতিক সংস্কারে মন দিয়েছিল তার একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমত, দেশটির অর্থনীতিতে যে স্থবিরতা এসেছিল, তা কাটিয়ে ওঠা জরুরি ছিল। সেইসাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে দাদাগিরি ফলানোর জন্য যে প্রক্সি লড়াই চলছিল, সেখানে অংশগ্রহণ করাকে অনিবার্য মনে করেছিল চীন। সমাজতান্ত্রিক নীতি-কাঠামো ঠিক রেখে এই লড়াইয়ে সুফল পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না প্রায়। ফলে নীতির প্রশ্নে আপস করতে হয়েছে তাকে। তবে সরকার টিকে থাকার প্রধান ব্যাপারটি নিহিত রয়েছে জনগণের খুশি-অখুশিতে। তাই চীনা জনগণের জীবনমান উন্নয়নেও সরকারের লক্ষ্য ছিল স্থির।

সংস্কার করতে গিয়ে অর্থনীতির ওপর কমিউনিস্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমাতে হয়েছিল, সৃষ্টি করতে হয়েছিল ব্যক্তিগত খাত। এমনকি দূর করতে হয়েছিল বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সকল প্রকার বাধা। প্রথম কোনো চীনা শীর্ষ কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন দেং জিয়াও। এরপরই

চীনে বিনিয়োগ শুরু করে আমেরিকা। সমাজতান্ত্রিক চেতনা এখানেই মার খেয়ে যায়। আর কাগজে-কলমে সমাজতান্ত্রিক হলেও পুঁজিবাদের ব্যামোতে ধীরে ধীরে আক্রান্ত হতে থাকে চীন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী দুই দশক চীনের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা মোটেও আশানুরূপ ছিল না। মাও-এর 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' চীনের গ্রামাঞ্চলে গরিবের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য থেকে কোনো কিছু সঞ্চয় করতে পারছিল না। ছিল না বিদেশি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা। অবকাঠামোগত উন্নয়নেও নজর ছিল না কারও। সমাজতন্ত্রের নামে এই বাড়ন্ত দারিদ্র্যকে তাই সংস্কারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

১৯৭৭ সালে দেং ক্ষমতায় বসলেও প্রকৃতপক্ষে তার হাতে তখনও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল না, যেমনটা ছিল মাও-এর হাতে। এজন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও পাঁচ বছর। এই সময়টাতে দেং-কে কমিউনিস্ট পার্টির কট্টরপন্থিদের সাথে লড়াই, সংগ্রাম, সংলাপ সবই করতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত কট্টরবাদীরা হেরে গেছে। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে সংস্কারপন্থি দেং-এর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনকে মাও-এর বৃত্ত থেকে বের করে এনে আধুনিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রতিরক্ষা খাতে গণসংস্কারের উদ্যোগ নেন তিনি। মাও-এর জমানায় সরকার নিয়ন্ত্রিত যে কমিউনভিত্তিক চাষাবাদব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, দেং তা ভেঙে ফেলেন অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই। ধীরে ধীরে কৃষকদের হাতেই জমির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বহুকাল পর স্বাধীনভাবে চাষাবাদ আর বেচাবিক্রির অধিকার ফিরে পায় কৃষক। পরিবারকে সদস্য অনুপাতে কৃষকদের জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। বাড়ানো হয় কৃষিপণ্যের দাম। ফলে কৃষি উৎপাদন যেমন বাড়ে, বাড়তি মূল্যের কারণে কৃষি পরিবারগুলো ফিরে পায় সচ্ছলতা। কৃষকদের হাতে অর্থ ও একক সঞ্চয় বাড়ে। প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক সচ্ছলতায় সামষ্টিকভাবে শক্তিশালী হতে থাকে চীনের অর্থনীতি, ত্বরান্বিত হয় উন্নয়ন। এতদিনে যৌবন হারিয়ে ফেলা শহর-বন্দরগুলোও ঝকঝকে-তকতকে হয়ে ওঠে। কৃষিপণ্যের সরবরাহ বাড়ায় মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে শহর ও গ্রামে। আর্থিক সমৃদ্ধির বদৌলতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাও হ্রাস পায় দ্রুতগতিতে।

মাও ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের করে নিয়েছিলেন। এটাই সমাজতন্ত্রের মূল প্রস্তাবনা, কিন্তু বাস্তবতা থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়া দেং হাঁটলেন উলটো পথে। তার আমলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানাগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রির স্বাধীনতা পায় মালিকরা। ফলে কারখানার বাজারমুখিতা বাড়ে। আর বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাড়ে পণ্যের গুণগত মান ও উৎপাদন। পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও প্রণোদনা দেওয়া হয় কারখানাগুলোকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হয় কর্মচারী ছাঁটাই, নতুন নিয়োগ, মজুরি, দাম নির্ণয় এবং মুনাফার অর্থ পুনরায় বিনিয়োগের অনুমতি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাষ্ট্র নিজেই এসব দেখভাল করত। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মতো ব্যাপার তখন কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। তবে সরকারের সংস্কার নীতির কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। এতে গতি ফিরে পায় অর্থনীতি।

ফলে সময়ের ব্যবধানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি চীনে অসংখ্য যৌথ ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে কমিয়ে দেওয়া হয় শিল্পক্ষেত্রে আয়করের হার। অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি শুল্কমুক্তভাবে আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। নামমাত্র শুল্কে ভোগ্যপণ্য আমদানির সুযোগ দেওয়া হয় বিদেশি শিল্পপতিদের জন্য। শতভাগ মালিকানা ভোগের অধিকার পায় বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিরা। এসব কারণে চীনে শিল্প উৎপাদন ব্যাপকমাত্রায় বেড়ে যায়। এ সময় সামরিক ব্যয়ও বাড়িয়ে দেন দেং। এ ছাড়া সংস্কারের অংশ হিসেবে সৃষ্টি করা হয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও স্টক এক্সচেঞ্জ। এ সবকিছুর পর চীনের অর্থনীতিকে আর স্যোশালিস্ট অর্থনীতি বললে চলবে কেন!

দেং-এর সংস্কার নিয়ে অচিরেই একগাদা প্রশ্ন তৈরি হয়। বাজার অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক কি না—শুরু হয় সেই পুরোনো বিতর্ক। কারণ, সমাজতন্ত্রে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। যদিও সংস্কারবাদীদের দাবি, সমাজতান্ত্রিক চেতনা ঠিক রেখেই সব করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই চীনা সমতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি নিজের দেশে আমদানি করে নিয়ে আসে ভিয়েতনাম।

দেং অর্থনীতি থেকে সমাজতন্ত্রের ভূত তাড়ালেও রাজনীতিকে রেখেছেন প্রায় অক্ষত। সেখানে একেবারেই হাত দেননি তিনি। পরবর্তীকালে রাজনীতিতে সংস্কার আনতে গিয়ে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নই ভেঙে দিয়েছেন মিখাইল গর্বাচেভ।

চীনে তেমনটি ঘটেনি। সেখানকার পিপলস আর্মি এখনও কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে। সংস্কারের ফলে চীনে পুঁজিপতির সংখ্যা বাড়লেও বড়ো বড়ো অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের হাতেই রয়েছে। বলা হয়ে থাকে দেং রাজনৈতিক সংস্কার করেননি বলে সমাজতান্ত্রিক চীন এখনও টিকে আছে আর গর্বাচেভ রাজনৈতিক সংস্কারে হাত দিয়েছেন বলেই ভেঙে খানখান হয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

মাও-এর জীবদ্দশায় চায়না কমিউনিস্ট পার্টি পলিটব্যুরোর সদস্য থাকলেও দলে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন দেং। অন্য সব পদ থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। অথচ একসময় তিনি ছিলেন চীনের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালে তিনি আবারও মাও-এর ডেপুটি হন। তবে সেই সম্পর্ক টিকে ছিল মাত্র এক বছর। সে সময় মাও ছিলেন অসুস্থ। ফলে গদি হারানোর ভয়ে দেং-কে সরিয়ে দেন ডেপুটির পদ থেকে। এরপর বেইজিং চলে যান দেং জিয়াও পিং। তবে তার ভাগ্য ভালো, অনতিকাল পরেই ১৯৭৬ সালে মারা যান মাও। তার মৃত্যু শোক বয়ে আনলেও পার্টির জন্য তা ছিল যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক।

আবারও সামনে চলে আসেন দেং জিয়াও পিং। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি চীনকে উন্মুক্ত করে দেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য। এর ফল বিদেশিদের সাথে চীনের ব্যাবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্কের বরাতে রপ্তানিশিল্প এগিয়ে যায় তরতর করে। ধীরে ধীরে চীন গ্লোবাল কমিউনিটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অর্জন করে সদস্যপদের মর্যাদা। যে দেশ কৃষি ও ভারী শিল্পের ওপর দাঁড়িয়েছিল, খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তারাই পরিণত হয় এশিয়ার রপ্তানি মেশিনে। বিশ্ববাজারের জন্য টেক্সটাইলস, কম্পিউটার ও অটোমোবাইল বানাতে থাকে তারা। কাজেই জিয়াও পিং-কে 'The founder of China as a Global Power' বললে সেটা অত্যুক্তি হবে না। প্রায় ২০ বছর চীনের নেতৃত্ব দেন জিয়াও পিং। অথচ এই ব্যক্তিকে নিয়ে ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল লিখেছিল—'Man without any vision whatsoever.' আর হেনরি কিসিঞ্জার তাকে নিয়ে বলেছিলে—'A tragic figure that will be unable to emerge from Mao's shadow today.'

জিয়াও পিং মূলত মানুষের ভাবনা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আগে পিপলস আর্মিকে শক্তিশালী করার দিকে জোর দেননি। দেং-এর নীতি ছিল স্পষ্ট—সবার আগে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এটা সত্য যে, সাম্যবাদ বা শ্রেণিবৈষম্য নিয়ে তার উচ্চ ধারণা ছিল না। প্রকাশ্যে

জনসম্মুখে সেই অজ্ঞতা স্বীকারও করতেন তিনি। সহকর্মীরা তাকে পরামর্শ দিয়েছিল মৃত্যুর পর নিজের দেহ মমি করে রাখতে। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, তার ভস্ম যেন বিমান থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় গভীর সমুদ্রের বুকে। দেং ধারণা করতেন, মুনাফা ও স্বীকৃতির জন্য ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিও রাষ্ট্রের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য ধীরে ধীরে সবকিছুতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে মনোযোগ দেন বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। এতে একক মালিক ও কোম্পানি আগের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা লাভ করে। তিনি চেয়েছিলেন— কৃষক জমির, ম্যানেজার ফ্যাক্টরির, মেয়র শহরের এবং সাধারণ জনতা নিজেদের দায়িত্ব নিক।

প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে ব্যবসায়ের স্বাধীনতা দিলেও পার্টিতে সংস্কার আনেননি জিয়াও পিং। তিনি অত্যাচার করতেন না বটে, কিন্তু পার্টির সমালোচনাও সহ্য করতেন না। ১৯৮৯ সালে তিয়েন আনমেন গণহত্যার[২১] জন্যও দায়ী ছিলেন তিনি। পশ্চিমারা জিয়াও পিং-এর ওপর ভরসা করতে পারতেন না। তাদের কথা হলো—গণতন্ত্র ছাড়া মার্কেট ইকোনমি কখনোই গতিশীল রাখা সম্ভব নয়।

সংস্কারপরবর্তী চায়নার কৃষকদের ফসল বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে জমির মালিকানাও কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে শুরু করেন দেং। সংস্কার পলিসি শুরুর পাঁচ বছরের মাথায় ৯৮ ভাগ কৃষিজমিই মালিকরা ফেরত পান। ১৯৮৮ সালের পর থেকে নিজেদের জমিতে যা খুশি তা-ই উৎপাদন, জমি বিক্রি, লিজ দেওয়া এমনকি উত্তরাধিকার মনোনয়ন করতে পারত চীনের কৃষকরা। দেং-এর এই উদার ভূমিব্যবস্থার ফলে গ্রামে উৎপাদন বেড়ে যায় নগরের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

---

[২১] ১৯৮৯ সালের এপ্রিল থেকে কমিউনিস্ট সরকারের দুর্নীতি বন্ধ ও গণতন্ত্রের দাবিতে ঐতিহাসিক তিয়েন আনমেন স্কয়ারে অনশন শুরু করে করে শতশত শিক্ষার্থী। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় কলকারখানার শ্রমিকরাও। অচিরেই হাজারো মানুষের জমায়েতে পরিণত হয় তিয়েন আনমেন চত্বর। আন্দোলন দমনে ২৩ শে জুন রাতে সেনা ও ট্যাংক নামায় চীন সরকার। ৪ জুন মধ্যরাতে সরকারি বাহিনী চত্বরটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সেনাদের নির্বিচার গুলিতে নিহত হয় শতশত ছাত্র-শ্রমিক! তিয়েন আনমেনের সেই গণহত্যার কোনো সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি চীন। তবে ধারণা করা হয়, হাজারের বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছিল সেদিন!

# ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে কে

ভবিষ্যৎ সব সময়ই অনিশ্চিত। আমরা কেবল কিছুটা ধারণা করতে পারি চলমান গতিধারা বা পরিস্থিতিকে আমলে নিয়ে। আমরা দেখেছি ট্রাম্প কীভাবে আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। এখন যুক্তরাষ্ট্র যদি তাঁর এই বিচ্ছিন্নতার নীতি ধরে রাখে, তবে ভবিষ্যতে চীনই হবে বিশ্ব পরিচালকের আসনে সবচেয়ে যোগ্য নেতা। দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গরা। ইংরেজরা কলোনি গড়ার নেতৃত্ব দেয়নি সত্য, কিন্তু তারাই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। দীর্ঘদিন তাদের ওপর কথা বলার কেউ ছিল না পৃথিবীর বুকে। আজকের সুপার পাওয়ার আমেরিকাও ব্রিটিশ শাসন হজম করেছে একসময়। কিন্তু বিংশ শতকে এসে ইউরোপের কয়েকশো বছরের সেই নেতৃত্ব ভেঙে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ইউরোপকে পেছনে ফেলে সামনে চলে আসে যুক্তরাষ্ট্র। তার পিছু পিছু সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই দুই নতুন পরাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলে ৯০ অবধি। মিখাইল গর্বাচেভের হাত ধরে সংস্কারে ডুবে সোভিয়েত কমিউনিজম, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে বেরিয়ে আসা নতুন রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র আগের মতো আর গুরুত্ব দেয়নি বা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। এরপর থেকে আমেরিকা নিজের মতো করেই হেঁটেছে, পরিণত হয়েছে দুনিয়ার মোড়লে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিনব উত্থান ও তার বৈশ্বিক প্রভাবের কারণে বিংশ শতাব্দীকে বলা হয়ে থাকে 'আমেরিকান সেঞ্চুরি'।

আজকাল অবশ্য অনেকে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন, এই শতকেই আমেরিকার দাদাগিরি মুখ থুবড়ে পড়বে। বিশ্বকে এবার নেতৃত্ব দেবে এশিয়া। কাজেই একবিংশ শতাব্দী হতে পারে 'এশিয়ান সেঞ্চুরি'। যদি তা-ই হয়, নেতৃত্বের জন্য যোগ্য প্রার্থী কে হবে? চীন? ভারত? দক্ষিণ কোরিয়া? না জাপান? পাল্লাটা যদিও-বা চীনের দিকেই ঝুঁকছে, তবে তা একতরফা নয় মোটেই।

পুরো বিষয়টিই নির্ভর করছে আমেরিকা সামনের পৃথিবীতে কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে তার ওপর। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র যেমন নতুন কোনো যুদ্ধে জড়ায়নি, তেমনি অনেক পরীক্ষিত মিত্রকেও হারিয়েছে অল্প সময়ের ব্যবধানে। এ তালিকায় আছে পাকিস্তান ও তুরস্কের মতো দেশও। ফলে বিগত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশি দৃশ্যমান হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। ক্ষমতায় এসেই ট্রাম্পের রেখে যাওয়া ফরেন পলিসিতে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করেছেন বাইডেন। তাতে কতটা কী রক্ষা হবে, সেটাই প্রশ্ন।

করোনা মহামারি সারা পৃথিবীর খোলনলচে বদলে দিয়েছে। এক ধাক্কায় ফেলে দিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির অত্যুঙ্গ পিরামিড। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জ্বালানি তেলের দাম ঋণাত্মক হওয়ার নজিরও আমরা দেখেছি। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়; সারা বিশ্বেই তেলের দাম পড়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিকভাবে। পুঁজিবাজারের সেই বিরাট ধস ও মন্দা থেকে এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি বিশ্ব। বিশ্বব্যাপী এই যে স্থবিরতা, অনিশ্চয়তা আর শঙ্কা, তার মধ্যেও কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে পরিবর্তনের গুঞ্জন। আমরা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি, আমেরিকান আধিপত্যের পতন ঘটিয়ে পৃথিবীর বুকে নতুন পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে চীন।

আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা কেন এমন ভাবছি? কারণ, ইতিহাস বলে—বিশ্বব্যবস্থায় ঠিক তখনই নতুন মোড়লের উত্থান হয়েছে, যখন ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী কোনো ঘটনা মঞ্চস্থ হয়েছে পৃথিবীর বুকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বৈশ্বিক রাজনীতিতে ফ্রান্স আর জার্মানি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটেনের কাছে। এরপরই বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে উত্থান ঘটে ইংরেজদের, ধীরে ধীরে চোখ খুলতে শুরু করে আমেরিকাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরেক দফা পরাশক্তির রূপান্তর ঘটে, আগের চেয়েও অনেক বড়ো শক্তিকেন্দ্র হয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্র। তবে তাকে চূড়ান্তভাবে মোড়লের আসনে বসিয়ে দেয় **সুয়েজ সংকট বা দ্বিতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ**[২২]। সুয়েজ খাল সংকটকে কেন্দ্র করে ব্রিটেনের ভুল পদক্ষেপ

[২২] মিশর সুয়েজ খালকে জাতীয়করণের উদ্যোগ নিলে সুয়েজ সংকটের শুরু হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আছে লেখকের প্রথম বই *দ্য কিংডম অব আউটসাইডারস*-এ।

আমেরিকাকে বৈশ্বিক নেতৃত্বে নিয়ে আসে। প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ হারায় ব্রিটেন।

এই যে পৃথিবীতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে, যুদ্ধ ছাড়া এ ধরনের ঘটনা অতীতে খুবই কম ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ রকম গণমৃত্যুর দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। কাজেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এই করোনা মহামারি। শুরুর দিকে আমেরিকা মহামারি নিয়ন্ত্রণে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, তারই সূত্র ধরে অনেকে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে চীনের উত্থানের কথা ভাবছেন। তারা কি ভুল কিছু ভাবছেন?

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে যে করোনা মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবীর অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তা ছিল অভূতপূর্ব এক সংকট। বিশ্বব্যাপী মহামারির সেই ধকল সামলাতে গিয়ে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেরই অবস্থা হয়েছে লেজেগোবরে। দেশটির আর্থসামাজিক বৈষম্য আর অব্যবস্থাপনাগুলো দুনিয়ার সামনে উলঙ্গ হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রনায়কদের যে রকম শক্তপোক্ত ও দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কথা, ট্রাম্পের বেলায় সেটা একেবারেই ঘটেনি। গোড়ার দিকে করোনাকে কোনো রকম পাত্তাই দেননি তিনি। বলেছেন—একদিন 'জাদুর মতো উধাও' হয়ে যাবে করোনা। মূলত ট্রাম্প প্রশাসনের বিদেশ নীতি আর প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণহীন কথাবার্তার কারণেই বৈশ্বিক নেতৃত্ব নিরঙ্কুশভাবে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকেনি। তবে সেই দিন গত হয়েছে, ক্ষমতায় এসেছেন জো বাইডেন। এবারে হয়তো পরিবর্তন আসবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে, মার্কিন প্রতিপত্তিও আগের অবস্থানে ফিরবে। কিন্তু এটা কেবলই ধারণা, দৃশ্যমান পরিস্থিতি তা বলে না; বরং পরিস্থিতি দেখলে মনে হবে, সবকিছু চীনেরই অনুকূলে। এশিয়ার কিছু রাষ্ট্র বিশেষ করে মিয়ানমার, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান—এসব দেশের দিকে তাকালেই দুর্বল আমেরিকার বিপরীতে প্রভাবশালী চীনের বাহাদুরি স্পষ্টতই টের পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনৈতিক প্যাকেজ নিয়ে তৃতীয় বিশ্বে রীতিমতো সামন্তপ্রভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে চীন। করোনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপীয় মিত্ররা যেভাবে নাকানি-চুবানি খেয়েছে, তার বিপরীতে চীনকে বেশ সফলভাবেই তা মোকাবিলা করতে দেখা গেছে। মহামারি শুরুর পর্যায়ে চীনের পদক্ষেপ ও আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও পরের

দিকে ভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়ানো রোধ করতে পেরেছিল শি চিন পিংয়ের দেশ। এমনকি এশিয়ার আরও কিছু দেশ যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি দক্ষতা দেখিয়েছে। *লন্ডন রিভিউ অব বুকস*-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে—'দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনামের মতো এশিয়ার দেশগুলো যেভাবে মহামারি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের মতো দেশও শুরুর দিকে তা পারেনি।' অথচ মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন মুলুকেরই নেতার আসনে থাকার কথা ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের 'শ্রেষ্ঠ' ভাবতে ভালোবাসত যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য মানিকজোড়। এসব দেশের নেতারা মনে করতেন, বাকি বিশ্বের কাছ থেকে আর কিছু শেখার নেই তাদের। কিন্তু সেই ধারণা যে ভুল—করোনা মহামারি তা ভালোভাবেই প্রমাণ করে দিয়ে গেছে। এই দেশগুলোর তরফ থেকে এমন কোনো পরামর্শ বা বাক্যও পাওয়া যায়নি, যা বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করতে পারে, স্বস্তি দিতে পারে। এটা স্পষ্টতই বৈশ্বিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের পালাবদলের ইঙ্গিত। মহামারির ইতিহাসে এমন নজির ভূরিভূর। অতীতে এমন আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলায় নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে নেতিয়ে পড়েছিল বহু শক্তিশালী সাম্রাজ্য।

এশিয়া দিনকে দিন বিদেশি বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের মতো আসিয়ান জোটভুক্ত দেশগুলো আবির্ভূত হয়েছে ২১ শতকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে। এসব দেশে জনসংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ফলে ভূরাজনৈতিকভাবেও গুরুত্ববহ হয়ে উঠছে এই অঞ্চল। তবে এশিয়ার এই উত্থানে বাগড়া দিতে পারে এশিয়ারই আরেক দেশ চীন।

চীন মাঠে নেমেছে অর্থনৈতিক প্যাকেজ নিয়ে। মিত্রদেশগুলোর দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্যাকেজ ঘোষণা করছে, তৈরি করছে ভয়াবহ ঋণের ফাঁদ। দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোতে চীন প্রচুর ঋণ দিচ্ছে। সেই ঋণ শোধ করতে না পারা দেশগুলো আটকে যাচ্ছে চীনের তৈরি ফাঁদে। এমনটা আমরা শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, পাকিস্তানে দেখেছি; আর এখন দেখছি মিয়ানমারে। ভবিষ্যতে সেই ফাঁদে পা দিতে পারে আফগানিস্তান, এমনকি বাংলাদেশও। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বারবার বাণিজ্যযুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া চীন আঞ্চলিক রাজনীতিতে মনোযোগী হচ্ছে ধীরে ধীরে। পাকিস্তান, ইরান, নেপাল, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান আর শ্রীলংকা তার বিশেষ টার্গেট।

মিয়ানমারে তার দাম্ভিক উপস্থিতি আগে থেকেই ছিল। কিছুদিন পর বিশ্ব অর্থনীতি যে তার হাতেই আসতে চলেছে, তা সহজেই অনুমেয়। বড়ো অর্থনীতি কেন চীনের দখলে আসবে, তার সম্ভাবনার চিত্র উপস্থাপন করা দরকার। গেল বছরের এক প্রতিবেদন বলছে, এ দশক শেষ হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে চীন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর ইকনোমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ সিইবিআর' জানিয়েছে—করোনাভাইরাস সংকট চীন যেভাবে সামাল দিয়েছে, এর ফলে চীনের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হবে কমপক্ষে দুই শতাংশ। দেশটির অর্থনীতিতে ২০২৫ সাল নাগাদ প্রবৃদ্ধি ঘটবে গড়ে ৫.৭ শতাংশ করে। সিইবিআর-এর হিসাব মতে—যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যে অবস্থায় আছে, তাতে তার সাথে চীনের ব্যবধান কমে আসবে খুব শিগগিরই। আর ডলারের হিসেবে চীনের অর্থনীতির মূল্যমান আগামী এক দশকের মধ্যেই ছাড়িয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্রকে।

চীনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দক্ষিণ চীন সাগর। ভূরাজনৈতিক কারণেই এই সাগরের গুরুত্ব বাড়ছে। দক্ষিণ চীন সাগর চীনের বাড়ির সামনের উঠানের মতো। সুতরাং এর নিরাপত্তার মধ্যেই রয়েছে চীনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার নিশ্চয়তা। এ ছাড়া, দক্ষিণ চীন সাগরের বুকে আছে প্রায় ১৯০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ১১ বিলিয়ন ব্যারেল তেল। নৌপথে বৈশ্বিক বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ এই রুট দিয়েই সম্পন্ন হয়। তাই দক্ষিণ-চীন সাগরে ক্রমাগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে দেশটি। চীনের এমন অগ্রগতি ও আগ্রাসী চিন্তা অনেককেই ভাবিয়ে তুলছে। এতে একবিংশ শতক সম্মিলিতভাবে এশিয়ার হওয়ার বদলে হয়ে যেতে পারে কেবলই চীনের।

একসময় চীন এশিয়ার জাগরণে বিশ্বাসী ছিল। এখন দেশটি আর এশিয়ার অন্যান্য দেশকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার পথে নেই। কারণ, চীন নিজেই এখন এক নতুন উদীয়মান পরাশক্তি।

# তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীদের নজর

অ্যাংলো-পারসিয়ান অয়েল কোম্পানি কেবল ইরানেই হস্তক্ষেপ করেনি, নাক গলিয়েছে পাশের দেশ ইরাকেও। ১৯২১ সালে হাশেমিদের[২৩] হাতে শাসনভার ছেড়ে দেওয়ার পর মেসোপটেমিয়ার নতুন নাম হয় ইরাক। শাসনভার ছাড়লেও ইরাকের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতেই থাকে, সেখানে স্থাপিত হয় ব্রিটিশ বিমানঘাঁটি। ইরাকে যেসব ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তা আসতেন, অ্যাংলো-পারসিয়ান অয়েল কোম্পানির কর্তাদের কথামতোই উঠবস করতেন তারা।

ইউরোপের দ্বিতীয় কোনো পরাশক্তি যাতে ইরাক-ইরানের তেলভান্ডারে হাত দিতে না পারে, সেই চেষ্টায় কোনোরূপ কমতি রাখেনি ব্রিটেন। তবে ঘাড়ের কাছে এসে নিশ্বাস ফেলল ইউরোপের বাইরে থেকে আসা নতুন এক বিপদ। মধ্যপ্রাচ্যের তেল বাণিজ্যে ভাগ বসাতে চাইল আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি। এমনকি কোম্পানিটিকে সুযোগ করে দিতে ইংরেজ সরকারের কাছে নোট ইস্যু করে বসল খোদ মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। লর্ড কার্জন তখন

---

[২৩] হাশেমি রাজবংশের নামটা এসেছে মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রপিতামহ হাশেম ইবনে আবদে মানাফ-এর নাম অনুসারে। ১০ম শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৯২৪ সালে সউদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক হেজাজ জয় করার আগ পর্যন্ত হাশেমি পরিবার নিরবচ্ছিন্নভাবে মক্কা শাসন করেছে। তবে বর্তমানে জর্ডানে যে হাশেমি রাজবংশ এখনও ক্ষমতায় আছে, এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা হয় শরিফ হোসাইন বিন আলিকে। তিনি বর্তমান জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহর দাদার দাদা। ১৯০৮ সালে উসমানীয় খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তাঁকে মক্কার আমির ও শরিফ নিযুক্ত করেন। ১৯১৬ সালে হোসাইন নিজেকে আরবের বাদশাহ ঘোষণা দেন এবং উসমানীয়দের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের সূচনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২১ সালে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ও ফয়সাল যথাক্রমে জর্ডান ও ইরাকের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে ইরাক থেকে গোড়াসুদ্ধ হাশেমির বংশ উৎখাত করেন ব্রিগেডিয়ার কাসিম। ফলে হাশেমি রাজপরিবারের শাসন এখন কেবল জর্ডানেই টিকে আছে।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আমেরিকার দাবি আমলেই নিলেন না তিনি। তেল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যকার বিরোধ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সানরেমো সম্মেলনের পর থেকে। এই আগুন উসকে দিতে বলশেভিকদের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে ব্রিটেন। তখনও ইরান ও ইরাকের তেলখনিগুলোতে ব্রিটিশদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এর অনতিকাল পরই নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয় লাতিন আমেরিকা।

বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে মেক্সিকোর বন্দরনগরী ট্যাম্পিকোতে জ্বালানি তেলের বিশাল মজুত আবিষ্কৃত হয়। শহরটি মেক্সিকোর দক্ষিণ-পূর্বে এবং ভেরাক্রুজ অঙ্গরাজ্যের উত্তরে অবস্থিত। সে সময় ট্যাম্পিকো ছিল পুরো আমেরিকার প্রধান তেল রপ্তানি কেন্দ্র এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যস্ততম বন্দর। বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য শহরটিকে তুলনা করা হতো ইতালির ভেনিস নগরীর সাথে।

১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম হাওয়ার্ড প্রশাসন এবং জার্মান সাম্রাজ্যের মদতে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মেক্সিকোর ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল ভিক্টোরিয়ানো হুয়ের্তা। আমেরিকার চেষ্টায় ব্রিটেনসহ অনেকেরই সমর্থন পান হুয়ের্তা। তাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে অর্থের জোগান দেয় মেক্সিকান ইগল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি। এই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট তখন ইংরেজ তেল কারবারি হুইটম্যান পিয়ারসন। প্রথমাবস্থায় তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে। কাজেই তিনি যে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর স্বার্থ দেখবেন—সেটা বলাই বাহুল্য। এ সময় মেক্সিকোর অর্ধেক তেল উত্তোলন করত মেক্সিকান ইগল কোম্পানি। দৃশ্যপট পালটাতে শুরু করল, যখন আমেরিকার ক্ষমতায় বসলেন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। ভিক্টোরিয়ানোর ওপর থেকে মার্কিন সমর্থন উঠিয়ে নিয়ে তিনি সশস্ত্র সমর্থন দিলেন মেক্সিকোর বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ব্রিটেনও তার আগের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে মন দিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। মেক্সিকোর ক্ষমতায় এলেন উইলসন সমর্থিত জেনারেল ভেনুসতিয়ানো কারানজা। নতুন সরকারকে ১ লাখ ডলার উপঢৌকন পাঠাল রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি। আর এভাবেই ব্রিটিশদের হাত থেকে মার্কিন কবজায় চলে এলো মেক্সিকো।

সে সময় ট্যাম্পিকোতে দৈনিক গড়ে ২ লাখ ব্যারেল তেল পাওয়া যেত। কিন্তু মার্কিন স্নেহধন্য কারানজা একসময় জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেন, ফলে তাকে আর পছন্দ করেনি যুক্তরাষ্ট্র। একসময়ের বন্ধু পরিণত হয় ঘোর শত্রুতে। অবশ্য বিশ্বযুদ্ধের গোলযোগে ব্রিটিশ-মার্কিন তেলযুদ্ধ থেকে আপাত নিস্তার পায় মেক্সিকো। গুপ্তহত্যার আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে বহাল ছিলেন কারানজা।

রয়্যাল ডাচ সেলের প্রধান স্যার হেনরি ডেটারডিং ছিলেন একজন ওলন্দাজ নাগরিক। চাকরি করতেন ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায়, সিভিল সার্ভিসের একজন অফিসার হিসেবে। হেনরি চাকরিরত অবস্থাতেই পেট্রোলিয়ামের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে ইন্দোনেশিয়ার তেল ব্যবহার করে অল্প কদিনেই দ্যা রয়্যাল ডাচ অয়েল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট বনে যান তিনি। হেনরি লন্ডনভিত্তিক শেল ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানির সাথে রয়্যাল ডাচ কোম্পানিকে একীভূত করেন। অচিরেই এই মিত্রতা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রাস্টে পরিণত হয়। তাদের পেছনে ছিল ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন। নতুন এই কোম্পানি রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানিকে টেক্কা দিতে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে। আর এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয় ক্যালিফোর্নিয়া ওয়েল ফিল্ডস লিমিটেড ও রোক্সানা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি অব ওকলোহামাকে। এই দুই কোম্পানিরই মালিক ছিল লন্ডনভিত্তিক কোম্পানি শেল।

ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যে অ্যাংলো-পারসিয়ান কোম্পানি নামে একটি তেল কোম্পানি করার পাশাপাশি সারাবিশ্বের তেল খুঁজতে ব্রিটিশ ফরেন অফিস ও ইন্টেলিজেন্সের আওতায় খোলা হয় অন্য আরেকটি কোম্পানি। The d'Arcy Exploitation Company নামের ওই কোম্পানিটি মধ্য আমেরিকা, চায়না, বলিভিয়া আর পশ্চিম আফ্রিকাতে বিশ্বের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় এগিয়ে ছিল অনেকটাই। এ ছাড়া, ব্রিটিশ কন্ট্রোলড ওয়েলফিল্ডস বা বিসিও নামে আরেকটি কোম্পানি ছিল। বাইরের লোকজন মনে করত এটি কানাডীয়, অথচ এটিও ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। বিসিওর কাজ ছিল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় রকফেলারের কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে তেল অনুসন্ধান করা। ১৯১৮ সালে কোস্টারিকার তিনোকো সরকারের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন এনে দেয় বিসিও। এর বিনিময়ে পানামা সীমান্তের কাছে সাত মিলিয়ন একর জায়গায় তেল উত্তোলনের সুবিধা লাভ করে তারা। পরে পানামার সাথে সীমান্ত দ্বন্দ্বে কোস্টারিকায় মার্কিন হস্তক্ষেপে নতুন সরকার এলে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো

তেল অনুসন্ধানের সুযোগ পায়। মার্কিন ব্যাংকগুলোও কোস্টারিকাকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়। এরপর বিসিও যায় ভেনিজুয়েলাতে। প্রভাবশালী শেল কোম্পানি 'ভেনিজুয়েলা অয়েল কনসেশন লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানি খুলেছিল। শিগগিরই কোলন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি এবং স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অব ভেনিজুয়েলাসহ আরও কিছু কোম্পানি আধিপত্যের লড়াইয়ে নামল। ভেনিজুয়েলা হয়ে উঠল গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্র। তখন ব্রিটেন বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো তেল নিয়ন্ত্রক শক্তি। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশ তেলই ছিল তাদের দখলে। রাশিয়া, মেক্সিকো, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ, রোমানিয়া, মিশর, ভেনিজুয়েলা, ত্রিনিদাদ, ইন্ডিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চায়না এবং ফিলিপাইনের গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্রগুলো মোটামুটি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডেও ছিল ব্রিটিশ তেল কোম্পানিগুলোর অবাধ বিচরণ।

কয়েক বছর বাদেই ডেটারডিং আর রকফেলার—দুজনই চাইলেন রাশিয়ার বাকুর তেলখনিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। তবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল রকফেলার। হেরি সিনক্লেইর-এর 'আমেরিকান সিনক্লেইর পেট্রোলিয়াম কোম্পানি' রুশ সরকারের সাথে চুক্তি করল বাকু আর শাখালিন দ্বীপপুঞ্জের তেল উত্তোলনের জন্য। প্রস্তাব করা হলো রাশিয়াকে দেওয়া হবে ৫০ শতাংশ মালিকানা। সিনক্লেইর যুক্তরাষ্ট্র সরকার থেকে রাশিয়াকে অনেক ঋণ এনে দেন। এমনকি বলশেভিক সরকারের প্রতি মার্কিন স্বীকৃতিও এনে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঘটনা হলো—সিনক্লেইর মূলত বাকুর চুক্তিটি করেছিলেন রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির হয়েই। পরে অবশ্য কাজটি থেমে যায়। সেইসাথে বলশেভিকদের প্রতি মার্কিন স্বীকৃতিও আটকে যায় ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তৎপরতায়।

# প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জার্মানি ও তার ট্র্যাজেডি

জার্মানির অদম্য যাত্রা মলিন করে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ব্লু ব্লাডের দীর্ঘ রাজতন্ত্রের সিলসিলা শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যায়নি। জার্মান মিত্র উসমানীয়দের ভাগ্যেও জুটেছিল একই পরিণতি। যুদ্ধের পর সালতানাত ভেঙে গিয়ে কেবল আনাতোলিয়াকে ঘিরে জন্ম নেয় তুর্কি রাষ্ট্র। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আর বিজয়ীদের চাপে জার্মান অর্থনীতি একরকম ধসে যায়, বেড়ে যায় রাষ্ট্রীয় ঋণ। রিকস ব্যাংক নোট ছাপিয়ে রাষ্ট্রের অর্থের ঘাটতি কমানোর উদ্যোগ নেয়। ফলে ১৯২০-এর দশকে উৎপাদনের তুলনায় জার্মানিতে মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায়। পরিণতি যা হওয়ার কথা তা-ই হয়, সমগ্র জার্মানিতে দেখা দেয় ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, এটাকে বলা যেতে পারে ছোটোখাটো একটা 'ইকোনমিক সুইসাইড'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই মুদ্রাস্ফীতি টেনে নিয়ে গেল ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত। নিউইয়র্কের জেপি মরগ্যান অ্যান্ড কোম্পানি মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধব্যয়ের একটা অংশ বহন করেছিল, কিন্তু জার্মানির বেলায় কেউ এগিয়ে আসেনি। তার ওপর জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলা হাতিয়ে নিয়েছিল বিজয়ী দেশগুলো। বিশেষ করে টাঙ্গানিকা আর দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা কুক্ষিগত করে ব্রিটেন। বাগদাদ রেলপ্রজেক্টের মাধ্যমে যে মার্কেট শুরু হয়েছিল, হাতছাড়া হয় সেটাও। **ভার্সাই চুক্তির**[২৪] ফলে জার্মানির লৌহ আকরিকের ৭৫ শতাংশ খোয়া যায়।

---

[২৪] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর বিজয়ী মিত্রশক্তি এবং জার্মানির মধ্যে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরের বছর ১০ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয় সেটি। ফ্রান্সের ভার্সাই রাজপ্রাসাদে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির খসড়া হয়েছিল ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে। খসড়ার মূল নকশা করেন ব্রিটেনের ডেভিড লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের জর্জেস ক্ল্যামেনশো, যুক্তরাষ্ট্রের উড্রো উইলসন এবং ইতালির ভিটোরিও অরল্যান্ডো। এ চুক্তির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং আফ্রিকার সবগুলো জার্মান কলোনি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য মিত্রশক্তির কুক্ষিগত হয়। শতকরা দশভাগ কমিয়ে আনা হয় জার্মানির রাষ্ট্রসীমা এবং জনসংখ্যা। জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে সংঘটিত সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য এককভাবে দায়ী করা হয় জার্মানদের।

একইভাবে জিংক আকরিকের ৬৮ শতাংশ আর কয়লার ২৬ শতাংশ দখল হারায় পরাজিত জার্মানি। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এক-পঞ্চমাংশ ট্রান্সপোর্ট ফ্লিট, এক-চতুর্থাংশ ফিশিং ফ্লিট, দেড় লাখ রেলরোড কার, পাঁচ হাজার মোটর ট্রাক বাগিয়ে নেওয়া হয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে। এতেই শেষ নয়, সর্বমোট ১৩২ বিলিয়ন গোল্ডমার্ক (৬৬০ কোটি পাউন্ড) ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়—যা ছিল তৎকালীন জার্মানির সামর্থ্যের তিনগুণ বেশি।

জার্মানি অবশ্য এরপরও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। নিজেদের স্টিল আর মেশিনারি টেকনোলজি রাশিয়ার কাছে বিক্রি করবে, এই শর্তে রাশিয়ায় তেল উন্নয়নের অনুমতি পায় দেশটি। ফলে কিছুটা হলেও নিস্তার পায় ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বেলজিয়াম ও ইতালিকে সাথে নিয়ে জার্মানির হার্টল্যান্ড হিসেবে পরিচিত রুঢ় অঞ্চল দখল করে নেয় ফ্রান্স। ব্রিটেন অবশ্য ফরাসিদের এ কাজ পছন্দ করেনি। ফ্রান্স যে জায়গা দখলে নেয়, তা লম্বায় ছিল ১০০ এবং প্রস্থে ৫০ কিলোমিটার। জার্মানির ৮০ শতাংশ কয়লা, লোহা, স্টিল উৎপাদন হতো এখানে। দেশটির ৭০ শতাংশ যানবাহন সরাসরি নির্ভর করত এর ওপর। এ সময় ব্রিটেনকে ক্ষতিপূরণ দিলেও ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে বিরত থাকে জার্মানি। তবুও তার অর্থনীতি বাজে পরিস্থিতিতেই ছিল। ডলারের বিপরীতে মার্কের চূড়ান্ত পতন হয়। সঞ্চয়ে ধস নামে, মুদ্রাস্ফীতির চাপে জনজীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন। ১৯২৩ সালের নভেম্বরে ফ্রান্সের সাথে সমঝোতা চুক্তিতে যায় জার্মানি। ফরাসি দখলে চলে যাওয়া এলাকায় জার্মান নাগরিকরা যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিল, তা বাতিল করা হয়। ১৯২৪ থেকে ৩১ সালের মধ্যে ১০ দশমিক ৫ বিলিয়ন গোল্ড মার্ক ক্ষতিপূরণ দেয় জার্মানি। একই সময়ে বাইরের দেশ থেকে তার ঋণের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন।

# তেল ব্যবসায়ীদের গোপন সমঝোতা

কয়েক দশকের তেলযুদ্ধ অবসানে মার্কিন ও ইংরেজ প্রতিনিধিরা একসাথে বৈঠকে বসে এবং শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় আসতে সক্ষম হয়। ১৯২৭ সালে হেনরি ডেটারডিং-এর একটা স্কটিশ ক্যাসেলে এই আপস-রফা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অ্যাংলো পারসিয়ান অয়েল কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করেন জন ক্যাডম্যান আর রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির পক্ষে থাকেন ওয়াল্টার টিগল। কিন্তু সমঝোতায় পৌঁছলেও তাদের কারও উদ্দেশ্য সৎ ছিল না; বরং বিশ্বব্যাপী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে একটা বিশেষ মূল্য ঠিক করতে একজোট হয়েছিল তারা। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সাতটি অ্যাংলো মার্কিন কোম্পানি—এক্সন, মবিল, গালফ ওয়েল, টেক্সাকো, স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল অব ক্যালিফোর্নিয়া (শেভরন), রয়্যাল ডাচ শেল, অ্যাংলো পারসিয়ান (ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম) ছিল এই তেল চক্রের অংশ। এদেরই একত্রে বলা হতো সেভেন সিস্টার্স।

# আমেরিকায় মহামন্দা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর গলা উঁচু করে দাঁড়ানোর যে শক্তি আমেরিকা অর্জন করেছিল, ১৯২৯ সালে শুরু হওয়া মহামন্দায় তা এক ধাক্কাতেই শেষ হয়ে যায়। সে বছরের ২৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেট হঠাৎ ক্র্যাশ করে। আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোমর ভেঙে দেয় এই মন্দা। পথে বসার উপক্রম হয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করে আসা শক্তিধর আমেরিকা।

অতি মুনাফার লোভে ব্যাংক লোন নিয়ে মার্কিন মধ্যবিত্তরা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা শুরু করল। সবাই জানে, কোনো রকম পরিশ্রম ছাড়াই সহজ লাভের ব্যাবসা এটি। শুধু শেয়ার কিনে বসে থাকো, আর দাম বেড়ে গেলে চট করে বেচে দাও। ফলে বসে বসে মোটা অঙ্ক বাগিয়ে নেওয়ার নেশায় পাগলের মতো শেয়ার কেনা শুরু করল হাজারো মার্কিন নাগরিক। ব্যাংকগুলো এই নব্য বিনিয়োগকারীদের পেছনে কাড়ি কাড়ি অর্থ ঋণ দিলো। প্রচুর বিনিয়োগ আসায় ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল শেয়ারবাজার। মানুষের পকেটে গরম গরম ডলার আসতে লাগল, লাভের একটা ভাগ গেল ব্যাংকগুলোতেও। কিন্তু দ্রুতই যে সব ওলটপালট হয়ে যাবে, বিনিয়োগকারী কিংবা ব্যাংক কারোরই তা মাথায় ছিল না; ছিল না কোনো আগাম পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা। এদিকে জার্মানি তখন একেবারেই দেউলিয়া। পুরো ইউরোপের বাজারে মন্দা। আমেরিকান পণ্যের বৃহত্তর বাজার ইউরোপে জিনিসপত্রের চাহিদা কমতে থাকল। ফলে আমেরিকায় শিল্প পণ্য উৎপাদন কমে গেল দারুণভাবে। শিল্পকারখানা আর তাদের কাঁচামাল সরবরাহকারী কৃষকদের যখন বেহাল দশা, তখন সেসব রুগ্‌ণ কোম্পানির শেয়ারের দাম হয়ে উঠল রীতিমতো আকাশচুম্বী! অর্থনীতির ভাষায় এটাকে বলে শেয়ারের অতি মূল্যায়ন। ফলে শিগগিরই বাজার ব্যালেন্স হওয়া শুরু হলো।

বিনিয়োগকারীরা তড়িঘড়ি করে তাদের কাছে থাকা এসব কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে লাগলেন। একযোগে অতি মূল্যায়নের এই বেপরোয়া শেয়ার বিক্রি বাজারে প্রচণ্ড অস্থিরতা তৈরি করল। দেখা দিলো অস্বাভাবিক দরপতন। শেষ পর্যন্ত ক্র্যাশ করল মার্কিন স্টক মার্কেট। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। আমেরিকানদের কাছে আজও সেটি কালো দিন, মার্কিন ইতিহাসের 'ব্ল্যাক থার্সডে'।

শেয়ার মার্কেটে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো বিনিয়োগকারীর আস্থা। কোম্পানিগুলোর মন্দা অবস্থার তথ্য বাইরে চলে আসায় বাজারের প্রতি মানুষের আস্থা কমছিল, ফলে অব্যাহত ধারায় চলতে থাকল দরপতন। সপ্তাহ না ঘুরতেই আরেকদফা ক্র্যাশের মুখোমুখি হলো মার্কিন স্টক মার্কেট। ২৯ অক্টোবর ১ কোটি ৬০ লাখ শেয়ার হাত বদল হলো, সংখ্যার বিচারে যা ২৪ অক্টোবরের থেকে প্রায় ৩০ লাখ বেশি। অনেক শেয়ার মূল্যহীন কাগজ হয়ে পড়ে থাকল, সব হারিয়ে পথে বসল অসংখ্য বিনিয়োগকারী। এই দিনটিকে বলা হয় 'ব্ল্যাক টুইজডে'।

ধসে পড়ার আগে আমেরিকায় শেয়ারের মূল্যের যে উর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল, তার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা ছিল না। আমেরিকায় তখন উৎপাদন কমছিল, প্রকট আকার ধারণ করছিল বেকার সমস্যা। প্রচণ্ড খরায় কমে গিয়েছিল উৎপাদন। যতটুকু উৎপাদন হচ্ছিল, তাতেও কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় শিল্প উৎপাদন কমে যায়, বন্ধ হয়ে যায় ছোটো ও মাঝারি অনেক শিল্পকারখানা। শিল্পের যখন এই হাল, তখন শেয়ারবাজারে কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল অর্থনীতির রীতিবিরুদ্ধ।

১৯২৯ সালে ঘটে যাওয়া শেয়ারবাজারের ধাক্কা সরাসরি ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে পড়ল। প্রথম ধাক্কাটা গেল ব্যাংকের ওপর দিয়ে। কেননা, তারাই প্রচুর অর্থের সংস্থান করেছিল বিনিয়োগকারীদের জন্য। অর্থনীতির এই ভয়ংকর দুর্দশায় সাধারণের হাত থেকে মুদ্রা ফসকে গেল। মুদ্রা নেই, কাজেই পণ্যদ্রব্য কেনার সামর্থ্যও নেই। যারা পণ্য বেচে খায়, সেই শিল্প মালিকরা একরকম বাধ্য হয়েই ফ্যাক্টরিগুলো লে-অফ ঘোষণা করলেন। শুরু হলো নির্বিচারে কর্মী ছাঁটাই। যেহেতু এদের অনেকেই ঋণ নিয়ে শিল্পকারখানা গড়েছিলেন; এ দফায় নিজেরা যেমন ডুবলেন, ঋণদাতাদেরও ডোবালেন শোচনীয়ভাবে। তারপরও কোনো কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যয় কমানোর পলিসি নিয়ে টিকে

থাকার চেষ্টা করল, কর্মীদের বেতন বেঁধে দিল অর্ধেক বা তারও কম। এর ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হলো কেবল।

মহামন্দার সময় আমেরিকানদের ধারকর্জ করে জীবন নির্বাহ করতে হয়েছে। ব্যাংকের লোনের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে অনেকে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ২৫ শতাংশ মানুষ বেকার আর ১ কোটি ৩০ লাখ লোক একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও বেতন মিলল না শিকাগোর শিক্ষকদের। শহরগুলোতে না খেয়ে মানুষ মরতে লাগল। লুটপাট শুরু হলো খাবারের জাহাজে। হোয়াইট হাউজ অভিমুখে মিছিল নামল। এ অবস্থায় একটি দেশ সুপার পাওয়ার হওয়ার পরিস্থিতিতে থাকার কথা না, কিন্তু বিস্ময়করভাবে আমেরিকার ভাগ্যাকাশে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হলেন রুজভেল্ট। ক্ষমতায় এসে অল্প কিছু সংস্কার এনেই পরিস্থিতি আমূল বদলে দিলেন তিনি। এরপর যুক্তরাষ্ট্রকে এক ধাক্কায় ওপরে তুলে দিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের পর ইউরোপের চারভাগের একভাগ শিল্প কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেলেও যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় স্পর্শই করতে পারেনি সে ক্ষতি। যুদ্ধে ১৮ জার্মান ও ৫৮ রাশিয়ান সেনার বিপরীতে আমেরিকার সৈন্য মারা যায় মোটে একজন করে।

# ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা ও ডলারের উত্থান

ভার্সাই সম্মেলনের পর দেখা গেল, বিশ্বের এক চতুর্থাংশ এলাকাই ব্রিটিশদের কবজায়। এজন্যই একসময় বলা হতো—ব্রিটিশদের সূর্য কখনো অস্ত যায় না। তার এক কলোনিতে যখন সূর্য ডুবছে, আরেক কলোনিতে হয়তো প্রভাতের অরুণ আলো। কারণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই তখন ব্রিটিশ উপনিবেশের একচ্ছত্র আধিপত্য। অবশ্য এর ৩০ বছরের মাথায় ইংরেজ সাম্রাজ্য মচকাতে শুরু করল, তাসের ঘরের মতো একে একে ভেঙে পড়ল সবগুলো কলোনি। ভারতবর্ষ ছাড়তে হলো, হাতছাড়া হয়ে গেল প্যালেস্টাইন।

অনেকেই মনে করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তছনছ হয়েছে বিদ্রোহ কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট তারা সামলে উঠতে পারছিল না। এ অবস্থায় কলোনি ছেড়ে আসাই ছিল এক ও অবিকল্প পথ। কারণ, যা লুটে নেওয়ার, আগেই তা নেওয়া হয়েছে। এরপর ভারতে থাকা মানে কেবলই খরচার খাতা দীর্ঘ করা। ফলে অল্প কিছুকালের মধ্যেই ইংরেজদের পৃথিবী ছোটো হয়ে এলো। কলোনি গুটিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে সম্মান ও সুবিধাজনক উপায় খুঁজতে ভারতবর্ষে এলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। তার আগমনের পাঁচ মাসের মাথায় গোটা ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত—দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহাসাগর, আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর এলাকা থেকেও কলোনি উঠিয়ে নেয় ইংরেজরা। এর পেছনে রাজনৈতিক সমীকরণ থাকলেও মূল কারণটা ছিল অর্থনৈতিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ঋণ চূড়ায় পৌঁছায়। রপ্তানি নেমে আসে ৩১ শতাংশে। কাজেই টিকে থাকার জন্য মার্কিন নির্ভরতা ছিল অত্যন্ত জরুরি। অবশ্য আমেরিকাও বিনা প্রতিদানে ব্রিটিশদের উপকার করতে এগিয়ে আসেনি। পারস্পরিক স্বার্থেই সহযোগিতার সম্পর্কে

একজোট হয়েছিল তারা। এরই ধারাবাহিকতায় ইউরোপ-আমেরিকায় চালু হলো গোল্ড এক্সচেঞ্জ সিস্টেম। বলা হলো—'ব্রিটন উডস সিস্টেম'-এর সাথে একমত প্রতিটি দেশ ডলার রেইটে সোনা জমা রাখবেন (১ আউন্স= ৩৫ ডলার করে) মার্কিন ব্যাংকে। কথামতো বিপুল পরিমাণ সোনা জমতে থাকল নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভে, সেইসঙ্গে ছাপানো হলো সমপরিমাণ মূল্যের কাগুজে মুদ্রা। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাউন্ডকে ছাড়িয়ে ডলার হয়ে উঠল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চতুর কূটনীতির ফলে সৌদি বাদশাহ আবদুল আজিজ ১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তেল নিয়ে একটি চুক্তিতে সম্মত হন। সম্ভাবনার আরেক দুয়ার খুলে যায় এর মধ্য দিয়ে। সৌদির তেল ব্যবহার হতে থাকে মার্কিনিদের স্বার্থে। এই প্রথম ১০ হাজার মাইল দূরের সৌদি আরবের ভাগ্যের সাথে জড়ায় মার্কিন নিরাপত্তা বিভাগ। তারও কয়েক বছর বাদে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো, পৃথিবী দেখল ব্রিটিশদের কাছাকাছি পর্যায়ে পৌছে গেছে মার্কিন তেলশিল্প। আর তার প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ভেনিজুয়েলা ও মধ্যপ্রাচ্য। ১৯৪৭ সালের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপের অর্ধেক তেল সাপ্লাই দেয় এখনকার শেভরন, মবিলসহ পাঁচ মার্কিন তেল কোম্পানি। তখন এদের নাম ছিল Standard Oil of New Jersey (Exxon), Socony-Vacuum Oil (Mobil), Standard Oil of California (Chevron), Texaco, and Gulf Oil. বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে তেলের ব্যবহার আরও বাড়ল। হরদম তেল বেচে কদিনেই বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠল কোম্পানিগুলো। সড়কে এলো অটোমোবাইল। আমেরিকায় মহাসড়ক বানানোর ধুম পড়ে গেল। তেলের চাহিদাও বেড়ে চলল সমান গতিতে।

# তেল দখলে ইরানে ইংরেজ হানা

যুদ্ধ শেষে ব্রিটেন যখন তার সাম্রাজ্য হারাতে চলেছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে হারানো এলাকাগুলোর তেল নিয়ন্ত্রণের কম চেষ্টা করেনি তারা। কিন্তু বিপত্তি শুরু হলো ইরানকে নিয়ে। ইরান শিয়াপ্রধান রাষ্ট্র। বিশ্বের সুন্নি রাষ্ট্রগুলোতে শিয়া মতবাদ রপ্তানি করার একধরনের মিশন আছে ১৯৭৯ সালের বিপ্লবপরবর্তী সরকারের মধ্যে। তারও আগে থেকে ব্রিটিশদের সাথে দীর্ঘ সখ্যতার ইতিহাস আছে ইরানের। তেলের ব্যাবসা হাতে রাখতে একসময় ইরানে ক্ষমতায় আনা হয়েছিল পাহলভি পরিবারকে। রেজা শাহ এবং মুহাম্মাদ রেজা শাহ—এই দুই পিতা-পুত্রের মধ্যেই সীমিত ছিল পাহলভিদের শাসনকাল। প্রথমে বাবাকে ক্ষমতায় বসানো হয়, পরে বাড়তি সুবিধার আশায় সাম্রাজ্যবাদীরা বাবাকে সরিয়ে বসায় ছেলেকে।

পাহলভিদের আগে ইরান শাসন করেছে কাজার রাজবংশ, তারও আগে সাফাভিদরা। সাফাভিদ বংশের প্রথম শাহ প্রথম ইসমাইল শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে কাজাররা এসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয় ওলামাদের। কাজার রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল ধারাবাহিক বিক্ষোভ আর সশস্ত্র বিপ্লবের কারণে। ১৯০৬ সালে কাজারদের বিরুদ্ধে জনতার সশস্ত্র বিপ্লব রাষ্ট্রকে গণমুখী হতে বাধ্য করে। সর্বসাধারণের দাবি মেনে নিয়ে প্রণীত হয় সংবিধান, সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ বিধান যুক্ত হয় তাতে। প্রতিষ্ঠিত হয় আইনসভা। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামই বহাল থাকে। কিন্তু বিপ্লবের যে মূল লক্ষ্য, সেই রাজতন্ত্রে উৎখাত সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশরাই সেটা হতে দেয়নি তখন। ইরানের এলিট গোষ্ঠী আর ওলামা সমাজকে কৌশলে বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছিল তারা, কিন্তু কেন?

কারণ, জনগণের হাতে ক্ষমতা গেলে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য হারাত ব্রিটেন। অবশ্য কাজারদের দিয়েও যখন সম্পূর্ণ স্বার্থ হাসিল হচ্ছিল না, রেজা খানকে সামনে এনে কাজার রাজতন্ত্র উৎখাত করে ফেলাই ছিল ইংরেজদের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক কৌশল। ফলে পারস্যের খনিগুলো থেকে অবাধে তেল উত্তোলনের শর্তে রেজা খানকে ক্ষমতায় বসায় তারা।

নতুন শাহ রেজা খান মসনদে বসেই পারস্যকে বদলাতে শুরু করলেন। ইসলামি রাষ্ট্র থেকে সরে গেল দেশটি। পশ্চিমাদের অনুকরণে ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে মনোযোগ দিলেন রেজা খান। হয়তো এ কারণেই রেজা খানকে অনেকে দেখেন ইরানের আতাতুর্ক হিসেবে।

১৯৩৫ সালে অতীতের পারস্য দেশের নতুন নাম হয় ইরান। অ্যাংলো পারসিয়ান অয়েল কোম্পানির নামও বদলে যায়। নতুন নাম হয় 'অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি'। ব্রিটিশ ট্রেজারিতে বছরে ২৪ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি ট্যাক্স পাঠাত এই কোম্পানি। ৯২ মিলিয়ন যেত ফরেন এক্সচেঞ্জ হিসেবে। কোম্পানিটি কেবল ইরানেই ব্যাবসা করেনি, পৃথিবীর আরও বেশ কয়েকটি তেলসমৃদ্ধ দেশে বিস্তৃত ছিল তার তেল বাণিজ্য, যদিও মোট আয়ের ৭৫ ভাগই আসত ইরান থেকে। কুয়েত অয়েলের ৫০ শতাংশ শেয়ার ছিল এই কোম্পানির হাতে। এ ছাড়া তার দখলে ছিল ইরাকের ২৩%, কাতারের ২৩%, অ্যাংলো ইজিপ্টিয়ানের ৩৪% এবং ইজরাইলভিত্তিক রিফানারিজ লিমিটেড-এর ৫৫ শতাংশ পেট্রোলিয়াম।

ইরানের বাইরে ব্রিটেন-অস্ট্রেলিয়াতেও রিফাইনারি বানায় 'অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি'। এরপর তারা তেল খুঁজতে থাকল ত্রিনিদাদ, সিসিলি, পাপুয়া নিউগিনি এবং নাইজেরিয়াতে। আবাদান ছাড়াও ইরানের কেরমান শহরে তাদের ছোটো একটি রিফাইনারি ছিল। রয়েল নেভি ও এশিয়ার রয়েল অ্যায়ারফোর্সের ৮৫ শতাংশ জ্বালানি যেত সেখান থেকে। তিন শতাধিক সমুদ্রগামী ট্যাংকার তাদের প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত ছিল সব সময়। ইংরেজ ছাড়াও পাকিস্তান, ভারত, ফিলিস্তিনের লোকজন আবাদান প্রজেক্টে কাজ করত। ১৯৪০-এর দশকে ইরানের পত্রিকাগুলো লিখতে থাকে, অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি ইরানকে ঠকাচ্ছে। তারা ইরানকে দেয় ১০৫ মিলিয়ন রয়্যালটি আর ব্রিটিশ সরকারকে ট্যাক্স দেয় ১৭০ মিলিয়ন। আর ডিভিডেন্ড

হিসেবে ১১৫ মিলিয়ন দেয় ব্রিটিশ শেয়ার হোল্ডারদের। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, ততদিনে কোম্পানিটি ইরানের বাইরে ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করে ফেলেছে। অথচ আবাদানে ইরানিদের নিয়োগ দেওয়া হতো কম। স্টাফদের বেশিরভাগই ছিল ইউরোপীয়। ক্ষুব্ধ ইরানিরা রেজা শাহকে দেখত ইংরেজদের স্পাই হিসেবে। কারণ, ১৯২০-এর দশকে যে অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন, ব্রিটিশ মিলিটারি অফিসারদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তাতে।

ইরানকে যতটা পালটে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রেজা শাহ দিয়েছিলেন, তার সিকি ভাগও তিনি করে দেখাতে পারেননি। তার উদ্ধত স্বভাব, স্বৈরাচারী শাসন আর ধর্মনিরপেক্ষ পলিসি জনগণ ও প্রভাবশালী ওলামা সমাজকে ক্ষেপিয়ে তোলে। ব্রিটেন ও রাশিয়ার চাপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই সিংহাসন ছাড়তে হয় রেজা শাহকে। ইরানের নতুন সম্রাট হন মুহাম্মাদ রেজা শাহ।

ইরানের সাথে দিনদিন অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির দূরত্ব বাড়ছিল। ১৯৪৭ সালের পর অ্যাংলো ইরানিয়ান কোম্পানির কাছে আরও বেশি শেয়ার দাবি করে ইরান। উদাহরণ হিসেবে ভেনিজুয়েলার প্রসঙ্গ সামনে আনা হয়। যেখানে রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি তেল উত্তোলন করছে ৫০-৫০ হারে। ইরান সরকার হিসাব কষে দেখায়—১৯৪৮ সালে ২৩ মিলিয়ন টন তেল উত্তোলন করে ৩২ কোটি ডলার আয় করে অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি; যেখানে ইরান রয়্যালটি বাবত পায় মাত্র ৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তেল সম্পদ লুটের অভিযোগ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ইরানের তেলবিষয়ক সংসদীয় কমিটির প্রধান হন জাতীয়তাবাদী নেতা মুহাম্মাদ মোসাদ্দেক। এই রাজনীতিবিদ ৫০-৫০ অনুপাতে মালিকানা দাবি করার পাশাপাশি চেয়েছিলেন কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনাতেও সরকারের কিছু লোক থাকুক। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি ব্রিটেন। এরপর মোসাদ্দেক ইরানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তেলশিল্প জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির নাম হয়ে যায় 'ন্যাশনাল ইরানিয়ান ওয়েল কোম্পানি'। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো তেল শোধনাগার—আবাদান অয়েল রিফাইনারি কোম্পানিতে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারি মালিকানা।
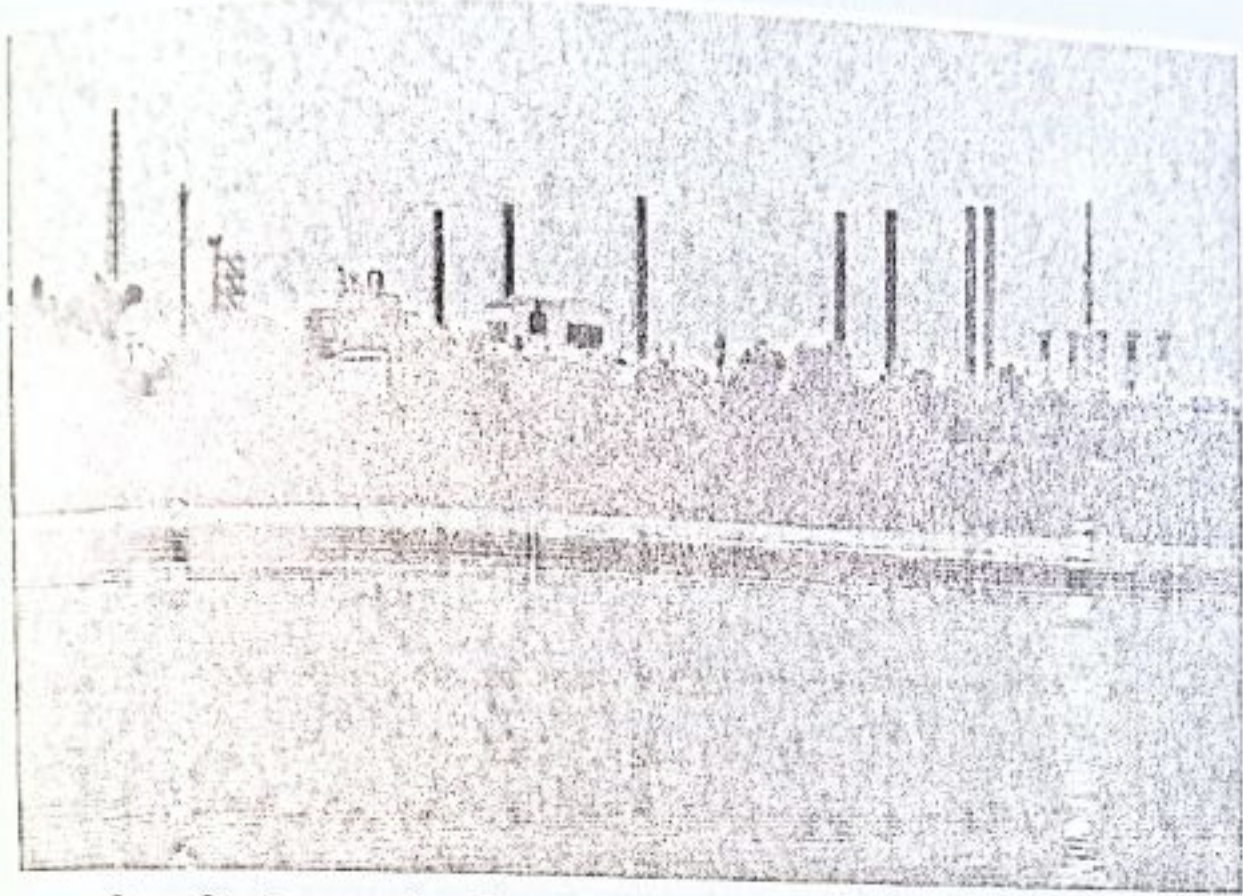
দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো তেল শোধনাগার। ছবি : *রয়টার্স*

এতদিন ধরে বিশাল তেলের ভান্ডার যারা নিয়ন্ত্রণ করত, ইরানের তেলে তাজা হচ্ছিল যাদের অর্থনীতি, মোসাদ্দেকের সিদ্ধান্ত তাদের ভালো না লাগাই স্বাভাবিক। সে সময় বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো এই রিফাইনারির ৫৩ শতাংশ শেয়ারই ছিল ব্রিটিশ সরকারের হাতে। ইংরেজরা চটে গেল। ইরানের বাইরে তেল সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো। বাজেয়াপ্ত করা হলো ব্রিটিশ ব্যাংকগুলোতে থাকা ইরানের সকল সম্পদ। ইরানের উপকূলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এলো, আবাদানের নিকটে ইরাকের বসরায় পাঠানো হলো পদাতিক সেনা ও বিমান বাহিনী। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত হলো মোসাদ্দেক সরকার।

# ইরানের মোসাদ্দেককে সরানোর চক্রান্ত

৭০ বছরের বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে প্রথমে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেয় নতুন সরকার। শেষমেশ বয়স বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয় তাকে। বাস্তবে অবশ্য আমৃত্যু সাজা ভোগ করেছেন মোসাদ্দেক। মৃত্যুর আগ পর্যন্তই তিনি গৃহবন্দি ছিলেন।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লব নিঃসন্দেহে আধুনিক ইরানের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এর মধ্য দিয়েই ইরান এক ব্যতিক্রমী শাসনব্যবস্থায় ঢুকে যায়। চিরায়ত সামরিক বাহিনীর বাইরে অনেকটা চীনা কমিউনিস্ট শাসনের কায়দায় গড়ে তোলা হয় বিপ্লবী গার্ড। অবশ্য সুন্নিদের দিক থেকে ৭৯-এর বিপ্লবের আলাদা ব্যাখ্যা আছে। অনেক সুন্নি বিশ্লেষকই মনে করেন—এর মাধ্যমে শিয়াবাদের পুনরুত্থান হয়েছে, ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিয়াবাদ।

ইসলামি খিলাফত ঘিরে শিয়া-সুন্নির যে বিভেদ, শুরুর দিকে সেটি ছিল কেবলই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান; ক্ষমতায় থাকা না থাকার মামলা। যারা শিয়া-আলির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা মুয়াবিয়া (রা.)-এর পরিবর্তে ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর শাসন চেয়েছিল। না সাহাবিদের নিয়ে তাদের আলাদা কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, না ইসলাম নিয়ে। তবে কারবালার নির্মম ঘটনা শিয়াবাদের একটা ধর্মতাত্ত্বিক বয়ান দাঁড় করিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর খিলাফতকে অস্বীকার করতে শুরু করে শিয়াদের অনেকে।

৭৯ সালের বিপ্লবী মডেল আশপাশের দেশগুলোতে রপ্তানি করতে চেয়েছিলেন ইমাম খোমেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হন। আবার কোথাও কোথাও বেশ কড়া প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে। যেমন : সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং ইরাক।

পাকিস্তানে শিয়াবাদের রাজনৈতিক পতন হয়েছে জেনারেল জিয়াউল হকের হাতে। শিয়া অনুসারী পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে ছিলেন জিয়া। অন্যদিকে ইরাকের বাথ আন্দোলনে শিয়া নেতাদের একটা অংশের অংশগ্রহণ ছিল। ধীরে ধীরে তাদের মাইনাস করে ইরাককে কার্যত একটা সংখ্যালঘু শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। স্বাধীনতার পর থেকে সাদ্দামের পতন পর্যন্ত শিয়াপ্রধান ইরাক এই সুন্নি শাসন হজম করেছে। একই ঘটনা ঘটেছে বাহরাইনেও। তবে তার বিপরীত চিত্র দেখা গেছে সিরিয়াতে। দীর্ঘকাল ধরে শিয়া আলাভি পরিবারের শাসনে আছে এই সুন্নি দেশটি। অথচ এই আলাভিদের মুসলিমই মনে করা হতো না একসময়। তবুও ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নেতা খোমেনি ইসলামপন্থি নিপীড়িত ব্রাদারহুডের পরিবর্তে সমর্থন দিয়ে গেছেন সেক্যুলার হাফেজ আল আসাদ ও তার উত্তরসূরি বাশার আল আসাদকে। এজন্য সুন্নি আরব শাসক ও ধর্মীয় নেতাদের দাবি—সিরিয়াতে ইসলাম নয়; বরং রাজনৈতিক শিয়াবাদের চর্চা করেছে ইরান। সার্বিক দিক বিবেচনায় এ ধারণাকে অমূলক ভাবার সুযোগ নেই।

বিপ্লব পরবর্তী ইরানে পাহলভি রাজশাসনের কবর রচিত হয়। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে দীর্ঘদিনের সেক্যুলার ইরান চলে আসে শিয়া ধর্মীয় নেতাদের হাতের মুঠোয়। তারও আগে পঞ্চাশের দশকে ইরানের ক্ষমতা কাঠামোতে থাবা মেরেছিল বিদেশিরা। সেই হস্তক্ষেপ দেশটির ভবিষ্যৎ গতিপথ আমূল বদলে দিয়েছিল প্রায়। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জাতীয়তাবাদী নেতা মুহাম্মাদ মোসাদ্দেককে। ১৯৫৩ সালের সেই অভ্যুত্থানের পেছনে ছিল মূলত ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা এমআইসিক্স (এসআইএস)। যদিও সামনে থেকে সেই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করেছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। সরকারি যে ডিক্রিতে মোসাদ্দেককে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সেটাও লিখে দিয়েছিল সিআইএ-এর এক এজেন্ট!

# সিআইএ-র ব্লু-প্রিন্টে ইরানে ক্ষমতার পালাবদল

১০ জুন, ১৯৫৩

বৈরুতে বৈঠকে বসেছেন সিআইএ-এর একদল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কেউ এসেছেন নিকোশিয়া থেকে, কেউ দামেশক, কেউ-বা আবার কায়রো থেকে। বৈঠকে যোগ দিয়েছেন সিআইএ-এর তেহরান স্টেশনের প্রধান রজার গৈরানও। একটি খসড়া পরিকল্পনা রাখা হয়েছে আলোচনার টেবিলে। মোসাদ্দেককে সরানোর এই খসড়া তৈরি করেছে ড. ডনাল্ড এন উইলবার-এর নেতৃত্বে কয়েকজন চৌকস সিআইএ কর্মকর্তা। সাইপ্রাসের নিকোশিয়াতে এক মাস সময় নিয়ে করা খসড়া পরিকল্পনার একটি কপি সিআইএ সদর দপ্তরে এরই মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উইলবার এই 'অপারেশন এজাক্স'-এর অন্যতম সংগঠক ও বাস্তবায়নকারী। এই অপারেশনেই মূলত মোসাদ্দেক সরকারের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

বৈরুতে চার দিন ধরে খসড়া পরিকল্পনা পরীক্ষা করা হয়। চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয় ইরানের রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা আর জনগণ নিয়ে। কারা শাহ-এর সমর্থক, কারা মোসাদ্দেকের, কারা পরিবর্তনকে স্বাগত জানাবে, কারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে—এসব নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়। শেষদিন উপসংহারে আসে সিআইএ। যেকোনো গণপ্রতিক্রিয়া পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। তবে যদি মোসাদ্দেককে কোনোভাবে দৃশ্যের বাইরে সরিয়ে দেওয়া যায়, তার সমর্থকরা হয়তো সে রকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর সাহস করবে না। করলেও সেই প্রতিক্রিয়া হবে দুর্বল এবং সহজেই নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

মোটামুটি এভাবেই বৈরুত আলোচনা শেষ হলো। ইরানের মতো দেশে একটি সরকারকে হটিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আর সেটা যদি হয় মোসাদ্দেক

প্রশাসনের মতো জনপ্রিয় সরকার, তাহলে চ্যালেঞ্জ বহুগুণে বেশি। ফলে লন্ডনসহ আরও কয়েকটি শহরে ধারাবাহিকভাবে বৈঠক চলল আরও কিছুদিন। সিআই-এর নিকট প্রাচ্য বিভাগের প্রধান তখন কারমিত রুজভেল্ট। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার আর সিআই-এ পরিচালক এলেন ডালাস তাদের বহুদিনের পরীক্ষিত এজেন্ট কারমিতকেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেন। অভিযান অনুমোদনের পাশাপাশি ১০ লাখ ডলার অনুমোদন করা হয় ইরানি জেনারেল ফজলুল্লাহ জাহেদির সমর্থনে। রেজা শাহ-এর অনুগত আর্মি অফিসার জাহেদি একসময় মোসাদ্দেক-এর মন্ত্রিসভাতেও ছিলেন। তাকে সামনে রেখেই অভ্যুত্থানের ছক কষা হলো। পরিকল্পনা হলো, অভ্যুত্থান শেষে মোসাদ্দেক-এর চেয়ারেই বসবেন জাহেদি।

অপারেশন এজাক্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন রশিদিয়ান পরিবারের তিন ভাই—সাইফুল্লাহ, আসাদুল্লাহ আর গদরাতুল্লাহ। পাহলভি পরিবারসহ ইরানের এলিট পরিবারগুলোতে অবাধ যাতায়াত ছিল তাদের। তিন ভাইয়ের মধ্যে আসাদুল্লাহ-ই প্রথম শাহ ও তার বোনকে মোসাদ্দেকবিরোধী ক্যুতে অংশ নেওয়ার প্ররোচনা দেন। স্থানীয় বণিকদের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল শেষজনের। কাজেই তাকে কাজে লাগানো হয় হাট-বাজারে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে। ইরানের ধর্মীয় নেতা, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, রাস্তার মাস্তান, পাড়ার টোকাই আর আর্মি অফিসারদের ঘুষ দিতে তিন ভাইকে সিআইএ প্রতি মাসে দিত ১০ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড।

আগস্ট মাসে মাত্র চার দিনের ব্যবধানে দুটি অভ্যুত্থান হয়। প্রথমটি ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়টিতে ক্ষমতাচ্যুত হন প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক। ভিন্ন মতাবলম্বীদের দিয়ে বার্তা পাঠিয়ে রাজকীয় বাহিনীর অফিসারদের হাত করতে থাকে সিআইএ। দুর্বলচিত্তের শাহ মুহাম্মাদ রেজা পাহলভিকে সাহস জোগাতে তার কাছেও পাঠানো হয় বিস্তর জনশক্তি। শুরু হয় হিটলারি কৌশল। ভাড়াটে ইরানিদের দিয়ে বোমা হামলা করিয়ে তা কমিউনিস্ট পার্টির নামে চালিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি পত্রপত্রিকায় ক্রমাগতভাবে মোসাদ্দেকবিরোধী লেখা ও কার্টুন প্রচার হতে থাকে। কার্টুনগুলো আঁকত সিআইএ-এর আর্ট শাখা। আর এসব ছাপা হতো সরকারবিরোধী পত্রিকাগুলোতে। এভাবে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে মোসাদ্দেক বিরোধী কার্টুনে ছেয়ে যায় তেহরানের দেয়ালগুলো।

মূলত ইংরেজ গোয়েন্দাদের আগ্রহেই অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় যুক্ত হয় সিআইএ। ব্রিটেন ও ইরানের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে তখন আমেরিকার কোনো মাথাব্যথাই

ছিল না, কিন্তু আমেরিকাকে বোঝানো হয়েছে মোসাদ্দেক তার দেশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট ব্লকে ভেড়াতে পারেন। ব্রিটেনের এই প্রোপাগান্ডা টনিকের মতো কাজ করেছিল। কারণ, বিশ্বের যেকোনো এলাকায় সমাজতান্ত্রিক আগ্রাসন প্রতিহত করতে আমেরিকা ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

১৯৫৩ সালের মার্চে সিআইএ-এর তেহরান দফতর জানায়, একজন ইরানি জেনারেল সেনাবাহিনীর একটি অংশকে সাথে নিয়ে অভ্যুত্থানে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন। তার নাম ফজলুল্লাহ জাহেদি। সিআইএ-এর পরিকল্পনা ছিল—অভ্যুত্থানের অগ্রভাগে থাকবেন জেনারেল জাহেদি, তবে নেতৃত্বদাতা হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হবে শাহ মুহাম্মাদ রেজা পাহলভিকে। পরিকল্পনার আওতার শুরুতেই কিনে ফেলা হবে সশস্ত্র বাহিনী এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল গণমাধ্যম। ফলে প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক-এর ওপর অনাস্থা জানাবে সেনাবাহিনী। পত্রিকা লিখবে—'মোসাদ্দেক ইরানের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে রুশ কমিউনিস্টদের সাথে।' একদল লোক ভাড়া করা হবে তেহরান ও তার আশপাশের বস্তি থেকে। তাদের কাজ হবে তেহরানের সড়কে নেমে সরকারবিরোধী মিছিল, স্লোগান ও উসকানিতে গোটা আন্দোলন তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া।

নিকোশিয়াতে বসে সিআইএ যখন এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত ছক আঁকছে, তখনও রেজা পাহলভিকে নিয়েই বেশি ভাবছে আমেরিকা। শেষ পর্যন্ত তিনি কি পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন? এত বড়ো একটি অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যথেষ্ট সাহস কি তার আছে? রেজা পাহলভিকে মোটিভেশন দিতে ফ্রান্স থেকে উড়িয়ে আনা হয় তার বোন রাজকুমারী আশরাফকে। জুনের শুরুতে বৈরুত বৈঠকে হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর দশচক্রে যোগ দেন সিআইএ-এর মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা বিভাগের প্রধান কারমিত রুজভেল্ট। সিআইয়ের তেহরান মিশনের প্রধান করা হয় তাকে।

পরিকল্পনা প্রস্তুত, এবার শুধু বাস্তবায়নের পালা। শুরুতেই কিছু ভাড়াটে লোকদের কমিউনিস্ট সাজিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মীয় নেতাদের অনবরত হুমকি-ধমকি ও গালাগাল দিতে থাকে তারা। 'সাজানো কমিউনিস্টরা' বলতে থাকে—'মোল্লারা প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের বিরোধিতা করলে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।' এরপর শুরু হয় মসজিদ ও ধর্মীয় নেতাদের বাড়িতে আকস্মিক হামলা। হামলা যারাই করুক, ধর্মীয় নেতা ও সাধারণ মানুষের ক্ষোভ গিয়ে পড়ল

কমিউনিস্ট আর মোসাদ্দেক সরকারের ওপর। ১৫ আগস্ট রাতে প্রথম দফায় অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয় অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যেই কেউ একজন। ফলে খুব দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অফিস, বাসা, সরকারি ভবনগুলোতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। ক্ষমতাকে আরও দৃঢ় করতে সংসদ ভেঙে দিয়ে গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক।

অভ্যুত্থান পরিকল্পনা জেনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোসাদ্দেক নিজের প্রতিনিধিকে রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর ব্যারাকে পাঠিয়ে দেন। শাহের সমর্থনপুষ্ট সৈনিকরা প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর এক ডেপুটিকে গ্রেফতার করে। এরপর একে একে শাহ গ্রুপের হাতে গ্রেফতার হতে থাকে বেশ কজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা। তবে মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করতে গেলে উলটো সরকারি বাহিনী দ্বারা আটক হয় শাহপন্থি রাজকীয় বাহিনীর সৈনিকরা। সেনা সদর দপ্তরে কামানসহ সরকারি সৈন্যদের উপস্থিতি দেখে পালিয়ে যান জেনারেল ফজলুল্লাহ জাহেদি। পরদিন তেহরান রেডিওতে ঘোষণা দেওয়া হয়—সরকারের বিরুদ্ধে চালানো একটি অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে।

জেনারেল জাহেদি উত্তর তেহরানের এক বাসায় গা ঢাকা দেন। কারমিত রুজভেল্ট মার্কিন দূতাবাস থেকে বের হয়ে খুঁজে বের করেন তাকে। তখনও জাহেদির বিশ্বাস ছিল, অভ্যুত্থানকে পুনরায় সাজিয়ে সফল করা সম্ভব। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী সিআইএ-এর তেহরান স্টেশন থেকে নিউইয়র্কে অবস্থিত প্রভাবশালী গণমাধ্যম দ্যা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) অফিসে একটি বার্তা পাঠানো হয়। ওই বার্তায় সিআইএ দাবি করে—শাহের কাছ থেকে পাওয়া দুটি রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী, সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারীরা প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে সরিয়ে দিয়েছে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জেনারেল জাহেদি। একই গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় সমগ্র তেহরানেও।

অদ্ভুত হলেও সত্য, অভ্যুত্থানের ভয়ে আগে থেকেই ভীত থাকা শাহ তেহরান থেকে পালিয়ে বাগদাদে চলে যান। পুরো পরিকল্পনার তথাকথিত মূল 'নায়কের' এমন পলায়ন সিআই-এর কাছে ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীদের আশা ছিল, শাহ পাহলভি তেহরান থেকে রেডিওতে ঘোষণা দেবেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে মোসাদ্দেককে সরিয়ে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। অবশেষে ১৭ আগস্ট সকালে পাহলভি বাগদাদ থেকে সেই ঘোষণাটি দেন এবং এ বিষয়ে রাজকীয় ফরমান জারির কথা জানান। এরপর জেনারেল জাহেদি মার্কিন দূতাবাসে সিআইএ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে পরদিন মোসাদ্দেকের ওপর কীভাবে আক্রমণ করা যায়, তার নতুন ছক আঁকেন।

পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তেহরান থেকে জিহাদের ডাক দেওয়া হবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। কিন্তু আবারও গন্ডগোল বাধান দুর্বলচিত্তের শাহ। সিআইএ-কে আরও জটিলতার মধ্যে ফেলে দিয়ে বাগদাদ ছেড়ে রোমে পালিয়ে যান তিনি। অবশ্য প্রথম দফায় ব্যর্থ হলেও চার দিনের মাথায় পরের অভ্যুত্থান সফল হয়। কারমিত রুজভেল্ট নামের যে ব্যক্তি সে সময় তেহরানে সিআইএ-এর প্রধান এজেন্ট হয়ে এসেছিলেন, তিনি বিবিসিকে বলেন—

> 'নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কারণে আমরাই সেই আদেশপত্রটি লিখে দিয়েছিলাম। আমার একজন লোক ছিল যে নিখুঁত ফারসি জানত। আমরাই সেই ঘোষণাটি লিখেছিলাম, তারপর সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম শাহের কাছে।'

যুক্তরাষ্ট্র চাইছিল, তেলসমৃদ্ধ দেশটির সর্বময় নিয়ন্ত্রণ যেন পশ্চিমা সমর্থক রেজা শাহের হাতেই থাকে। সেজন্য পরিকল্পনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে সরিয়ে তার জায়গায় বসানো হবে শাহের অনুগত জেনারেল ফজলুল্লাহ জাহেদিকে। কিন্তু একটা আশঙ্কা গোড়া থেকেই ছিল। জেনারেল জাহেদিকে যদি মোসাদ্দেক সরকার আগেই গ্রেফতার করে ফেলে, তাহলে ভেস্তে যাবে সবকিছু। সেটা যাতে না হয়, সেজন্য সিআইএ এজেন্ট রুজভেল্ট নিজেই জাহেদির অ্যাপার্টমেন্টে চলে যান। তাকে কম্বলে জড়িয়ে নিজের গাড়িতে করে নিয়ে যান অপর এক এজেন্টের বাড়িতে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের বাড়ি ও অফিস আক্রমণ করতে লেলিয়ে দেওয়া হয় শাহের অনুগত সেনাদের। বাজার এলাকা থেকে একদল লোক ভাড়া করে বানানো হয় 'বিক্ষুব্ধ জনতা'। বিবিসির সাক্ষাতকারে কারমিত রুজভেল্ট এ বিষয়ে বলেন—

> 'আমরা আমাদের প্রধান এজেন্টদের কিছু অর্থ দিয়েছিলাম। তারা বলেছিল—খুব বেশি লাগবে না; কিছু অর্থ পেলেই লোকেরা খুশি হয়ে যাবে। আমরা তাদের ৭০ হাজার ডলার দিলাম। সব মিলিয়ে আমাদের খরচ হয়েছিল এটুকুই। আমার জানামতে এ অর্থ দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লোককে। এদের মধ্যে যারা মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারাও ছিল।'

ইরানের শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোসাদ্দেকের জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদের কারণে রক্ষণশীল সমাজের সাথে তার দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়।

সিআইএ বুঝতে পারে, ইরানের শাহ এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উসকে দিয়ে সহজেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে তেহরান আসেন মোসাদ্দেকের নাতি হেদায়েত মতিন দফতরি। বয়স কম, পড়াশোনার পাট চুকেনি তখনও। নেহায়েত ছুটি কাটাতে এলেও কাকতালীয়ভাবে একটি অভ্যুত্থানের সাক্ষী হয়েছিলেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে দফতরি বলেন—

> ‘সেদিন দুপুর পর্যন্ত পরিস্থিতি ছিল একেবারেই স্বাভাবিক। তারপর হঠাৎ করেই আমরা লোকজনের গোলমাল ও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। দাদুবাড়ির খুব কাছেই থাকতাম আমরা। যখন বুঝতে পারলাম ওই বাড়িটা ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে, আমার এক সম্পর্কীয় ভাই প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ভেতরে গেল। সেখান থেকে দাদি ও তার কয়েকজন কাজের লোককে বের করে সে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলো। এরপর আমরা ওই ভবনটিতে আর ঢুকতে পারিনি। চারদিকে যত রাস্তা বা গলি ছিল, সব দিক থেকে বাড়িটা ঘিরে ফেলা হলো। ট্যাংক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালানো হলো আমার দাদুর ওপর। বাড়ির ভেতরে ট্যাংক ঢুকে পড়ল, পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হলো ছাদ। একপর্যায়ে মোসাদ্দেক ঠিক করলেন, এখানে কোনো রক্তপাত হতে দেওয়া ঠিক হবে না। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় একজন মানুষ। ঠিক করলেন, তিনি সাদা পতাকা হাতে বেরিয়ে আসবেন—যাতে তাকে রক্ষার দায়িত্বে থাকা সৈন্য ও কর্মকর্তারা প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু কিছু লোকের প্রাণনাশ এড়ানো যায়নি। আমার দাদুর একজন দেহরক্ষী তার ঘরের দরজার ঠিক পেছনেই নিহত হয়। মোসাদ্দেক শেষ পর্যন্ত সাদা পতাকা হাতে ওই ভবন থেকে বেরোতে পারেননি। দোতলার জানালার ভেতর দিয়ে গুলি করা হয় সেই সাদা পতাকার ওপর। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, পেছনের দরজা দিয়ে বেড়িয়ে দেয়াল টপকে একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেবেন। করলেনও ঠিক তা-ই। দাদু ও তার লোকেরা এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি, অতঃপর অন্য একটি বাড়িতে রাত কাটালেন।’

কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক গ্রেফতার হলেন। বিচারের পর কারাদণ্ড দেওয়া হলো তাকে। পরবর্তী সময়ে জেল থেকে ছাড়া পেলেও

১৯৬৩ সালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে কার্যত গৃহবন্দিই ছিলেন তিনি।

মোসাদ্দেক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তেহরান ফিরে আসেন শাহ। অভ্যুত্থানের পর তিনিই হয়ে ওঠেন ইরানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কঠোর দমন-পীড়ন চালিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকেন ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লব পর্যন্ত।

মোসাদ্দেককে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের ৬০ বছর পর পর্যন্ত বিশ্ববাসী জানতেও পারেনি, এই অভ্যুত্থানের কলকাঠি নেড়েছিল কারা। ২০১৩ সালে সিআইএ-এর এক গোপন নথি থেকে বেরিয়ে আসে আসল কাহিনি। *দ্য ব্যাটেল ফর ইরান* শিরোনামের ওই নথিতে বলা হয়—

> 'যে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিল সিআইএ এবং এই সিদ্ধান্ত ছিল সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় কর্তৃক পরিকল্পিত ও অনুমোদিত।'

মোসাদ্দেক কোনো সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসেনি। তার পরিবার কাজার শাসকদের সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিজাত পরিবারে জন্ম নিলেও অতটা ধনী ছিলেন না মোসাদ্দেক। অথচ ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকাগুলো তাকে ইরানের অন্যতম সেরা ধনী হিসেবেই প্রচার করতে পছন্দ করত। নিঃসন্দেহে এটা ছিল উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। রাজধানী তেহরান থেকে ৮৫ মাইল দূরে আহমেদাবাদ নামে তার একটা গ্রাম ছিল। আর তেহরানে মোসাদ্দেকের মোট বাড়ি ছিল দুইটা। বাকি টাকা-পয়সা তিনি মায়ের নামে করা ইরানের একটি হাসপাতালকে দিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে আজারবাইজান ও ফার্সেরও গভর্নর ছিলেন তিনি। ছিলেন বিচারমন্ত্রী, এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রীও। তিনি ফার্সের গভর্নর থাকাকালে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসেন রেজা খান ওরফে রেজা শাহ। শাহের ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়া মোসাদ্দেক সমর্থন করেননি। অভ্যুত্থানের পরপরই সাময়িকভাবে রাজনীতি ছেড়ে দেন তিনি। এর আগে ১৯১৯ সালের 'অ্যাংলো ইরান' চুক্তিরও বিরোধিতা করেছিলেন মোসাদ্দেক। ভুসাক আল দৌলার ওই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রটেক্টরেটে পরিণত হয়েছিল ইরান। ব্রিটিশরা মোসাদ্দেককে বলত বাচাল, বাকপটু। রেজাশাহ নিজেও কিছুদিন আহমেদাবাদে আটকে রেখেছিলেন তাকে। এ সময় তার কথাবার্তা, লেখালিখি বা ভ্রমণের কোনো অনুমতি ছিল না। ১৯৪০ সালে আরও একবার স্বল্প সময়ের জন্য উত্তর খোরাসানে নির্বাসন দেওয়া হয় তাকে।

# ইতালীয় তেল ব্যবসায়ী এনরিকো মাত্তেই এর হত্যারহস্য

ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি সরকারের পতনের পর ইতালির নতুন সরকার তেল আমদানি শুরু করে ইরানের মোসাদ্দেক প্রশাসন থেকে। এতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এনরিকো মাত্তেই নামের এক ব্যক্তি। এনরিকো মাত্তেই ছিলেন ইতালীয় আমলা ও রাজনীতিবিদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্যাসিস্ট আমলের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি নতুন করে গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে। ইতালিয়ান পেট্রোলিয়াম এজেন্সি ভেঙে মাত্তেই ন্যাশনাল ফুয়েল ট্রাস্ট—ইএনআই (এ্যানি) গঠন করেন এবং নিজেই তার চেয়ারম্যান হন। এ্যানি'র কল্যাণে অ্যাংলো মার্কিন নিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানিগুলোকে একরকম কোণঠাসাই করে ফেলেছিলেন মাত্তেই। আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকামীদের সাথে তেল ব্যাবসা করে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন ফ্রান্সকেও। ১৯৬২ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মাত্তেই মারা যান। তবে অনেকেরই সন্দেহ, সিআইএসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার হাত ছিল এর পেছনে।

মার্কিন দূতাবাস মাত্তেই-এর ওপর নাখোশ ছিল নিজের স্বার্থেই। মাত্তেই-এর স্বাধীন পেট্রোল নীতির কারণেই বেকায়দায় পড়েছিল বিশ্ব তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সাতটি অ্যাংলো ব্রিটিশ কোম্পানি। পশ্চিমাদের সহযোগিতায় ইরানে মুহাম্মাদ রেজা শাহ ক্ষমতায় এসে আগের সরকারের সব কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেননি। তখনও তেল ও গ্যাস রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করছিল ন্যাশনাল ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি।

শিগগিরই মোসাদ্দেককে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিদান দেন ইরানের শাহ। ৫৩-এর অভ্যুত্থানের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অ্যাংলো আমেরিকান ও ফরাসি কোম্পানিগুলো ইরান সরকারের সাথে ২৫ বছর মেয়াদি একট চুক্তিতে সই করে, যার ফলে এক লাখ বর্গমাইল এলাকায় তেল অনুসন্ধানের অধিকার পায় তারা।

সে বছরই অ্যাংলো ইরানিয়ান তেল কোম্পানি রূপ নেয় ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামে। মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশ শেয়ার দেওয়া হয় এই কোম্পানিটিকে। আর রয়েল ডাচ শেল পায় ১৪ শতাংশ। তাতে সর্বসাকুল্যে ব্রিটেনের শেয়ার দাঁড়ায় ৫৪ (৪০+১৪) শতাংশ। মার্কিন কোম্পানিগুলোর ভাগে থাকে ৪০ শতাংশ আর বাকি ৬ শতাংশ পায় ফ্রান্সের সিএফপি। ইতালি এখানে শেয়ার চাইলেও অ্যাংলো মার্কিনিরা তা কানে তোলেনি। পরের বছর ইতালি মিশরের সিনাই উপদ্বীপে তেল অনুসন্ধানের সুযোগ পায়। ১৯৬১ সাল নাগাদ প্রতিবছর আড়াই মিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেল এ্যানির রিফাইনারিতে শোধন করে দেশটির চাহিদা পূরণ করা হয়।

১৯৫৭ সালে বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইরানে আসেন মাত্তেই। সে এমন এক চুক্তির প্রস্তাব দেয়, যাতে ইরানিয়ান ন্যাশনাল তেল কোম্পানি পাবে মালিকানার ৭৫ শতাংশ আর ইতালির এ্যানি পাবে ২৫ শতাংশ। একটা জয়েন্ট ভেনচারের অধীনে তারা উভয়ে মিলে ৮৮০০ বর্গমাইল এলাকায় আগামী ২৫ বছর তেল খুঁজবে। অ্যাংলো মার্কিন কোম্পানিগুলোর তখন পাগল হওয়ার দশা। উন্নয়নশীল বিশ্বে তখন ব্রিটিশ-মার্কিন কোম্পানিগুলা কাজ করছিল ফিফটি-ফিফটি অনুপাতে। তারা ভাবল, বেলজিয়াম ও জার্মানির কোম্পানিগুলাও যদি ইরানকে এমন অফার দিয়ে বসে! ফলে মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকার প্রতিবাদ জানাল শাহের কাছে। কেননা, বিশ্ব অয়েল অর্ডারে নিজেদের আধিপত্য কমে যাওয়ার ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছিল তারা।

শত বাধা সত্ত্বেও ইরানের সাথে ইতালির চুক্তি সম্পন্ন হলো। পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন ও অবহেলিত দেশগুলোতে সফর করা শুরু করল ইতালি। মাত্তেই প্রস্তাব দিলেন এই দেশগুলোতে তেল রিফাইনারি বানাবেন, পরে এর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা দিয়ে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের অধীনে। তবে ইতালি বিনিয়োগ ও বাজারজাত করার জন্য মুনাফা পাবে এবং শোধনাগারের অবকাঠামাগুলোও নির্মিত হতে হবে তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে। এরই ধারাবাহিকতায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে টার্গেট করেন মাত্তেই।

১৯৫৮ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বছরে ১ মিলিয়ন টন তেল কিনত ইতালি। কিন্তু তেলের বিপরীতে দেশটি নগদ অর্থের বদলে পাইপলাইন করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় রাশিয়াকে। এর মাধ্যমে রাশিয়ার ভোলগা-উড়াল থেকে

চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে। এর মাধ্যমে বছরে ১৫ মিলিয়ন তেল পূর্ব ইউরোপে নেওয়া যাবে। এ ছাড়া এই পথে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যও আমদানি করতে পারবে রাশিয়া। ওই সময় রাশিয়ার প্রোডাক্ট ক্যাপাবিলিটি ভালো ছিল না। একটি পাইপলাইন তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল প্রায়। প্রতি ব্যারেল ১ ডলার করে তেল নিত ইতালি। সাথে যুক্ত হতো দশমিক ৬৯ ডলার শিপিং কস্ট। ষাটের দশকে আমেরিকার ক্ষেত্রে এই হার ছিল ২ দশমিক ৭৫ ডলার করে। ইরান, রাশিয়া ছাড়াও মিশর, মরক্কো, তানজানিয়া, ঘানা, সুদান, ইন্ডিয়া ও আর্জেন্টিনার সাথে চুক্তি করেছিলেন মাত্তেই।

১৯৬২ সালের ২৭ অক্টোবর সিসিলি থেকে মিলান যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান মাত্তেই। তার মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে দেখা হয়; দায় গিয়ে পড়ে সিআইএ-এর ওপর। ঘটনার ১০ বছর পর রহস্যময় এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে নির্মিত হয় বিশ্ববিখ্যাত সিনেমা—*দ্যা মাত্তেই অ্যাফেয়ার*।

# মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুরবস্থা ও নিক্সন শক

বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে ব্যস্ত। দেশটির গোল্ড রিজার্ভ এতটাই কমে গিয়েছিল যে, সে সময় রিজার্ভের তুলনায় দেনার পরিমাণ দাঁড়ায় তিন গুণেরও বেশি। এ অবস্থায় যদি কোনো রাষ্ট্র মার্কিন ব্যাংকে তার জমাকৃত সব গোল্ড ফেরত চাইত, ওয়াশিংটনের কি হাল হতো—তা বলাই বাহুল্য। গোল্ড ফেরত দিতে বাধ্য হয়ে হয়তো জরুরি কোনো পদক্ষেপ নিত যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনিদের এই শনির দশায় ওয়াল স্ট্রিটভিত্তিক অর্থনৈতিক চক্র প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বাধ্য করল **'গোল্ড ব্যাকড কারেন্সি'**[২৫]-এর বদলে 'ডলার ব্যাকড কারেন্সি' চালু করতে। ইউরোপের মিত্র ফ্রান্স দাবি করে বসল, পার আউন্স গোল্ড প্রাইসের বিপরীতে ৭০ ডলার দিতে হবে তাকে, আগে যার পরিমাণ ছিল ৩৫ ডলার। বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে যথেষ্ট বিব্রত করেছিল, পরিস্থিতি কোনোভাবেই মোকাবিলা করতে পারছিল না তারা।

এমন চাপাচাপির মধ্যেই ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র 'ব্রেটন উডস সিস্টেম' থেকে সরে আসে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ঘোষণা করলেন, তারা নির্দিষ্ট কোনো ডলার রেটে আর সোনা কেনাবেচা করবেন না; বাজারই ঠিক করে দেবে এর দাম কত হবে। ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই-এর মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে ডলারের মূল্যমান। নিক্সনের ঘোষণায় কাগজি রিপ্রেজেনটেটর হিসেবে আর সোনা থাকল না; ডলার হয়ে গেল ভাসমান মুদ্রা। অর্থনীতিবিদরা এটাকেই বলেন নিক্সন শক। এতদিন ফরেন রিজার্ভ গোল্ডে রাখা হলেও এর মধ্য দিয়ে তার জায়গা দখল করে ইউএস ডলার।

---

২৫ এ বিষয়ে বিস্তারিত পাবেন লেখকের প্রথম বই *দ্যা কিংডম অব আউটসাইডারস*-এ।

নিক্সন শকের দুই বছর পর সুইডেনের একটা রিসোর্টে মিলিত হয় বিশ্বের বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা। সেই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন ওয়াল্টার লেভি নামের এক মার্কিনি। মুনাফাখোর লেভি তেল ব্যবসায় ৪০০ শতাংশ আয় বাড়ানোর একটি ব্লুপ্রিন্ট তুলে ধরেন সেদিনের বৈঠকে। অংশগ্রহণকারীরা লেভির দেখানো কৌশল কাজে লাগিয়ে পরিকল্পনা করলেন—কীভাবে পেট্রোডলারের বন্যা বইয়ে দেওয়া যায়। সিদ্ধান্ত হয়, সারা দুনিয়ার তেলের চাহিদা পূরণ করতে হবে মধ্যপ্রাচ্যের মজুত দিয়ে। তেলের দাম বাড়ানোর ষড়যন্ত্র সেখান থেকেই শুরু।

১৯৭৩ সালের চতুর্থ আরব-ইজরাইল বা ইয়োম কিপুর যুদ্ধ ওয়াশিংটন আর লন্ডনের সাজানো ছকে হয়েছে বলেই অনেকের বিশ্বাস। তাদের মতে—যুদ্ধ বাধাতে এই দুই পশ্চিমা দেশ গোপন কূটনৈতিক চ্যানেল ব্যবহার করেছেন, যার নেপথ্যে ছিলেন নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা **হেনরি কিসিঞ্জার**[২৬]। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ইজরাইলের রাষ্ট্রদূত সিমকা দিনিৎজ-এর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তার। এই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে কিসিঞ্জার অনায়েসেই ইজরায়েলি পলিসিতে হাত দিতে পারতেন। মিশর ও সিরিয়ার সাথেও বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে তিনি সম্পর্ক রাখতেন বটে, কিন্তু একই ইস্যুতে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিতেন সবাইকে। ১৯৭৩ সালের মধ্য অক্টোবরে জার্মান চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডট বনে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে জানান, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে জার্মানি নিরপেক্ষ থাকবে এবং জার্মান মিলিটারি বেইস থেকে ইজরাইলের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রকে রসদ নেওয়ার অনুমতি দেবে না। শোনা যায়, বিপরীতে ব্রান্ডটকেও কড়া প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

---

[২৬] হেনরি কিসিঞ্জার আমেরিকান শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর দায়িত্ব পালন করেছেন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড সরকারদ্বয়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন একসময়। ক্ষমতায় থাকাকালে কিসিঞ্জার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দাতেন্তে নীতির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি আমেরিকার সম্পর্ক বজায় রাখেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার সম্পৃক্ততারও ইতি ঘটান হেনরি কিসিঞ্জার। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও কম্বোডিয়ায় বোমাবর্ষণসহ নানা ঘটনায় তিনি বহুল বিতর্কিত।

অক্টোবরের ১৬ তারিখের মধ্যে ভিয়েনায় এক বৈঠকের পর তেলের দাম ৭৫ শতাংশ বাড়িয়ে প্রতি ব্যারেল ৩.১ ডলার থেকে ৫.১ ডলারে উন্নীত করা হয়। একই দিন ওপেকের আরব সদস্যরা জানায়, ইজরাইলের প্রতি মার্কিন সমর্থনের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডসে তেল বিক্রির ওপর অবরোধ দেবে তারা। রটারডাম তখন পশ্চিম ইউরোপের প্রধান তেল বন্দর। সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, লিবিয়া, আবুধাবী, কাতার ও আলজেরিয়া ১৭ তারিখ ঘোষণা দেয়—অক্টোবরে তারা পাঁচ শতাংশ তেল উৎপাদন কমিয়ে দেবে। এ ছাড়াও প্রতি মাসে আরও পাঁচ শতাংশ করে কমাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ৬৭ সালে দখল করা ভূখণ্ড থেকে ইজরাইল সরে যায় এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমের বিরুদ্ধে এই তেল অবরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সৌদি বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ। শুধু এই এক ভূমিকার কারণেই রাতারাতি মুসলিম বিশ্বের তারকা বনে গিয়েছিলেন তিনি।

আরবদের তেল অবরোধের পরিণতিতে বিশ্বের প্রথম তেল শক শুরু হয়। তামাম দুনিয়ার অর্থনৈতিক ভারসাম্য কাত করে দেয় এই অয়েল শক। ১৯৭৪ সালেই তেলের দাম গিয়ে ঠেকে ব্যারেল প্রতি ১১ দশমিক ৬ ডলারে। বলা হয়—তার বড়ো একটা দায় ইরানের শাহের। আবার এমনটাও বলা হয়—ইরানের সম্রাট মূলত দাম বাড়ানোর দাবি তুলেছিলেন কিসিঞ্জারের পরামর্শে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নাকি শাহের সাথে কিসিঞ্জারের এই প্লটে অংশ নেওয়ার খবরই জানত না! ১৯৪৯ সাল থেকে ৭০-এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ১.৯০ ডলার। ৭৩-এর শুরুতে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় ৩.১ ডলারে। ৭৪-এর জানুয়ারিতে ঘটল ওয়াল্টার লেভির সেই অতিকায় দর বৃদ্ধি। ৭৩-এর সেই ষড়যন্ত্রকারীরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলল, ক্যাসেলে বসে তেলের দাম ৪০০% বাড়ানোর ফন্দি করেছিল যারা।

# তেল অবরোধ সামাল

তেল অবরোধ মার্কিন পলিসি মেকারদের বগলের তলা গরম করে দেয়। তবে তাদের কিছুটা রক্ষে পাওয়ার কথা ছিল পুরোনো এক সিদ্ধান্তের কারণে। অবরোধের বছরখানেক আগে বড়ো বড়ো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো অভ্যন্তরীণ তেল সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ার পলিসি নিয়েছিল, তাদের নজর ছিল বাইরের তেলে। ফলে ৭৩-এর নভেম্বরে যখন তেল অবরোধ হয়, তাতে লঙ্কাকাণ্ড বাধার বিশেষ কারণ ছিল না। কারণ, দেশে বড়ো একটা রিজার্ভ তো তদ্দিনে হয়ে যাওয়ার কথা। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন বাণিজ্য নীতিমালা অনুযায়ী নিজের মতো করে তেল আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত হোয়াইট হাউজ। ১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে অর্থমন্ত্রী জর্জ শুলসকে নিজের অর্থনৈতিক সহকারী নিয়োগ দেন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। শুলজের দায়িত্ব ছিল হোয়াইট হাউজের তেল পলিসি দেখভাল করা। পাশাপাশি ডেপুটি অর্থমন্ত্রী উইলিয়াম ই সিমনকে করা হয় অয়েল পলিসি কমিটির চেয়ারম্যান।

অক্টোবরে অবরোধের সময়টাতে এই কমিটিই যুক্তরাষ্ট্রের তেল সাপ্লাই দেখাশোনা করত। ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউজে স্পেশাল এনার্জি কমিটি প্রণীত হয়। শুলজ ছাড়াও সেখানে অন্তর্ভুক্ত হন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার এবং হোয়াইট হাউজের জন এনরিচম্যান। এই তিনজনকে তখন একত্রে বলা হতো তিন পাণ্ডব। অনেকেই বলে থাকেন—হোয়াইট হাউজের এই পদক্ষেপ ছিল সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনার অংশ। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে অক্টোবরে খবর বের হলো, যুক্তরাষ্ট্রে তেলের জোগান খুবই খারাপ অবস্থায়। আরবদের তেল অবরোধ সত্যিই আমেরিকার গলাটিপে ধরেছে তাহলে। মার্কিনিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—'যে যেভাবে পারো তেল জোগাও!' মানুষের অস্থিরতায় নিউইয়র্ক সিটি নিজেও তখন একেবারে দিশাহারা।

তেল-রাজনীতির ফাঁদে আটকে পড়া আমেরিকার এই মারাত্মক দুর্দশায় কেমন বোধ করছিল ইউরোপ? বিশেষত গণতান্ত্রিক পশ্চিম ইউরোপ?

অল্প কিছুদিনের মাথায় তাদেরও নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর দিন সাঙ্গ হয়। একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হতে শুরু করে, কাজ হারিয়ে ভবঘুরের মতো এদিক-সেদিক হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে লাখো নরনারী। ব্রিটেন, ফ্রান্স কিংবা জার্মানি—সবখানে একই ছবি। কেবল জার্মানিতেই বেকারত্ব বরণ করে পাঁচ লাখ মানুষ। ১৯৭৪ সালের মে মাসের মধ্যে উইলি ব্রান্ডট[২৭] ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। তেল সংকটের জেরে ব্রান্ডট ছাড়াও গদিছাড়া হন ইউরোপের আরও কজন শাসক। এ তো গেল উন্নত বিশ্বের কথা। কম উন্নত দেশগুলোর ভোগান্তি ছিল তার চাইতেও বেশি।

তেল অবরোধে বিশ্ব অর্থনীতি যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, ঠিক তখনই ইউরোপ-আমেরিকার কিছু কোম্পানি নেমে পড়ল ডলারের পাহাড় গড়ার ধান্ধায়। মেজর নিউইয়র্ক ব্যাংক, লন্ডন ব্যাংক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সেভেন সিস্টার্স মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তরতাজা হয়ে উঠল অন্যদের দুরবস্থার সুযোগে। ১৯৭৪ সালে এক্সন মোট আয়ের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো কোম্পানি জেনারেল মোটরসকে ছাড়িয়ে যায়। তার সিস্টার কোম্পানি মবিন, টেক্সাকো, শেভরন আর গালফও শামিল হয় এই ইঁদুর দৌড়ে। আর বিপুল পরিমাণ পেট্রোডলার জমা হতে থাকে নিউইয়র্ক ও লন্ডনের ব্যাংকগুলাতে। চেইস ম্যানহাটন, সিটি ব্যাংক, ম্যানুফেকচারাস হ্যানোভার, ব্যাংক অব আমেরিকা, মিডল্যান্ড ব্যাংকও এই সুযোগে প্রচুর অর্থ কামিয়ে নেয়।

---

[২৭] নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী উইলি ব্রান্ডট ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ জার্মানির একজন প্রভাবশালী নেতা। নাৎসিদের ভয়ে নরওয়ে ও সুইডেনে পালিয়ে বেড়ানো ব্রান্ডট ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

# ডলার যেভাবে পেট্রোডলারে রূপ নিল

সত্তরের দশকের অয়েল শক ইউরোপ-আমেরিকার জন্য ছিল তেল রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। তারা ভাবতে বাধ্য হলো, ইজরাইলের পাশাপাশি আরবদেরও হাতে রাখা জরুরি। অদৃষ্টের কী খেয়াল! আর্থিক দুর্দশা কাটাতে একসময় এই আরবদের কাছেই ভিড়তে হয় পশ্চিমাদের। ইউরোপের দেশগুলো যখন তেল কেনার জন্য মরিয়া, তখনই তাদের জানিয়ে দেওয়া হলো—মার্কিন ডলার ছাড়া আর কোনো মুদ্রায় তেল বেচা হবে না। এমনকি ব্রিটিশ পাউন্ডও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। অথচ ৭৫-এর আগে ব্রিটিশ পাউন্ডই ছিল পেট্রোকারেন্সি। কিন্তু তেল মুদ্রানীতির এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তনে হতবাক হয়ে গেল গোটা ইউরোপ। ব্যাপক পরিসরে মার্কিন ডলার জমানোর ধুম পড়ে গেল চারিদিকে। ইউএস ডলারের চাহিদা হুহু করে বেড়ে চলল। ডলার পরিণত হলো পেট্রোডলারে। আর সেই পেট্রোডলারের কাঁধে ভর করেই মার্কিন ব্যাংকগুলো হয়ে উঠল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক শক্তি। রাতারাতি তাদের ক্লায়েন্ট বেড়ে গেল। একযোগে মার্কিন ডলারে তেল বেচতে শুরু করল সকল আরব রাষ্ট্র। আর পেট্রোডলারের বদৌলতে মার্কিন ও ব্রিটিশ ব্যাংকগুলো কদিনেই বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠল। সেই ডলারই আবার ঋণ হিসেবে দেওয়া হলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে, যাতে তারা বেশি দামে তেল ও অন্যান্য পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়। এটাই হলো হেনরি কিসিঞ্জারের পেট্রোডলার সাইকেল। সোজা বাংলায় যাকে বলে—'কই-এর তেলে কই ভাজা'! এই তেল পলিসিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো অনুন্নত দেশগুলা। সেখানকার মানুষের জীবনমান আর উন্নত হলো না।

সত্তরের দশকের পর অনেক দেশই পরমাণু প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। এ তালিকায় ওপরের দিকে ছিল লাতিন আমেরিকার বড়ো দেশ ব্রাজিল।

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে জার্মানির সাথে চুক্তিতে যায় দেশটি। উদ্দেশ্য, পরমাণু প্রকল্প তৈরি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এজন্য জার্মানি ও ফ্রান্সের সাথে যথাক্রমে পাঁচ ও আড়াই বিলিয়ন ডলারের দুটি চুক্তি সই হয়। কথা ছিল, আটটি ইউরেনিয়াম রিঅ্যাক্টরে ৯০-এর আগেই সমাপ্ত হবে এই প্রজেক্ট; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র একেবারে নজিরবিহীনভাবে ব্রাজিল ও জার্মানিকে চাপ প্রয়োগ করে। ব্রাজিল অ্যাংলো-আমেরিকান খপ্পর থেকে পরমাণুতে স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা দেয়, সেইসাথে হুমকি দেয় তেল ছিনতাইয়ের। ৭০-এর দশকে অন্যতম তেল রপ্তানিকারক দেশ মেক্সিকো ৭৪-এর অয়েল শকের পর সিদ্ধান্ত নেয়, পরবর্তী দুই দশকে কমপক্ষে ১৫টা পরমাণু চুল্লি বানাবে। এজন্য জাপানের মিতসুবিসি ও জার্মানির সিমেন্সের সাথে চুক্তিও করে বসে। তার বছর খানেক বাদেই পরমাণু সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের ব্যাপারে ফ্রান্সের সাথে সমঝোতায় যায় তারা। অবশ্য সেখানেও বাদ সাধেন হেনরি কিসিঞ্জার। উভয় দেশকে চুক্তি বাতিলের জন্য শুরু করেন চাপাচাপি।

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ পাকিস্তানও মনে করল, তার কাছে পরমাণু প্রযুক্তি থাকা উচিত। এজন্য মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদেশগুলোতে প্রচুর ক্যাম্পেইন চালিয়ে পাকিস্তান বোঝানোর চেষ্টা করে—এই প্রযুক্তি তার জন্য কতটা জরুরি। তবে যথারীতি সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। হেনরি কিসিঞ্জার যুক্তি পেশ করেন—পাকিস্তানের হাতে পরমাণু প্রযুক্তি থাকার পরিণাম হবে ভয়াবহ। এতে করে তাদের মধ্যে পরমাণু বোমা বানানোর উচ্চাশা জেগে ওঠাও স্বাভাবিক। এসব বিবেচনায় আগেভাগেই পাকিস্তানের জন্য ভয়ংকর উদাহরণ তৈরির হুমকি দিয়ে রাখেন কিসিঞ্জার। পরের বছর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সরিয়ে পাকিস্তানের গদি দখল করে জেনারেল জিয়াউল হক। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলার আগে সরকার উৎখাতের জন্য কিসিঞ্জারকেই দায়ী করে যান ভুট্টো। অভিযোগ করেন—পাকিস্তান পরমাণু প্রযুক্তিকে স্বাধীন হতে চেয়েছিল বলেই উৎখাত করা হয়েছে তাকে। ভুট্টো কারাগারে থাকা অবস্থায় লিখেন—

> 'মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার খুবই চতুর ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন—"পাকিস্তানের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য পরমাণু প্ল্যান্ট পুনরায় শুরু করার কথা বলে আমি যাতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে অপমান না করি।" জবাবে আমি বলি—

> "পাকিস্তানের বিদ্যুত চাহিদা নিয়ে আলোচনা করে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে অপমান করব না।" তবে তাকে এও বলেছিলাম—তিনি যাতে প্ল্যান্টের ব্যাপারে কথা বলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদার অপমান না করেন... আমি মৃত্যুদণ্ড পেলাম।'

জেনারেল জিয়া ভুট্টোর পলিসি থেকে বেরিয়ে এসে ওয়াশিংটনকে আপন করে নেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে ভালো প্যাকেজ নিয়ে আসেন পাকিস্তানের প্রতিবেশী ইরানের শাহ। ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে ওপেক মিটিংয়ে কিসিঞ্জারের প্রস্তাবমতো প্রতি ব্যারেল তেল ১১.৬৫ ডলারে বেচতে সম্মতি দেন তিনি।

# ইরানের ইসলামি বিপ্লব

ইরানের তেল সম্পদ লুটপাটের পথ আরও বেশি মসৃণ ও বাধাহীন করতে পিতাকে সরিয়ে মুহাম্মাদ রেজা শাহকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। প্রভুদের খুশি রাখতে গিয়ে নিজে যে কখন দানবে পরিণত হয়েছেন, সেটা হয়তো কখনো আয়নায় দেখেননি শাহ। ষাটের দশক থেকেই কুখ্যাত স্বৈরশাসকের তকমা উঠে যায় তার গায়ে। হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর আদলে গড়ে তোলেন গোপন পুলিশ ফোর্স 'সাভাক'। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সাভাকের মূল উদ্দেশ্য ছিল না; এই বাহিনী তৈরিই করা হয়েছিল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে দমন-নিপীড়নের জন্য। শাহ-এর নিষ্ঠুরতা সীমা অতিক্রম করে ১৯৭৫ সালে। এই সময় দেশের প্রধান এবং বড়ো দুই রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে তাদের স্থলে 'রিসার্জেন্স পার্টি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজনৈতিক নির্যাতন, গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ আর ব্যাপক হারে গুম-খুনের মধ্য দিয়ে ইরানে শুরু হয় ভয়ের শাসন। ছোটোখাটো কিছু প্রতিবাদের ধ্বনি ওঠে বটে, কিন্তু সেসব দমন করতে বিশেষ ঘাম ঝরাতে হয়নি সাভাককে। একসময় মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মে যায়—শাহকে কোনোভাবেই বুঝি গদিচ্যুত করা সম্ভব নয়।

অন্য স্বৈরশাসকদের মতোই অবকাঠামো উন্নয়ন ছিল শাহ-এর প্রধান হাতিয়ার। উন্নয়ন আর অত্যাচার দুটোই একসাথে চলছিল। ১৯৭৫ সালে ইরানের তেল রপ্তানি থেকে পাওয়া আয় ২০ বিলিয়ন ডলার স্পর্শ করে, যা ১০ বছর আগেও ছিল মাত্র ৫৫৫ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিনকে দিন নাজুক হতে থাকে। বেকারত্বের বোঝায় নেতিয়ে পড়ে ভারাক্রান্ত তরুণদের বড়ো একটি অংশ। সাভাকের নিপীড়নের মুখে সবাই যখন চুপসে গেছে, তখন এসব তরুণকে আলোর পথ দেখান প্রভাবশালী শিয়া নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খোমেনি।

খোমেনি ইরানিদের বোঝাতে লাগলেন, শাহ ইরানকে অতিমাত্রায় পশ্চিমা ধাঁচে গড়তে গিয়ে ইরানের কৃষ্টি-কালচারকেই ফেলে দিয়েছে চরম অবজ্ঞাভরে। খোমেনির মতে শাহের কার্যকলাপে ইরানে ইসলামের অনুশাসন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ। শাহের এসব অনৈসলামিক কাজকর্ম সামনে এনে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়তে থাকেন খোমেনি। ৭৯-এর বিপ্লব কেবল ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেনি; আরও নানা কারণে যারা শাহকে অপছন্দ করতেন, তারাও শরিক হয়েছিলেন খোমেনির ছাতার নিচে।

১৯৭৮ সাল নাগাদ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এবং তৃতীয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরমাণু প্রকল্পের মালিক হয় ইরান। সম্রাটের পরিকল্পনা ছিল ১৯৯৫ সালের মধ্যে কুড়িটি নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এজন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় ফ্রান্স এবং জার্মানিকে। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এসব ঠেকানোর চেষ্টা করে। চেষ্টা চলতে থাকে ১৯৭৮ সালে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের আগের করা ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর লক্ষ্যেও। কিন্তু অক্টোবর নাগাদ এই আলোচনা ভেস্তে যায়। ১৯৫৩ সালের পর এই প্রথম ইরান তার সম্ভাবনাময় ক্রেতা জার্মানি, ফ্রান্স ও জাপানকে পাশে নিয়ে স্বাধীনভাবে তেল বিক্রির পলিসি হাতে নিচ্ছিল; কিন্তু ইরানের তেল কেনার প্রস্তাব গ্রহণ না করে লন্ডন উলটো দেশটির ওপর চাপ দিতে থাকে। দিনে পাঁচ মিলিয়ন ব্যারেল তেল নেওয়ার চুক্তি থাকলেও নেয় তিন মিলিয়ন করে। এতে ইরানের আয়ে বড়োসড়ো ধাক্কা লাগে। অর্থনৈতিক সংকট জোরালো হয়। দেশের অর্থনীতি যখন ডুবছে, গোপন পুলিশ বাহিনী সাভাকের টর্চার তখনও থেমে নেই। আর এদিকে, ইরানের অর্থ ও ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রভাব তৈরি করে প্রচুর অর্থ পাচার করতে থাকে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম। শিয়া ইসলামপন্থি নেতা খোমেনির সংবাদ বেশি বেশি প্রচার করতে থাকে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি)। আর মুহাম্মাদ রেজা শাহ-এর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতায় ভাটা পড়তে থাকে বাইরের দুনিয়ায়।

১৯৭৮ সালের ৭ জানুয়ারি সরকারপন্থি এক পত্রিকা খোমেনিকে ব্রিটিশদের 'গুপ্তচর' বলে খবর প্রকাশ করে। প্রতিবাদে খোমেনির কিছু অনুসারী জড়ো হয় রাজপথে। খোমেনি তখন দেশের বাইরে, ফ্রান্সের একটি আটপৌড়ে গ্রামে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। সেদিন রাস্তায় নামা মানুষের সংখ্যা খুব সামান্যই ছিল। কিন্তু সেই গুটিকয়েক মানুষের জড়ো হওয়াকেই সহ্য করতে পারেননি ইরানের শাহ। সরকারি বাহিনী গণজমায়েতে গুলি চালায়। এলোপাথাড়ি গুলিতে

প্রাণ হারায় বেশ কিছু সাধারণ জনতা। আর এভাবেই ৭৯-এর ইসলামি বিপ্লবের প্লট রচিত হয়। দাবানলের মতো ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ইরানে। দিনকে দিন সড়কে বাড়তে থাকে বিদ্রোহীদের সংখ্যা। পুলিশের গুলিও চলতে থাকে সমান গতিতে। রাজপথে লাশের সংখ্যা বাড়ে, আয়তন বাড়ে মিছিলের। এভাবে আন্দোলন রূপ নিল গণ-অভ্যুত্থান ও বিপ্লবে।

মুহাম্মাদ রেজা শাহ আলোচনার ধার ধারলেন না, কোনো সমঝোতা বা সমাধানেও গেলেন না। বন্দুকের নলের ওপরই আস্থা রাখলেন শেষ পর্যন্ত। অন্য ডিক্টেটরদের মতোই আন্দোলনের পেছনে খুঁজলেন বিদেশি ষড়যন্ত্রের গন্ধ। তার এই গোয়ার্তুমিই নেহায়েত ছোটো একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করল। ক্ষুব্ধ জনতার সামনে হার মানল বন্দুকের নল।

১৯৭৯-এর জানুয়ারি শাহ দেশ ছাড়লেন। খোমেনি তেহরানে এলেন ফেব্রুয়ারিতে। বিপুল জনতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ইরানে সংঘটিত হলো ইসলামি বিপ্লব। কারও কারও মতে, এটা কেবল-ই শিয়া বিপ্লব। সে যা-ই হোক, বিপ্লবের পর বিদেশে নির্বাসিত শাহ লিখলেন—

> 'তখন এটি আমি জানতাম না, সম্ভবত জানতে চাইতামও না। কিন্তু এটা এখন পরিষ্কার যে, মার্কিনিরা আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাইরে পাঠাতে চেয়েছিল।'

# ইসলামি বিপ্লবের নেপথ্যে যে বিদেশি গ্রাম

ইসলামি বিপ্লবের ৪২ বছর পার করেছে ইরান। এই চার দশকে ইরান যেমন তার আঞ্চলিক শক্তি বলয় জোরদার করেছে, তেমনি পাশ্চাত্যের নানা অবরোধ সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের অন্তত পাঁচটি দেশের ওপর কায়েম করতে পেরেছে পুরোপুরি বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ। এই দেশগুলোতে ইরানের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সামরিক উপস্থিতি রয়েছে, আছে ইরান সমর্থিত মিলিশিয়া বাহিনীও। ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ইরান থেকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমর্থন পেয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনকে বলা হয় ইরান প্রভাবিত দেশ। শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহরাইন, প্রতিবেশী সৌদি ও আফগানিস্তানেও শিয়াবাদ ছড়ানোর অ্যাজেন্ডা আছে ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর।

ইরানে ইসলামি বিপ্লবের যিনি মহানায়ক, সেই আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে বহু বছর নির্বাসনে থাকতে হয়েছে দেশের বাইরে। প্যারিস শহর থেকে বহু দূরে, প্রত্যন্ত এক গ্রামে খুবই আটপৌড়ে জীবনযাপন করতেন তিনি। বাগানের ভেতর একটি আপেলগাছের নিচে বসে দিনের পর দিন পার করে দিতেন; আর ভাবতেন বিপ্লবের কথা। চিন্তা করতেন, ইরানকে আমেরিকা-ব্রিটেনের পুতুল শাসক মুহাম্মাদ রেজা শাহের কবল থেকে মুক্ত করা যায় কীভাবে। ষাটের দশকে তিনি ইরান থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন শাহের রোষানলে পড়ে। গোড়া থেকেই শাহ ছিল সমালোচনাবিরোধী এবং মারাত্মক অসহিষ্ণু। খোমেনি প্রথমে যান তুরস্কে। কিছুদিন সেখানে থাকার পর ফিরে আসেন ইরানের প্রতিবেশী দেশ ইরাকে। শিয়াদের পবিত্র শহর নাজাফে কয়েক বছর ধরে তিনি ধর্মীয় কার্যক্রম চালান। এই শহরেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলি (রা.)। আর শিয়ারা তাঁকেই চার খলিফার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়ে থাকে।

১৯৭৮ সালে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন খোমেনিকে নাজাফ শহর থেকে বিতাড়িত করেন। এরপর খোমেনি পাড়ি জমান ইউরোপে। প্যারিসের পশ্চিমে নোওপেলে-লি-চ্যাটুয়া (Neauphle-le-Château) নামের একটি নিভৃত গ্রামে তার শেষ আশ্রয় হয়। তেহরানে ফেরার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। আর ওই গ্রামে বসেই রেজা শাহকে উৎখাত করার জন্য তৈরি করেন মাস্টারপ্ল্যান।

খোমেনি যে সড়কে বসবাস করতেন, সেখানকারই একটি বাড়িতে থাকতেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জন-ক্লঁ সিনটাস। সে সময়ের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সিনটাস বলেন—'বেশ লম্বা দাড়িওয়ালা, পরনে ঢিলা জামা ও মাথায় কালো পাগড়ি পরা এক শিয়া নেতা মাঝেমধ্যে রাস্তায় হাঁটাচলা করতেন। ফরাসি পুলিশ বিশেষ নিরাপত্তা দিত তাকে। পুলিশ সদস্যরা সব সময় তার আশপাশেই থাকতেন।'

চিত্রশিল্পী সিনটাস বলেন—'নোওপেলে-লি-চ্যাটুয়াতে বসবাস করা লোকজন বলাবলি করত—কেন এই ভিনদেশি অপরিচিত ব্যক্তিকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? কেবল এই এক ব্যক্তির জন্য এত এত পুলিশ ও হেলিকপ্টার নিয়োজিত থাকার তাৎপর্যই-বা কী? কেন এত আয়োজন, আমাদের জন্য সেটা বোধগম্য ছিল না। অবশ্য আমরা এতটুকু জানতাম যে, তিনি ইরানের সম্রাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন।'

ব্রিটিশ গণমাধ্যম রয়টার্স সে সময় খোমেনির কিছু ফটো তুলেছিল। সেগুলোর একটিতে দেখা যায়, খোমেনি আপেলগাছ তলায় একটি জাজিমে বসে আছেন। তার সামনে ইরানের তৈরি জায়নামাজ, ডান হাতে কালো চশমা। মনে হচ্ছিল, তিনি কারও সাথে গোপনে, নিঃশব্দে কোনো আলাপ করছেন।

নিজের থাকার জন্য একটি মাঝারি আকারের বাড়ি বেছে নিয়েছিলেন খোমেনি। আর এই নির্বাসিত নেতার সকল খবর সংগ্রহের জন্য পল টেইলর নামে তরুণ এক সাংবাদিককে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিল রয়টার্স। ফ্রান্সে খোমেনির চার মাস নির্বাসিত থাকার সময়ে তার সাক্ষাৎকার নিতে গ্রামটিতে সজাগ সময় কাটান টেইলর। তিনি বলেন—'পুরো সময়টায় খোমেনিকে খুবই শান্ত দেখা গেছে। একবারের জন্যও তাকে আবেগপ্রবণ হতে দেখা যায়নি।'

১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি মুহাম্মাদ রেজা শাহ পাহলভি ইরান ছাড়েন। এর সপ্তাহ দুয়েক পরই একটি ফরাসি বিমানে নিজের দেশের উদ্দেশে উড়াল দেন খোমেনি। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ডজনখানেক সাংবাদিক, সেইসাথে কিছু ভক্ত ও অনুসারী। সেদিন তেহরানের রাজপথে লাখো মানুষ নেমে এসেছিল খোমেনিকে স্বাগত জানাতে। চৌকশ ও দূরদর্শী এই নেতার হাত ধরেই ইরান থেকে সেক্যুলার শাসন রাতারাতি বিদায় হয়। আড়াই হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে ইরানের দেখভাল করেন খোমেনি। ক্ষমতায় এসে প্রথমেই শাহের পরমাণু প্রকল্পকে তিনি অনৈসলামিক তকমা দিয়ে বাতিল করে দেন। এরপর পশ্চিমাদের অব্যাহত অবরোধে ইরান তার সমৃদ্ধ ও আভিজাত্যের পথ থেকে ধীরে ধীরে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে পড়ে। নোওপেলে-লি-চ্যাটুয়ায় সেই সাদাসিধে বাড়িটি এখনও এক নির্বাসিত নেতার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। কারও বোঝার উপায় নেই, এখানেই নির্ধারিত হয়েছিল একসময়কার পারস্য সাম্রাজ্যের ভাগ্য।

## উপসাগরীয় যুদ্ধ : সাদ্দাম হোসেন ও তেল

১৬ জানুয়ারি, ১৯৯১; রাত ১:০০টা

চারটি স্পেশাল অপারেশন হেলিকপ্টার এসকর্টে চার জোড়া অ্যাপাচি হেলিকপ্টার কোনো রকম আলো ছাড়াই নিচ দিয়ে উড়ে ইরাকের আকাশসীমায় ঢুকে পড়ে। নিশানা ইরাকি রাডার স্টেশন। কপ্টারগুলো থেকে রাডার সিস্টেম বরাবর ছুটে যায় লেজার গাইডেড মিসাইল। একই সাথে চলে গান ফায়ার। অন্তত দুটি রাডার স্টেশন ধ্বংস করে দিয়ে ইরাকি আকাশসীমা ছাড়ে হেলিকপ্টারগুলো। রাডারব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ার সুযোগে আটটি F-15 যুদ্ধবিমান ইরাকের আকাশে ঢুকে যায়। এর ঘণ্টাখানেক বাদেই আক্রমণে যুক্ত হয় F-117-এ স্টিলথ এয়ারক্রাফট। বাগদাদ ও দক্ষিণ ইরাকের সরকারি স্থাপনাগুলোকে টার্গেট করে সমানে চলে বোমা হামলা।

বিমান আক্রমণের বিরতিতে মার্কিন নৌজাহাজ থেকে ছোড়া টোমাহক ক্রুজ মিসাইল বাগদাদ নগরীকে কাঁপিয়ে দেয়। সাইরেনের শব্দে ঘুম ভাঙা মানুষ দিগ্‌বিদিক ছুটতে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। হঠাৎ-ই ইরাকের আকাশে উড়তে শুরু করে আমেরিকার B-52 বোমারু বিমান। তবে কি এক মৃত্যু উপত্যকা হতে যাচ্ছে বাগদাদ!

প্রথম দফাতেই ১৫০ ক্রুজ মিসাইল ছোড়া হয় ইরাকি মিলিটারি বেইস, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা আর যোগাযোগ স্টেশনগুলো লক্ষ্য করে। এর আগে কোনো যুদ্ধে স্টিলথ বিমান, লেজার গাইডেড মিসাইল ও টোমাহক ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করা হয়নি। ইরাকও তার দুর্বল সব অস্ত্রশস্ত্র ও মিসাইল দিয়ে প্রতিরোধের বৃথা চেষ্টা চালায়। বহুজাতিক বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে ইজরাইল ও সৌদি আরবের দিকে ছুটে যায় দুর্বল প্রযুক্তি ও ওয়ারহেডের ইরাকি স্কাড মিসাইল।

অথচ ইজরাইল তখনও যুদ্ধের কোনো পক্ষ নয়; বরং দেশটি তখন নতুন আরেকটি আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সম্ভাব্য সূচনার ভয়ে শঙ্কিত।

ইরাকের বাথিস্ট সরকার ছিল নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। রাজনৈতিক ইসলাম নিয়ে আপত্তি থাকলেও ইজরাইলকে দমিয়ে রাখার ইস্যুতে এরা গোড়া থেকেই একাট্টা ও আপসহীন। ফিলিস্তিন ইস্যু আর ১৯৮১ সালে ইরাকের ওসিরাক পরমাণু প্রজেক্ট ইজরাইলি বিমান হামলায় ভন্ডুল হয়ে যাওয়ায় সাদ্দাম একটি সময়োপযোগী প্রতিশোধের ক্ষণ গণনা করছিলেন। ফলে সতর্কতার নীতি অবলম্বন করতে থাকে ইজরাইল। ইরাকের সর্বোচ্চ নেতার ক্রোধের আগুন থেকে বাঁচতে ইরাকবিরোধী কোয়ালিশন বাহিনীতে দেশটি যোগ দিতে চায়নি। কিন্তু সাদ্দামের ক্রোধ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে পারেনি তারপরও। অন্তত ৮৮টি স্কাড মিসাইল ছোড়া হয় সৌদি ও ইজরাইলকে লক্ষ্য করে। তাতে ৩২ জন মারা যায়, আর আহত হয় ২৫০ মানুষ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, সাদ্দাম হোসেনের বা ইরাকি বাথিস্ট সরকারের গোয়ার্তুমিতেই উপসাগরীয় যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। কারণ, সাদ্দাম ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট তার দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে কুয়েত দখলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইরাক সরকার দাবি করেছিল, কুয়েত তাদের ২৩তম প্রদেশ। অবশ্য যে দুটি দেশের বিবাদে এই বহুজাতিক যুদ্ধ—একসময় তারা উভয়েই ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। যুদ্ধে কুয়েতের পক্ষ নিয়েছিল ব্রিটেন।

সাদ্দাম কর্তৃক কুয়েত আক্রমণে বিশ্ব নেতারা হতবাক হয়ে গেল। দুই দেশের বিরোধিতার কথা তারা জানতেন বটে; কিন্তু এটা কারও কল্পনাতেও ছিল না যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রকে নিজের ভূখণ্ড দাবি করে দখল করে বসবে আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র। যে বছর ইরাকি সৈন্যরা কুয়েতে গেল, তার দুই বছর আগেও ইরাক-কুয়েত একে অপরের মিত্র ছিল। উভয়েই নাখোশ ছিল পাশের দেশ ইরানের ইসলামি বিপ্লব নিয়ে। ৮০ থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত চলা ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাককে অর্থ সহায়তাও দিয়েছিল ক্ষুদ্ররাষ্ট্র কুয়েত। অবশ্য ইরাক ও কুয়েতের এই মৈত্রী ছিল সাময়িক; বরং তাদের বিবাদের ইতিহাসটাই অধিকতর পুরোনো।

ইরাক একসময় শাসিত হয়েছে তুর্কিদের দ্বারা। সে সময় এর প্রদেশ ছিল তিনটি—বসরা, বাগদাদ ও মসুল। আর কুয়েত ছিল বসরারই অংশ। এই ব্যাপারটাই পরবর্তী বছরগুলোতে বিরোধের অন্যতম কারণ হিসেবে থেকে গেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কুয়েতে সাবাহ গোত্রের লোকজন এলো। মাছ ধরা, জাহাজ নির্মাণ আর মুক্তা আহরণ করাই ছিল তাদের প্রধান পেশা। সাবাহ গোত্র কখনোই উসমানীয়দের খবরদারি মানতে চায়নি। এজন্য উসমানীয়দের মোকাবিলায় ব্রিটিশদের ডেকে আনে তারা। কিন্তু উসমানীয়দের সাথে প্রকাশ্য কোনো দ্বন্দ্বে যেতে আগ্রহী ছিল না ব্রিটেন। কুয়েতের শেখ মোবারক বারবার ব্রিটিশদের দুয়ারে হাত পেতে বলতে থাকে—'আমাদের সাথে একটা চুক্তি করেন। আপনারা এখানে সৈন্য রাখবেন, আর আমাদের নিরাপত্তা দেবেন।'

শেষমেশ ব্রিটেন রাজি হয় অন্য এক কারণে। ব্রিটিশরা জানতে পারল, কুয়েতে একটি রেলওয়ে টার্মিনাল নির্মাণ করতে যাচ্ছে রাশিয়া। এটি নির্মিত হলে এ অঞ্চলের অর্থনীতি তো বটেই, রাজনীতিতেও রাশিয়াকে ঠেকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে তাদের জন্য। এসব ভেবেই মূলত ইংরেজরা এই অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে আগ্রহী হয়। ১৮৯৯ সাল নাগাদ ব্রিটিশরা চুক্তিবদ্ধ হয় কুয়েতের সাথে। তখন থেকেই ব্রিটেন পুরোপুরিভাবে কুয়েতে আসে, থাকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। এর দুই বছর বাদে কুয়েত স্বাধীন হলে ইরাকও তাকে স্বীকৃতি দেয়; যদিও এই স্বীকৃতির কথা পরের বছরগুলোতে স্বীকার করেনি ইরাক।

ব্রিটেনকে ইরাক শাসনের ম্যান্ডেট দেওয়া হয় সানরেমো সম্মেলনে। আর কুয়েত তো আগে থেকেই ব্রিটেনের অধীনে। বাদশাহ গাজি বিন ফয়সালের আমলে নুরি পাশা আল সৈয়দ যখন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হন, তখনও কুয়েত দখলের চিন্তা করছিল ইরাকি রাজপরিবার। কিন্তু কুয়েত সে সময় ব্রিটিশ প্রটেকটরেইট; তা ছাড়া ইরাকের সরকারও ছিল ব্রিটিশ অনুগত। ১৯৩০ সালের অ্যাংলো-ইরাকি চুক্তি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে ব্রিটেনের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ছিল ইরাকের জন্য। আবার বাদশাহ গাজির কুয়েত দখলের পরিকল্পনায় সম্মতি ছিল না ইরাকি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর। তবে বাদশাহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলে সে পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

উম্ম কাসর বন্দর আর ওয়ারবা ও বুবিয়ান দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও বিরোধ ছিল ইরাক আর কুয়েতের মধ্যে। ব্রিটিশরা মনে করত, উম্ম কাসর বন্দর কুয়েত এলাকার অন্তর্গত। সুতরাং তার মালিক কুয়েত। ইরাক ওয়ারবা ও বুবিয়ান দ্বীপ বাগিয়ে নিতে যুক্তি দেখাল, এগুলা অনুর্বর আর কর্দমাক্ত। তা ছাড়া কুয়েত এসব ব্যবহারও করছে না। বিনিময়ে কুয়েতকে কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে চায়নি ইরাক।

১৯৫৮ সালে সিরিয়াকে সাথে নিয়ে মিশরের জামাল আবদেল নাসের 'ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক' গড়ে তুললেন। মিত্র হিসেবে বেছে নিলেন রাশিয়াকে। তার বিপরীতে হাশেমি পরিবারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ প্রভাবিত ইরাক ও জর্ডান নিয়ে গঠিত হলো—'আরব ফেডারেল ইউনিয়ন'। এই পক্ষের মিত্র হিসেবে থাকল পশ্চিমারা। কুয়েতকে দ্বিতীয় দলে টানার চেষ্টা হলো। ইরাকের পক্ষ থেকেই চেষ্টা হলো সবচেয়ে বেশি।

তার আগে ১৯৫৫ সালে তুরস্ক, ব্রিটেন আর যুক্তরাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে নুরি সৈয়দ গঠন করলেন বাগদাদ প্যাক্ট। উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজমের প্রভাব কমানো। স্বভাবতই জামাল আবদেল নাসেরের তা পছন্দ হওয়ার কথা নয়। নাসের বাগদাদ প্যাক্টকে দেখলেন সোভিয়েত ইউনিয়নবিরোধী পশ্চিমা ধান্দা হিসেবে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরি সৈয়দ কুয়েতকে আরব ফেডারেল ইউনিয়নে আনতে ব্রিটিশদের সাহায্য চাইলেন। যে ফেডারেল সরকার গঠন করা হবে, সেই সরকারের বাজেটের ৮০ শতাংশ ব্যয় বহন করার কথা ছিল ইরাকের। বাকি ২০ শতাংশ পড়ল জর্ডানের ঘাড়ে। কিন্তু আর্থিক অক্ষমতার কারণ দেখিয়ে জর্ডান টাকা দিতে পারছিল না বা দিলো না। সেজন্য কুয়েতের মতো একটা সমৃদ্ধ দেশ প্রয়োজন ছিল ইরাকের। কিন্তু কুয়েতকে যখন কোনোভাবেই রাজি করানো গেল না, তখন নুরি সৈয়দ ইরাকে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার মাইকেল রিটকে কিছু আবেগঘন কথা বলে পদত্যাগের হুমকি দেন।

শেষ পর্যন্ত নুরিকে পদত্যাগ করতে হয়নি অবশ্য। ইরাকের দুই বন্ধুরাষ্ট্র—যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মিলে শিগগিরই ২৮ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন দিয়ে দেয়। কারণ, ব্যাপারটা কমিউনিজম আর পুঁজিবাদের লড়াই। কিন্তু ১৯৫৮ সালের অভ্যুত্থান সবকিছু এলোমেলো করে দিলো। হাশেমি পরিবার সাফ করে দিয়ে ক্ষমতায় এলেন ব্রিগেডিয়ার কাসিম। তবে নতুন সরকারও কুয়েত ইস্যুতে অবস্থান পালটায়নি। কাসিম সরকার, এমনকি কুয়েতে গভর্নর নিয়োগেরও হুমকি দেয়। অসহায় কুয়েতের আবেদনে সাড়া দিয়ে কিছু সেনা পাঠায় ব্রিটেন আর সৌদি আরব। সীমান্তে পর্যবেক্ষণ সেন্টার বসায় তারা। ১৯৬৩ সালে প্রথমবারের মতো কুয়েতের সার্বভৌমত্বে স্বীকৃতি দেয় ইরাক।

১৯৬৮ সালে কোনো রকম রক্তপাত ছাড়াই ইরাকের ক্ষমতায় আসে বাথ পার্টি। তার পরের বছরই ব্রিটেন অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে উপসাগরীয় এলাকা থেকে

সামরিক উপস্থিতি সরিয়ে নেয়। একই বছর পশ্চিমাদের বাদ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র কেনার চুক্তিতে যায় ইরাক। রাশিয়াকে উম্ম কাসর বন্দর ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ দিকে পশ্চিমের পুতুল মুহাম্মাদ রেজা শাহ দেখল, রাশিয়ার উপস্থিতি ইরান ও পশ্চিমের জন্য বিপজ্জনক। তাই কিছু সেনা কর্মকর্তাকে উসকে দিয়ে ইরাকে বাথ পার্টিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইলেন তিনি। কিন্তু শত্রুদের অস্ত্র সরবরাহের খবর ফাঁস হয়ে যায়। ইরাকে কিছু লোক ধরা পড়ে। পরবর্তী সময়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাদের।

ইরানের সাথে একটা যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয় ইরাকের। ইরাক তার কাসর বন্দরকে ইরানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীর ছোটো একটা অংশ কুয়েতে মোতায়েন করে রাখতে চায়। ইরাকের পরিকল্পনা ছিল; কুয়েতে ততদিন সৈন্য থাকবে, যতদিন শাত আল আরব জলপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইরানের সাথে বিবাদ না মেটে। ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চে সীমান্তে সেনা উপস্থিতি নিয়ে দেশটি কুয়েতের সাথে যুদ্ধে জড়িয়েই যাচ্ছিল প্রায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেটা এড়ানো গেছে। এরপর কুয়েত থেকে ইরাকি সেনা সরিয়ে নিতে বলে সাবাহ পরিবার। আরব লীগের মধ্যস্থতায় ইরাক সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু কিছুদিন পর কুয়েতের একটা টিম বাগদাদ সফরে গেলে দাবি জানানো হয়, ওয়ারবা ও বুবিয়ান দ্বীপ অন্তত লিজ হিসেবে হলেও ইরাককে দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কুয়েত তাতে রাজি হয়নি। ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাকের যে খুব একটা লাভ হলো তা নয়; কিন্তু বিদেশি ঋণ গিয়ে ঠেকল ৭০-৮০ বিলিয়ন ডলারে।

ইরাককে উপসাগরে ঢুকতে হতো ইরান ঘনিষ্ঠ শাত আল আরব জলপথ দিয়ে। ফলে যেকোনো সময় এখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত ইরান। তাই বাণিজ্যের স্বার্থে উম্ম কাসর আর সাথের ওয়ারবা ও বুবিয়ান চেয়ে আসছিল ইরাক, কিন্তু কুয়েত কখনোই তাতে সম্মত হয়নি।

যুদ্ধপরবর্তী ইরাক যখন দেশ পুনর্গঠনে কুয়েতসহ অন্যান্য আরব দেশ থেকে অর্থ পেল না, সে চাইল তেল বেচে তা পুষিয়ে নিতে। সেখানেও কুয়েতই পথের কাঁটা। হঠাৎ তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে দিলো কুয়েত, যা ওপেক কোটার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ফলে দরপতন ঠেকানোর কোনো উপায় থাকল না। অসহায় ইরাক ওপেক কোটার বাইরের অতিরিক্ত উৎপাদন কমিয়ে তেলের দাম বাড়াতে উপসাগরীয় দেশগুলোর দৃষ্টি কামনা করল। তবে তেলের অতিরিক্ত উৎপাদনের

জন্য কুয়েতকেও একতরফাভাবে দায়ী করা যায় না। ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাকের প্রায় সব তেল ক্ষেত্র ধ্বংস হয়। ইরানেরও তেল উৎপাদন ব্যাহত হয় মারাত্মকভাবে। ফলে উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব বাজারের চাহিদা পূরণে বাধ্য হয় আরব দেশগুলো। যুদ্ধের পর ইরাক যখন পুনরায় তেল উৎপাদনে এলো, কুয়েতসহ আরও কিছু দেশ তখন তেলের উৎপাদন কমাতে চাইল না। কুয়েত যুক্তি দেখাল—সামনে তার বাজেট, প্রচুর অর্থ দরকার। ব্যাপক উৎপাদন, বেশুমার বিক্রি এবং অগণিত অর্থ—এই ছিল কুয়েতের তৎকালীন কৌশল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদের জন্য এ ধরনের কৌশল ছিল নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর।

যুদ্ধের আগে যেখানে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ছিল ২০ ডলার, যুদ্ধ শেষে তা ৮ ডলারে নেমে আসে। ইরান এমনকি সৌদি আরবও দাম বাড়ানোর পক্ষে ছিল। তাদের প্রস্তাব ছিল ১৮ ডলার। আর ইরাকের চাওয়া ২৫ ডলার। ১৯৮৯-এর জুনে ওপেকের বৈঠকে যখন কুয়েতকে বলা হলো দিনে তেলের উৎপাদন ১০ লাখ ৩৭ হাজার ব্যারেলে নামিয়ে আনুন, তাদের তেলমন্ত্রী তা আমলেই নিলেন না। উলটো বললেন—'আমরা সেটা ১৩ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল করতে চাই; কারণ সামনে বাজেট।' তথ্য অনুযায়ী, সে সময় ১৭ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন করত কুয়েত। যুদ্ধের পর ইরাকের ঋণ দাঁড়াল ৭০ বিলিয়ন ডলারে। আর তখন তার রিজার্ভ ছিল কুয়েতের এক-তৃতীয়াংশ।

নভেম্বরে ওপেকের আরেক বৈঠকে ইরাক তেলের দাম ২১ ডলার প্রস্তাব করে। সেটা সম্ভব না হলেও অন্তত তা যেন ১৮-এর নিচে না নামে—এই আশ্বাস চাওয়া হয়। এই প্রস্তাবে সায় ছিল সৌদি আরব ও আমিরাতের। কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল আহমেদকে ওপেক কোটা মানতে ব্যক্তিগতভাবে চিঠিও দেন সাদ্দাম হোসেন। কুয়েত কিছুদিন সেটা মেনে চললেও কিছুদিন পর আবারও উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। ইরাক ভাবল—কুয়েতের মতো শক্তিশালী মিলিটারিহীন ক্ষুদ্র দেশ ওপেক ও আরব নেতাদের উপেক্ষা করছে, নিশ্চয় তার পেছনে বাইরের শক্তির ইন্ধন আছে। ইরাক আবিষ্কার করল, এর নেপথ্য শক্তি ব্রিটেন।

সাবাহ্ পরিবারের পক্ষে ব্রিটেনের অবস্থান নতুন না, ঐতিহ্যগত। রাশিয়া ও জার্মানির কুয়েত টু ভূমধ্যসাগর রেলরোড-এর কারণে ১৮৯৯ সালে কুয়েতে প্রটেকশন বাড়ায় ব্রিটেন। আর তখন থেকেই এই অঞ্চলে ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের অংশ হয়ে ওঠে কুয়েত। ১৯৭১ সালে যখন ব্রিটেন উপসাগর থেকে তার মিলিটারি উপস্থিতি সরিয়ে নেয়, বিকল্প নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয় এ অঞ্চলে।

কে হবে বিকল্প নেতা? ইরাক? সম্ভব নয়, কারণ দেশটি মারাত্মক অস্থিতিশীল। তাহলে কি সৌদি আরব? কিন্তু সৌদির তখন তুলনামূলক সামরিক সক্ষমতা নেই। বাকি থাকল ইরান? আর ইরানের শাহ-ই সুযোগটা নিলেন। নিজেদের উপসাগরীয় এলাকার পুলিশ দাবি করে বসল দেশটি; যদিও ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লব তা গড়বড় করে দেয়। শাহের পর নেতৃত্ব লুফে নেন সাদ্দাম হোসেন।

হাশেমিরা সরকারে থাকলেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইরাকে ব্রিটেনেরই রাজত্ব ছিল। আমেরিকার সাথে তার সম্পর্ক জোড়া লাগে ১৯৮৪ সালের দিকে। ৯০-এর দশকে ইজরাইল ও ইরাকের মধ্যে একটি যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল, ১৯৮১-এর হামলার প্রতিশোধ নিতে ইজরাইল আক্রমণ করতে পারেন সাদ্দাম। সেবার সৌদির মধ্যস্থতায় আমেরিকার মাধ্যমে ইজরাইলকে আক্রমণ না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত করা হয়। ইরাককেও আশ্বস্ত করা হয় ইজরাইলের ব্যাপারে। কিন্তু সাদ্দাম কোনো এক বৈঠকে হুমকি দেন—'ইজরাইল পরমাণু বোমা হামলা করলে আমরা রাসায়নিক হামলা চালাব।' ১৯৯০ সালের মে মাসে বাগদাদে আরব শীর্ষ সম্মেলনে সাদ্দাম হোসেন আরব নেতাদের উদ্দেশে বলেন—

> 'তেলের দাম এক ডলার করে কমলেও বছরে ইরাকের ক্ষতি হচ্ছে এক বিলিয়ন ডলার। আমি আমার আরব ভাইদের অনুরোধ করছি, যারা আমাদের সাথে অর্থনৈতিক যুদ্ধে জড়াতে আগ্রহী নন। একজন কতটুকু সহ্য করতে পারে, তার একটা সীমা থাকা দরকার। আমরা এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছি যে, আর কোনো চাপ নিতে পারছি না।'

সাদ্দাম ছিলেন অত্যন্ত চতুর। যেহেতু কাউকে সরাসরি টার্গেট করে তিনি কথা বলেননি, তাই কুয়েতের আমির জাবেরকে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেখা যায়নি। তবে সাদ্দামের সাথে একান্তে বসলেন সৌদি বাদশাহ ফাহাদ। তিনি ইরাকি নেতাকে বললেন—'আপনি রেগে আছেন মনে হচ্ছে। কুয়েতের সাথে বিষয়টিতে কোনো সমঝোতা হয়েছে কি?' সাদ্দাম জবাব দিলেন—'না, হয়নি।' এরপর প্রকাশ্যেই কুয়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল সাদ্দাম সরকার। বলা হলো, ইরাককে আঘাত করার পলিসি নিয়েছে কুয়েত। তখনও ওপেক কোটার বাইরে তেল উৎপাদন করে যাচ্ছিল কুয়েত ও আমিরাত। সাদ্দামের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, কুয়েতসহ অন্যান্য দেশকে শিয়া বিপ্লব থেকে

বাঁচাতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের খরচ হয়েছে ১০৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। তখনও কুয়েতের কাছে ইরাকের ঋণ ছয় বিলিয়ন ডলার। ইরাকের দাবির ভিত্তিতে আমিরাত ওপেক কোটা মানার ঘোষণা দেয়, কিন্তু আগের অবস্থানেই অনড় থাকে কুয়েত। আমিরাত বলেছিল—আরবদের স্বার্থই তাদের স্বার্থ; অন্যথায় শত্রুরা তাতে সুবিধা পাবে। কুয়েতের দিল নরম হয়নি তাতে।

কুয়েত জানায়—রুমেইলা তেল খনি ইরাকের নয়, একান্তই তাদের। ইরাক আবার আগে থেকেই বাণিজ্যিক ফ্লাইটের জন্য কুয়েতের আকাশসীমা চেয়ে আসছিল। যদিও এ নিয়ে সুস্পষ্ট চুক্তি ছিল পাঁচ আরব দেশের মধ্যে। জেদ্দাতে কুয়েতের শেখ সৌদি বাদশাহ ফাহাদকে বলেছিলেন—ওয়ারবা ও বুবিয়ানে মিলিটারি ফ্যাসিলিটিসহ ইরাকের রাষ্ট্রীয় ঋণ মওকুফেও প্রস্তুত ছিলেন তারা। কিন্তু জেদ্দায় কুয়েতের সাথে ইরাকের ইজ্জাত ইবরাহিম আল দুরির মিটিং সাফল্যের মুখ দেখেনি। ইজ্জাতকে ডেকে নেওয়া হলো ইরাকে। সাদ্দাম তখন কেবল দক্ষিণ রুমেলিয়া তেলখনি, ওয়ারবা ও বুবিয়ান-ই নয়; পুরো কুয়েতকেই শক্তির জোরে বাগিয়ে নিতে উন্মুখ। সাবাহ্ পরিবারের পরিবর্তে সেখানে নিজের অনুগত সরকারও বসাতে চেয়েছিলেন তিনি।

সাদ্দামের অনুমান ছিল, আরবরা বিদেশি সেনা মোতায়েনে সম্মত হবে না। সাথে এও ধারণা করা হয়েছিল, বাইরে যুদ্ধ জড়ানোর মতো পরিস্থিতি আমেরিকার নেই। কিন্তু দ্রুতই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য কুয়েত আক্রমণের প্রতিবাদ জানায়। জর্ডানের বাদশাহ হোসেন অনেক চেষ্টা চালিয়েছেন, ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ করেছে সৌদি-মিশরও; কিন্তু সংকটের সমাধান হয়নি মোটেই। সবাই চেষ্টা করেছে সাদ্দামকে ঠেকিয়ে রাখতে। কোনো কাজ হয়নি তাতে। এরপর থেকেই মূলত মিশরের হুসনি মুবারক সাদ্দামের ওপর ভরসা হারান।

বিশ্বশান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা রক্ষার্থে ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম তা বাস্তবায়ন করে। বাজেয়াপ্ত করা হলো যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ইরাকের সকল সম্পদ। যুক্তরাষ্ট্রের অনুসরণে ইউরোপও ইরাকের সাথে আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। তবে অর্থনৈতিক লোকসানের কারণ দেখিয়ে এই অবরোধে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানাল আরব দেশ জর্ডান। দেশটির সব তেল আসত ইরাক আর কুয়েত থেকে। ফলে আমেরিকার সাথে তাল মেলালে ইরাকের

সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের লস হবে ৬৫ মিলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে আড়াই বিলিয়ন ডলারের মতো ক্ষতি হতো; যদি ঘুণাক্ষরেও এই অবরোধে নাক ডোবাত জর্ডান।

বাদশাহ ফাহাদ সৌদি টেলিভিশনে বিদেশি সেনা আসার ঘোষণা দিয়ে জানালেন—

> 'এসব সেনা ভাতৃপ্রতীম (মুসলিম) ও বন্ধুপ্রতীম (মার্কিন+ইউরোপ) দেশ থেকে এসেছে। তারা অস্থায়ী। মহড়ায় অংশ নিতে এবং সৌদি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতেই তারা এসেছে। সৌদি সরকার যখন মনে করবে তাদের আর প্রয়োজন নেই, তখন সবাই চলে যাবে।'

আরব লীগ ও ওআইসিতে ইরাকি আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে রেজুলেশন পাস হয়েছিল। তবে ওআইসির রেজুলেশন পাসের পক্ষে ভোট দেয়নি জর্ডান, সুদান, মৌরিতানিয়া, পিএলও ও ইয়েমেন। লিবিয়া ও জিবুতির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অংশগ্রহণই করেননি। আর বাহরাইন, আরব আমিরাত, কাতার, ওমান প্রথমদিকে ফোর্স নিয়ে যুদ্ধে যায়নি; তাদের সেনাবাহিনী আকারে ছোটো সেই অজুহাতে।

নিরাপত্তা পরিষদের ৬৭৮ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী, শক্তি প্রয়োগ করার কর্তৃত্ব পায় কোয়ালিশন বাহিনী। ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে শুরু হয় 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম'; চলে টানা ৩৮ দিন ধরে। জাতিসংঘের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা উত্তীর্ণ হলে ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাতে তারা অভিযানে নামে। কোয়ালিশন বাহিনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল কুয়েত অভিমুখে ইরাকি বাহিনীর রসদ সরবরাহ বন্ধ করা, এরপর বিমান প্রতিরক্ষা এবং রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের কারখানা ধ্বংস করে দেওয়া।

# উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা

ইরানের সাথে আট বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে নতুন আরেকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া স্বভাবতই কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না। ইরাকের উচিত ছিল ভঙ্গুর অর্থনীতি আর ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো জোড়াতালি দিয়ে যুদ্ধপরবর্তী দুর্যোগ সামলানোর ঢাল হিসেবে প্রস্তুত করা। কিন্তু ইরাক সেটা করতে গিয়ে বরং আরেকটি অবাঞ্ছিত যুদ্ধ ডেকে আনে। অস্থিরমতি শাসক সাদ্দাম তো বটেই, যুক্তরাষ্ট্রও এর দায় এড়াতে পারে না। মূলত দুটো কারণ আমেরিকাকে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বাধাতে প্রলুব্ধ করেছে। প্রথমত, আরব দেশসমূহে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিস্তার ঠেকানো। আর দ্বিতীয়ত, অস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণ। তাই সাদ্দামকে ইরানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য যা যা করা দরকার, তার সবই করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সাদ্দাম প্রশাসনকে বানোয়াট সব তথ্য আর আশ্বাস দিয়ে ফাঁদে ফেলা হয়।

সেই ফাঁদে পা দিয়ে একেবারেই গুম হয়ে যায় ইরাকের সুস্থ অর্থনীতি। আট বছরের এই অনর্থক যুদ্ধে ১০ লাখ তাজা প্রাণ ঝরে পড়ে, রুগ্‌ণ হয়ে পড়ে ইরাকের কৃষি ও শিল্পখাত। ভয়াবহ ঋণের জালে জড়িয়ে গেল তেল বেচে সমৃদ্ধ হওয়া ইরাক। যুদ্ধ শেষে সরকারি হিসেবে দেখা গেল—কুয়েত, সৌদি আরব, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশের কাছে ইরাকের রাষ্ট্রীয় দেনার অঙ্ক সাকুল্যে ৫৬ বিলিয়ন ডলার! এ ছাড়াও অল্পবিস্তর ঋণ ছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার কিছু ব্যাংকে। ধারণা করা হচ্ছিল, ইরাকি তেল থেকেই পুরো ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব; কিন্তু বাস্তবে তেমনটা একদমই ঘটেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পর ফ্রান্স ছিল ইরাকের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী। ইরাক তার পরমাণু প্রকল্পও সমৃদ্ধ করছিল ফরাসি সহায়তায়। সেই প্রকল্প অবশ্য বেশিদূর এগোতে দেয়নি ইজরাইল। ইরাক-ইরান যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরেই

ইজরাইলি বিমান উড়ে এসে সাদ্দামের 'ওসিরাক' প্রজেক্ট ভন্ডুল করে দিয়ে যায়। ইরাকের পরমাণু শক্তিধর হওয়ার উচ্চাশা মাটি চাপা পড়ে সেখানেই। এটা ছিল কোনো পারমাণবিক স্থাপনার ওপর চালানো পৃথিবীর প্রথম আগাম হামলা।

ইজরাইল বলে আসছিল, ইরাকের পরমাণু কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য বোমা তৈরি এবং ইহুদি দমন। ইজরাইলের এই ধারণার কারণ ছিল বাথ পার্টির ফিলিস্তিনপন্থি পলিসি। সাদ্দাম ছিলেন ইজরাইলের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক। ফলে একগুঁয়ে সাদ্দামের হাতে পরমাণু বোমা থাকা মানেই যেকোনো সময় তা ইজরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা মজুত থাকা। অবশ্য ইরাক পরবর্তী সময়ে বারবার তার অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছে। তাদের তরফে বলা হয়েছে—ওই স্থাপনাটি ছিল একটি পারমাণবিক চুল্লি মাত্র। পরমাণু অস্ত্র তৈরির কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না। ইরাকের কর্মকর্তারা বলতে থাকেন; বরং ইজরাইলের হামলার পরই তাদের মধ্যে এ আক্রমণের জবাব হিসেবে পরমাণু বোমা বানানোর চিন্তা শুরু হয়। তবে সেই প্রজেক্টও শেষতক আলোর মুখ দেখেনি।

বাইরের রাষ্ট্রে কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ড কিংবা বড়ো অপারেশনের জন্য ইজরাইলকে মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিতে হয়। তবে চূড়ান্ত অনুমতি দেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। প্রধানমন্ত্রীর সবুজ সংকেত পেয়েই ইরাকের পরমাণু স্থাপনায় হামলার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী। প্রথমে অভিযানের নাম ঠিক করা হয়—'এমিউনিশন হিল'। তবে প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন তাতে পরিবর্তন আনেন, তার পরামর্শে পরিবর্তন আনা হয় মূল পরিকল্পনাতেও। আক্রমণ অভিযানের নতুন নাম দেওয়া হয়—'অপারেশন অপেরা'। কেউ কেউ একে 'অপারেশন ব্যাবিলন' নামেও ডাকে।

৭ জুন হামলার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। দিনটি ছিল রোববার। এই দিন কেন বেছে নেওয়া হলো? দিনটি মাথায় রাখা হয়েছে ইরাকের পরমাণু স্থাপনাতে কাজ করা ফরাসিদের আক্রমণের বাইরে রাখতে। স্থাপনাটি ফরাসি কারিগরি সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয়েছিল, অনেক ফরাসি এক্সপার্ট কাজ করতেন সেখানে। পশ্চিমা দেশগুলোতে রোববার হলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। কাজেই এদিন ইরাকের পরমাণু প্রজেক্টে কাজ করা ফরাসি বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা ও টেকনিশিয়ানরা কর্মস্থলে থাকবেন না। ফলে ফরাসিদের প্রাণহানিরও কোনো আশঙ্কা নেই।

ইজরাইলের যে সামরিক ঘাঁটি থেকে বিমান আক্রমণের পরিকল্পনা হয়, তা থেকে ওসিরাক প্রকল্প এলাকার দূরত্ব ছিল প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। ১৯৮১ সালের ৭ জুন বিকেলে সিনাই উপদ্বীপের একটি বিমানঘাঁটি থেকে চারজোড়া F-16 যুদ্ধবিমান যাত্রা শুরু করে। তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধে মিশরের কাছ থেকে সিনাই দখলে নিয়েছিল ইজরাইল। ক্যাম্পডেভিড চুক্তির আগ পর্যন্ত তারা সেটা ছেড়ে যায়নি। বিমানগুলো আকাবা উপসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সৌদি-জর্ডান সীমান্ত অতিক্রম করে।

সরাসরি আক্রমণে অংশ নেওয়া বিমানগুলোকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পাঠানো হয় ছয়টি F-15 ইগল বিমান। সৌদি আরব ও জর্ডানের আকাশসীমা অতিক্রম করে ফাইটারগুলো ইরাক সীমান্তে এসে পৌঁছায়। এরপর আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে যায় বিমানগুলো। F-16 ফাইটারগুলোর সাথে দুটি F-15 ফাইটার প্রহরী হিসেবে পরমাণু চুল্লির দিকে এগোতে থাকে। বাকি F-15 ফাইটারগুলো ইরাকের আকাশে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়তে থাকে, যেন সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে যায় ইরাকি প্রতিরক্ষাবাহিনী। আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাওয়া দলটি ইরাকের রাডারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ভূমি থেকে মাত্র ৩০ মিটার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। এতে সফলও হয় তারা। ওসিরাক প্রকল্প এলাকায় পৌঁছানোর পর প্রায় ১২০০ মিটার উচ্চতা থেকে F-16 ফাইটারগুলো চুল্লিকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। কয়েক মিনিট ধরে চলে আক্রমণ। অপারেশন সাকসেসফুল করে কোনোরকম ক্ষতি ছাড়াই নিরাপদে ফিরতে সক্ষম হয় সবগুলো বিমান। এই আকস্মিক আক্রমণে ১০ জন ইরাকি সৈন্য ও একজন ফরাসি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। হামলার নিন্দা জানায় ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। আর লোকদেখানো প্রতিক্রিয়া হিসেবে কয়েক মাস ইজরাইলের কাছে F-16 বিমান সরবরাহ বন্ধ রাখে যুক্তরাষ্ট্র।

ইরান-ইরাক যুদ্ধপরবর্তী সময়ে পশ্চিমাদের মূল উদ্দেশ্যে ছিল সাদ্দাম হোসনেকে একটা ফাঁদের মধ্যে ফেলে দেওয়া, যাতে সেখান থেকে তার বের হওয়ার কোনো সুযোগই না থাকে। আর সামরিক হস্তক্ষেপ করে বিশ্ববাজারে তেল সরবরাহ নিরাপদ করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। ১৯৮৯ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্র-ইরাক বিজনেস ফোরামের একটি দলকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। এই দলে ছিলেন কিসিঞ্জারের সহকারী এলান স্টোগা, ব্যাংকার্স ট্রাস্ট, মবিল ওয়েল ও অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম

ও আরও অন্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রতিনিধিরা। ইরাক-ইরান যুদ্ধপরবর্তী ইরাকের অর্থনীতি সাজাতে তাদের পরার্মশ নিতে চেয়েছিলেন সাদ্দাম। বিশেষত তিনি কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের একটা সুদূরপ্রসারী প্ল্যান চাচ্ছিলেন। সে সময় প্রায় এক বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের মার্কিন পণ্য আমদানি করত ইরাক। নিজ দেশের উন্নয়নে ইরাক পেট্রো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, এগ্রিকালচার ফার্টিলাইজার প্লান্টস, একটি আরয়ন অ্যান্ড স্টিল প্ল্যান্টস এবং অটো এসেম্বল প্ল্যান্টস-এর প্রস্তাব দিয়েছিল মার্কিন বিনিয়োগকারীদের কাছে। মার্কিনিরা সাদ্দামকে পরামর্শ দিলো, ইরাকের তেল শিল্প ব্যক্তিখাতে দেওয়াই ভালো। যুক্তরাষ্ট্র মনে করত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পর সবচেয়ে বেশি তেলের মজুত ইরাকেরই আছে।

ভবিষ্যতে ঋণের বিপরীতে তেল সম্পদ ছাড়তে সম্মত হয়নি ইরাক। অপরদিকে ইরাক-ইরান যুদ্ধকে প্রলম্বিত করে অস্ত্র ব্যাবসা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের টালবাহানা সাদ্দাম পছন্দ করেননি। তিনি আরবদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে ইউরোপ, জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক গড়তে। ৯০-এর ২৭ জুলাই বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস জানাল, ইরাক-কুয়েতের উত্তেজনায় কোনো পক্ষকেই সমর্থন দেবে না তারা। সপ্তাহ না পেরোতেই কুয়েত সিটি দখল করে নিলেন সাদ্দাম।

পশ্চিমের পক্ষ থেকে আরবদের বোঝানো হলো, ইরাকের ওপর অবরোধ আরোপ করার এখনই সময় এবং কুয়েতকে মুক্ত করতে মার্কিন সেনা পাঠানোর বিকল্প নেই। প্রকাশ্যে বুশের যুদ্ধ-পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেন সৌদি আরবে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস একিন্স। সৌদি আরব রক্ষায় প্রেসিডেন্ট বুশের সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্তের কয়েকদিন পরই সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখে *লস এঞ্জেলেস টাইমস*-এ একটি নিবন্ধ লিখলেন তিনি। অভিযোগ আনলেন—সৌদি বাদশাহ ফাহাদকে প্ররোচিত করছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী চেনি। সৌদি রাজপরিবারের মধ্যে যারা মার্কিন সেনা আগমনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের একজন হলেন তৎকালীন যুবরাজ (পরবর্তী সময়ে বাদশাহ) আবদুল্লাহ। রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ আরও একজন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি আর কেউ নন, পশ্চিমা দুনিয়ায় বহুল পরিচিত ও বিতর্কিত চরিত্র—ওসামা বিন লাদেন। যুদ্ধ শেষ হলো। আর তার ঠিক পরপরই কুয়েত, সৌদি আরব, জার্মানি ও জাপানের কাছ থেকে অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মের খরচ হিসেবে সাড়ে ৫৪ বিলিয়ন ডলার দাবি করে বসল যুক্তরাষ্ট্র।

# কুর্দি সংকট

> 'হঠাৎ আমি ধোঁয়া দেখলাম। হলদাটে-সাদা ধোঁয়া। কীটনাশক থেকে যে ধরনের দুর্গন্ধ আসে, সে রকম একটা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিলো। তেতো তেতো স্বাদ। চোখের সামনেই মা-বাবা আর ভাইকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম। একদম মরার মতোই পড়ে থাকল তারা। আমি তাদের শরীরের চামড়ার দিকে তাকালাম; কালো দেখাচ্ছে। ভয়ে চিৎকার শুরু করলাম। বুঝতে পারছিলাম না আমার ঠিক কী করা উচিত। তাদের সবারই নাক-মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল। আমি মা, বাবা, ভাইকে ধরতে চাইলাম; কিন্তু তারা তা হতে দিলো না, উলটো কান্না জুড়ে দিলো।'

এভাবেই স্মৃতিচারণ করছে ইরাকি কুর্দি নারী আজিজা। সেই দিনটির কথা হুবহু মনে পড়ছে তার, যেদিন অনেকগুলো জীবনের চিরবিদায় দেখেছিল সে। আজিজা যখন ৮-৯ বছরের শিশু, উত্তর ইরাকে সে নিজ চোখে দেখেছে যুদ্ধের ভয়াবহতা। কমপক্ষে দুটি ফ্রন্টে তখন লড়তে হয়েছে ইরাকি বাহিনীকে। একদিকে ইরানের সাথে কয়েক বছর ধরে চলা যুদ্ধ, তার সাথে শুরু হওয়া কুর্দি বিদ্রোহ।

একদিন আজিজার গ্রামে উড়ে এলো যুদ্ধবিমান। আকাশ থেকে ছোড়া হলো রাসায়নিক বোমা। সেদিনের গ্যাস হামলায় এতিম হয়ে আজিজার মতো অনেকেই ছুটেছে নিরাপদ আশ্রয়ে। এদের কেউ উত্তরে তুরস্কের দিকে ছুটেছে, কারও ঠাঁই মিলেছে পুবের দেশ ইরানে। আর যারা কোথাও যেতে পারেনি, সীমান্তের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে একটু নিরাপদ পানি আর খাদ্যের জন্য। গভীর অরণ্যে লুকিয়ে প্রচণ্ড শীতের সাথে লড়াই করে টিকে থেকেছে কুর্দিদের আরেকটা অংশ।

মধ্যপ্রাচ্যের কুর্দি জনগোষ্ঠী স্বাধীন হতে চেয়েছে অনেক আগে থেকেই। কিন্তু বাস্তবতার মুখে কখনো কখনো তাদের তুষ্ট থাকতে চেয়েছে স্বায়ত্তশাসন নিয়ে। বারবার তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বিভক্ত করা হয়েছে পদ-পদবির টোপ দিয়ে। তবে প্রতিবারই মূলত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তারা। হোক সে ব্রিটিশ, অটোমান, পারসিয়ান কিংবা আরব; কথা রাখেনি কেউ-ই।

ইরাকের হাশেমিরা দেশ শাসন করছিল ব্রিটিশদের প্রেসক্রিপশন মেনে। সেটা করতে একরকম বাধ্যই ছিল তারা। কারণ, এরকমই সমঝোতা হয়েছিল দুই পক্ষের মধ্যে, ছিল লিখিত চুক্তিও। কিন্তু ব্রিটিশদের কথায় শক্ত হাতে দেশ চালাতে গিয়ে গণমানুষের কাছে রাজপরিবারের গ্রহণযোগ্যতা যে তলানিতে এসে ঠেকেছে, হাশেমিরা তার খবর রাখেনি। হয়তো রাখার প্রয়োজনই মনে করেনি। কারণ, তামাম দুনিয়ার ক্ষমতাসীনদের চরিত্র প্রায় এ রকমই। ক্ষমতার সামনে অনেক কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। অবশ্য অন্য কর্তৃত্ববাদীদের মতোই এর পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল তাদের।

শাসক অজনপ্রিয় হয়ে পড়লে তার সুযোগ নেয় সামরিক বাহিনী। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ধোঁয়া তুলে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যেন তখন পবিত্র দায়িত্ব হয়ে যায়! ইরাকেও তা-ই হলো। হাশেমিদের গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলে ১৯৫৮ সালে ইরাকের সর্বোচ্চ নেতার পদে আসীন হলেন ব্রিগেডিয়ার কাসিম। নারীর ছদ্মবেশে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন রাজপরিবারের অনুগত প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নুরি পাশা আল সৈয়দ। হত্যা করা হলো তাকেও। হাশেমি রাজশাসনের ওপর ইরাকিরা এতটাই ক্ষুব্ধ ছিল যে, এমন নৃশংস সেনা অভ্যুত্থানেও বিন্দুমাত্র ব্যথিত হয়নি তারা; বরং কবর থেকে তুলে এনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল পতিত প্রধানমন্ত্রীর লাশের ওপর!

কুর্দিরা মেসোপটেমিয়ান সমতল ভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। পাশাপাশি চার মুসলিম দেশ ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কের সীমান্ত লাগোয়া ৭৪ হাজার বর্গমাইলেরও বেশি পাহাড়ি এলাকাজুড়ে তাদের বসবাস। আয়তনে সেটা বাংলাদেশের চাইতে ১৮ হাজার বর্গমাইল বড়ো। কুর্দিদের আরেকটা অংশ বাস করে তুরস্কের প্রতিবেশী দেশ, সাবেক রুশ প্রজাতন্ত্র আর্মেনিয়াতে। আর্মেনিয়ার কুর্দিদের হিসেবে নিলে পৃথিবীতে তাদের মোট

সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে চার কোটি। মানে সংখ্যা ও অধ্যুষিত অঞ্চল বিবেচনায় একটা রাষ্ট্র তাদের পক্ষে অনায়াসেই গঠন করা সম্ভব।

কুর্দি জনগোষ্ঠী নিয়ে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নেই। তারা মনে করেন, কুর্দি একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী। মানে ইসলাম যে রকম একটি ধর্ম, কুর্দিও তেমনই। মূলত কুর্দি একটা জাতিগোষ্ঠী। আর তাদের বেশিরভাগই সুন্নি মুসলমান। বাকিরা শিয়া, অ্যালেভিজম, ইয়াদিজম, ইয়ারসানিজমসহ অন্যান্য ধর্মের। কুর্দিদের মধ্যে ইসলামিস্ট যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সেক্যুলার এবং জাতীয়তাবাদীও। ইরাকের দুই বিখ্যাত নদী ফোরাত আর দজলার উৎপত্তি কুর্দি অঞ্চলের পাহাড়ে। ঘন অরণ্য আর বৃষ্টিবহুল এই পাহাড় ছাড়া কুর্দিদের আর কোনো বন্ধু নেই। যারাই সুযোগ পেয়েছে, তারাই তাদের পিঠে ছুরি চালিয়েছে, বারবার আশ্বাস দিয়ে ঠকিয়েছে। নির্যাতন থেকে পালিয়ে বাঁচতে কুর্দিদের যেতে হয়েছে আরও গভীর অরণ্যে। স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের সহযোগিতা চেয়ে কয়েকবারই তারা বিদ্রোহ করেছে। প্রতিবারই সেই বিদ্রোহ দমানো হয়েছে নিষ্ঠুর কায়দায়। ব্রিটিশরা এ অঞ্চলে আসার আগে অনেক দিন ধরেই কুর্দিদের একটা অংশ ছিল অটোমানদের অধীনে, আরেকটা অংশ ছিল পাশের পারস্য সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে। পারস্য সম্রাট শাহ ইসমাইল, তামাস্প-১ এবং শাহ আব্বাসের সময়ে গণহত্যা ও অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে কুর্দিদের ওপর।

অটোমান শাসনের শেষ দিকে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল কুর্দি জাতীয়তাবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে সই হওয়া এক চুক্তিতে (সেভরস/সেভ্রা চুক্তি) কুর্দিদের স্বাধীনতা দেওয়ার অঙ্গীকারও করা হয়েছিল। কিন্তু তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা সে চুক্তির প্রতি সম্মান দেখায়নি, ফলে কয়েকবছর বাদেই আরেকটি চুক্তি দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেল সেভরস চুক্তি। ১৯২৪ সালে অনুমোদন পাওয়া সেই চুক্তিটি পরিচিত লুজান চুক্তি নামে। কুর্দিদের কপাল পোড়ে—তাদের আবাসস্থল যখন মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্টি হওয়া দেশগুলোর মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। যেখানে কুর্দিদের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার মতো সব উপাদানই ছিল, কিন্তু নতুন চুক্তির কারণে ধপ করে নিভে গেল সে সম্ভাবনা। প্রতিটি দেশেই তারা হয়ে গেল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। লুজান চুক্তির মাধ্যমে তুরস্কের মূল ভূখণ্ডের সীমানাও নির্ধারিত হলো; কিন্তু বাদ পড়ে গেল কুর্দিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে

কুর্দিরা একই রকম না হলেও তাদের কোনো স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গি নেই। তারা যে ভাষায় কথা বলে, তা অনেকটা ফার্সির মতো।

তুরস্কের ভেতরে বসবাস করা কুর্দি আর সরকারি সেনাদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের ইতিহাস অনেক পুরোনো। দেশটির জনসংখ্যার ১৫ থেকে ২০ ভাগই জাতিগতভাবে কুর্দি। কয়েক প্রজন্ম ধরে কুর্দিদের বিষয়ে কঠোর নীতি অনুসরণ করে আসছে তুরস্ক। এর অংশ হিসেবে কুর্দি নাম, ভাষা এবং পোশাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি অস্বীকার করা হয়েছে কুর্দিদের স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচয়। একসময় তুরস্কে কুর্দিদের বলা হতো 'পাহাড়ি তুর্কি'। অবশ্য এসব নিষেধাজ্ঞার অনেক কিছুই এখন শিথিল।

আশির দশকে আবদুল্লাহ ওচালান নামের এক কুর্দি নেতার হাত ধরে তুরস্কে কুর্দি বিদ্রোহের সূচনা হয়। তাদের প্রধান দাবি ছিল তুরস্কের মধ্য থেকেই স্বাধীন আরেকটি কুর্দি রাষ্ট্র গঠন। তুরস্ক তা মানেনি। এরই জের ধরে শুরু হয় অসহযোগিতা ও সশস্ত্র সংঘাত। এই সংঘাতে ৪০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়, ঘর-বাড়ি হারায় লক্ষাধিক কুর্দি। প্রতিবেশী দেশ সিরিয়ার সমর্থন নিয়ে পিকেকে গঠন করেন আবদুল্লাহ। সদস্যদের বেশিরভাগই তখন ছাত্র। দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক ও উত্তর ইরাকের পাহাড়ি এলাকায় ছিল তাদের তৎপরতা।

শক্তিশালী তুরস্কের হুমকির মুখে একসময় সিরিয়া হাল ছেড়ে দেয়। আবদুল্লাহ ওচালান সিরিয়া থেকে বেরিয়ে যান রাশিয়াতে। রাশিয়াও ওচালানকে রাখতে রাজি হয়নি। এরপর তিনি পাড়ি জমান গ্রিসে। কিন্তু গ্রিসও আশ্রয় দেয়নি তাকে। তুর্কিদের ঐতিহাসিক শত্রু গ্রিসের কাছে আশ্রয় না পেয়ে ইতালি চলে যান কুর্দি বিদ্রোহের নায়ক। তুরস্কের অনুরোধে ইতালি তাকে গ্রেফতার করলেও দেশটিতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকায় হস্তান্তর করা হয়নি। মুক্তি পেয়ে ওচালান পালিয়ে যান আফ্রিকায়; ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত গা ঢাকা দেন কেনিয়ার গ্রিক দূতাবাসে। কিন্তু বেশিদিন আত্মগোপনে থাকতে পারেননি এই কুর্দি নেতা। আমেরিকা ও মোসাদের গোয়েন্দারা শিগগিরই আবদুল্লাহর অবস্থান জেনে যায়।

আবদুল্লাহর পালিয়ে বেড়ানোর ঘটনাগুলো যখন ঘটছিল, তখন আমেরিকা, ইজরাইল আর তুরস্কের মধ্যে ছিল গলায় গলায় ভাব। কেনিয়ার নাইরোবিতে

মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার পর, কথিত জঙ্গি-সন্ত্রাস ঠেকাতে আফ্রিকাজুড়ে নেটওয়ার্ক বাড়ায় সিআইএ-মোসাদ। এরপর আর গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়নি ওচালানের পক্ষে। ১৯৯৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তুর্কি এজেন্টরা গ্রিক দূতাবাস থেকে নাইরোবি বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার সময় ওচালানকে ধরে ফেলে।

মার্ক্সবাদী পিকেকে চেয়েছিল সব কুর্দিকে নিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে। আর তা করতে গেলে তুরস্ক, ইরাক, ইরান, সিরিয়া—প্রতিটি দেশকেই কুর্দি অধ্যুষিত এলাকাগুলোর ওপর থেকে দাবি ছেড়ে দিতে হতো। কিন্তু কোনো দেশই তার ভূখণ্ড হারাতে রাজি নয়; এমনকি খোদ ইরাকের কুর্দিরাও সায় দেয়নি তাতে। তুরস্কবিরোধী কার্যক্রমে সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে ইরাকের কুর্দিরা ছিল অনেক বেশি সতর্ক ও দ্বিধাবিভক্ত। ইরাকি কুর্দিদের বড়ো একটি অংশের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই মাসুদ বারজানির দলের সাথে পিকেকের (কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি) রাজনৈতিক মতপার্থক্যও এর আরেক কারণ। মাসুদের কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি পিকেকের উদ্দেশ্যে নিয়ে শুরু থেকেই সন্দিহান ছিল। তাই মাসুদের অনুগত ইরাকি কুর্দিরা দেশের ভেতর পিকেকের ঘাঁটি অনুমোদন করেনি, যেখান থেকে তুরস্কে আক্রমণ করা হতে পারে। মার্ক্সবাদকেও প্রশ্রয় দিতে চায়নি তারা। প্রয়োজনে কেবল ইরাকের দখলে থাকা কুর্দিস্তান নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার সুপ্ত বাসনা ছিল মাসুদের। সাদ্দামের পতনের পর ২০০৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাসুদ বারজানি।

এবার একটু অতীতে ফেরা যাক। ব্রিগেডিয়ার আবদুল করিম কাসিম ইরাকের ক্ষমতায় আসার পর চেয়েছিলেন কুর্দি সমস্যা মিটিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট শাসন কায়েম করতে। যেখানে কুর্দিরা কখনোই তার পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কুর্দিদের নেতৃত্ব দিতেন মাসুদের বাবা মোল্লা মুস্তফা বারজানি। নির্বাসিত মুস্তফাকে দেশে ফেরার আমন্ত্রণ জানালেন কাসিম। কাসিমের কথা ফেলেননি মুস্তফা, দেশে ফিরে এলেন দ্রুতই। সরকারের তরফ থেকে তাকে অর্থ সহায়তা দেওয়া হলো, কুর্দি এলাকার শৃঙ্খলা রক্ষায় তার বাহিনীর হাতে অস্ত্রও তুলে দিলো কাসিম সরকার। এই মৈত্রী টিকেছিল ৬১ সাল পর্যন্ত। তার কিছু বছর বাদে আরেক দফা অভ্যুত্থান ঘটল ইরাকে। কাসিমের জায়গায় বাথ পার্টি ক্ষমতায় এলে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করল কুর্দিরা। আবারও সামনে এসে দাঁড়াল কুর্দি-আরব সংঘাতের প্রবল সম্ভাবনা।

কুর্দি নেতা মাসুদ বারজানি। ছবি : *সিএনএন*

বাথপার্টিও দীর্ঘদিন কুর্দি সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায়নি। একটি শান্তিপূর্ণ ও অহিংস সমাধানকল্পে ১৯৭০ সালের ১১ মার্চ ১৫ দফার একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে ইরাক সরকার। বলা হয়—আগামী চার বছরের মধ্যে কুর্দি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। সেইসাথে কুর্দি ভাষাকে মেনে নেওয়া হয় অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ হিসেবে। সংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন পদে বসানো হয় কুর্দিদের। সরকারে কুর্দি ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ সৃষ্টি করা হয়, মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাদের। কুর্দি পেশমার্গা যোদ্ধাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়, মুক্তি দেওয়া হয় রাজবন্দিদের। সরকার কুর্দি এলাকা পুনর্গঠনের আশ্বাস দেয়, বিপরীতে নিজেদের পেশমার্গা আর্মি ভেঙে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় কুর্দি নেতারা। তারা ভারী অস্ত্র ও রেডিও ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি সরকারকে দিয়ে দিতে রাজি হয়। বাথ পার্টি কুর্দি অধ্যুষিত এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদে আংশিক অধিকার এবং অভ্যন্তরীণ বিষয় দেখভালের দায়িত্বও অর্পণ করে কুর্দিদের ওপর। কেবল প্রতিরক্ষা আর পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়াদি কেন্দ্রীয় বাথ সরকারের হাতে থাকে। এসবের মধ্য দিয়ে সরকার মূলত কুর্দিদের রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকার করে নেয়। কিছু কিছু আশ্বাস পূরণ হয়, বাকিগুলোও ছিল পূরণ হওয়ার পথে; কিন্তু একটি ঘটনা সবকিছু এলোমেলো করে দেয়।

# কুর্দি নেতা মুস্তফা বারজানিকে হত্যার চেষ্টা

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মার্চ ম্যানিফেস্টো নিয়ে আলোচনার জন্য ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে আটজন ধর্মীয় নেতার একটি প্রতিনিধিদল এসেছেন মুস্তফা বারজানির সাথে দেখা করতে। তাদের নিয়ে নিজের সদর দপ্তরে বসেছেন বারজানি। হঠাৎ ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সভাকক্ষ। সাথে সাথেই মারা গেলেন দুজন ধর্মীয় নেতা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বারজানির দেহরক্ষীরা ফায়ার ওপেন করল। আরও পাঁচজন মারা পড়ল, জীবিত ধরা পড়ল একজন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল—বিস্ফোরণের বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না তাদের। তবে মিটিংয়ের আগে এক ইরাকি কর্মকর্তা তাদের হাতে একটা টেপ রেকর্ডার ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল—'বারজানির বক্তব্য রেকর্ড করতে হবে।' আর সেই রেকর্ডারটি অপারেট করতে গিয়েই ঘটেছে বিস্ফোরণ।
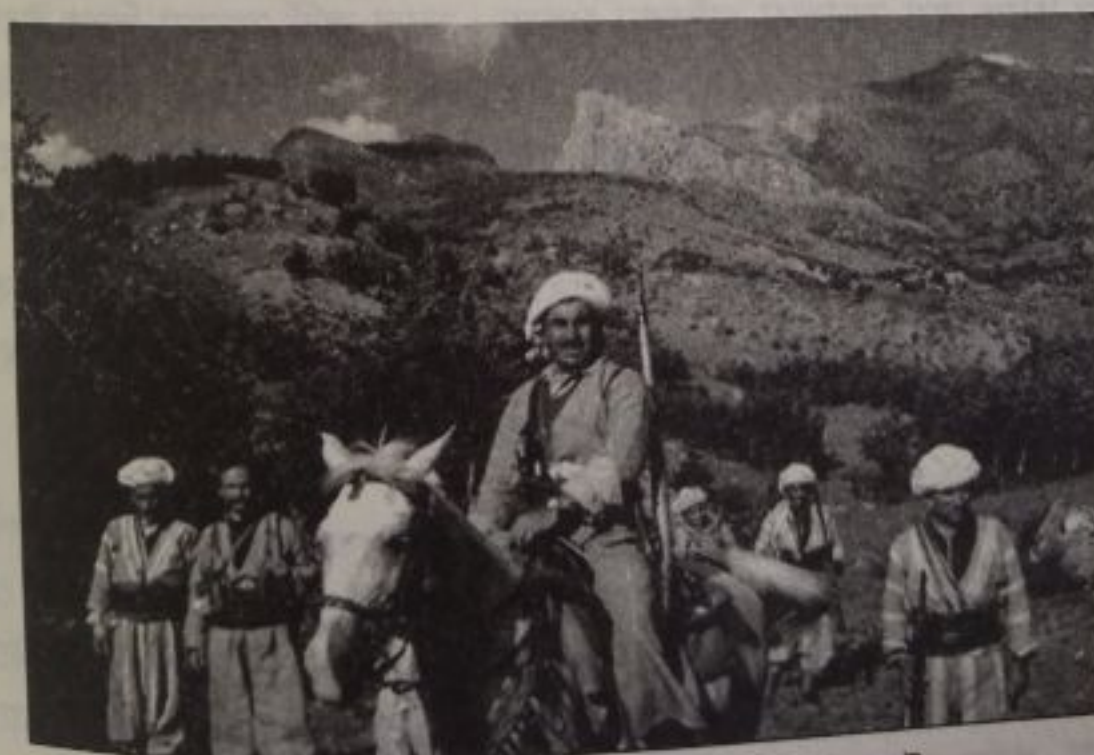
কুর্দি যোদ্ধাদের সাথে মুস্তফা বারজানি। ছবি : ইন্টারনেট

শীর্ষনেতাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই কুর্দিরা বাথ পার্টির ওপর বিশ্বাস হারাল। তাদের সন্দেহ ইরাকের তখনকার ডিফেক্টো লিডার সাদ্দাম হোসেনকে নিয়ে। অবশ্য এর যৌক্তিক কারণও ছিল। সাদ্দাম ছিল বাথ সরকারের ভেতর আরেক সরকার। কুর্দি ইস্যুতে তার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র, ইজরাইল আর ইরানের সমর্থন পেয়ে আসা মুস্তফা আর ছাড় দিতে চাইলেন না। সরকারের কাছে নতুন নতুন দাবি হাজির করল কুর্দিরা–তেল সমৃদ্ধ পুরো কিরকুককে কুর্দি এলাকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, নিজস্ব সামরিক বাহিনী চালানোর অধিকার দিতে হবে; এমনকি দিতে হবে বিদেশিদের সাথে যোগাযোগের অধিকারও। কিন্তু ইরাকের অর্থনীতির জোগান যেখান থেকে আসে সেই কিরকুক কী করে ছাড়বে সরকার? বারজানি হত্যাচেষ্টার পরের বছর সিআইএ-এর মাধ্যমে পরবর্তী তিন বছরের জন্য কুর্দিদের পক্ষে ১৬ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন।

১৯৭৪ সালে যখন সমঝোতা ব্যর্থ হলো, নিজেদের নিয়ন্ত্রিত কুর্দি এলাকায় ৭০-এর ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়ন করতে চাইল ইরাকের বাথিস্ট সরকার। তারা সংসদে প্রতিনিধি নিয়োগ করল এবং একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলও করা হলো প্রশাসনিক কাজের জন্য। যদিও এত সব উদ্যোগ কুর্দিদের সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ থেকে সরাতে পারেনি; কিন্তু প্রশিক্ষিত পেশাদার ইরাকি বাহিনীর সামনে মোল্লা মুস্তফার বাহিনী ছিল নিতান্তই দুর্বল। ঘাটতি পূরণে ইরানের শাহের কাছে অস্ত্র সহায়তা চাইলেন মুস্তফা। ফলে কুর্দি সমস্যা ঘিরে ইরানের সাথে একটা যুদ্ধাবস্থা তৈরি হলো ইরাকের। সে যাত্রায় আলজেরিয়ার মধ্যস্থতায় ১৯৭৫ সালের মার্চে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব হলো। কুর্দিদের সহযোগিতা না করার আশ্বাস দিলো ইরান। বিপরীতে শাত আল আরব জলপথ ঘিরে ইরানের কিছু দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়া হলো। এভাবে একটি অনিবার্য যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেল উপসাগরীয় এলাকা। কুর্দিরা অবশ্য ইরানের এই সমঝোতাকে দেখে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে।

কুর্দি এলাকাগুলোতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হালকা শিল্প ও ট্যুরিস্ট সেন্টার স্থাপন করতে থাকে ইরাক সরকার। কুর্দিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। বহু বছর ধরে বিদেশি শাসনের কবজায় থাকার কারণে কুর্দিদের মধ্যে যে গোত্রভিত্তিক ও সামন্তবাদী কাঠামো তৈরি হয়েছে, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে দুর্বল করে ফেলা হয় সেই কাঠামো। উন্নয়নের পাশাপাশি চলে

বিতর্কিত কর্মকাণ্ডও। হাজার হাজার কুর্দিকে বাপ-দাদার বসতভিটা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আরব অধ্যুষিত এলাকায় স্থানান্তর করা হয়।

কুর্দিরা নিজেরাও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। তবে মুস্তফা বারজানি জীবিত থাকাকালে কুর্দিদের মধ্যকার আন্তঃকোন্দল ততটা প্রকাশ্যে আসেনি। মুস্তফার মৃত্যুর পর এই বিভক্তি সর্বসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জালাল তালাবানি নামে অপর এক কুর্দি নেতা প্যাট্রিয়োটিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তান (পিইউকে) নামের একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তুললেন। ভাবলেন, মুস্তফার অনুপস্থিতিতে কুর্দি নেতৃত্বের পুরোটা হাত করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। আর এজন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু কথা রাখতে হয়, খানিকটা গুণগান করতে হয়, তাতে আর এমন অসুবিধা কী! কিন্তু মুস্তফার উত্তরাধিকারী মাসুদ কোনো রকম আপসরফায় গেলেন না। আগের মতোই স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অটল থাকলে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল তালাবানি গ্রুপ।

# বাথ পার্টি ও সাদ্দামের উত্থান

পৃথিবীতে অনেক বড়ো বড়ো অভ্যুত্থান হয়েছে কোনো রকম রক্তপাত কিংবা হাঙ্গামা ছাড়াই। ১৯৬৯ সালে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই লিবিয়ার ক্ষমতায় এসেছেন কর্নেল গাদ্দাফি। রাজা ইদ্রিসের অনুগত সেনাদের পক্ষ থেকে শক্ত কোনো প্রতিরোধ হয়নি, তাই খুব একটা কামান-বন্দুক দাগাতে হয়নি গাদ্দাফিকেও।

এ রকমই রক্তপাতহীন একটি অভ্যুত্থানের রেকর্ড আছে ইরাকের। ১৯৬৮ সালের ঘটনা। সেদিন ইরাক যা ঘটেছিল; না কাকপক্ষী টের পেয়েছিল, না অনুমান করতে পেরেছিল দেশটির জনগণ। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে প্রেসিডেন্ট টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে শুনলেন—'আপনি আর ক্ষমতায় নেই, প্রাসাদ ছাড়ুন! আমরা সব ঘেরাও করে রেখেছি।' যার ফোনে প্রেসিডেন্টের ঘুম ভাঙল, তিনি বাইরের কেউ নন; ক্ষমতার লোভে বিগড়ে যাওয়া তারই পোষা এক আর্মি অফিসার।

সিংহাসন খুবই কাঙ্ক্ষিত জিনিস। এখানে বসার ক্ষেত্রে ছেলে বাবার প্রতিদ্বন্দ্বী, বন্ধু বন্ধুর, কখনো-বা স্ত্রী তার স্বামীর শত্রু। এমনকি দাদির সাথে নাতনির কিংবা মামার সাথে ভাগনে দৈরথও দেখা গেছে ইতিহাসের কালচক্রে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রক্তের ভাই (ব্লাড ব্রাদার) জামুখা খুন হয়েছেন চেঙ্গিসের নির্দেশে। ছেলের কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহান। সম্রাট সাইরাস যুদ্ধ করেছেন তার নানার সাথে, অটোমান শাহজাদা মুস্তফা খুন হয়েছেন বাবা সুলেমানের জল্লাদদের হাতে। সুলতান আহমেদ খান কয়েকবারই বিদ্রোহের মুখে পড়েছেন দাদি সাফিয়ে সুলতানের অনুগত সেনাদের। সন্তানসহ অটোমান শাহজাদা বায়েজিদ খুন হয়েছেন আরেক ভাই শাহজাদা সেলিমের হাতে। এভাবেই ক্ষমতার অঙ্ক কাজ করেছে সারা পৃথিবীতে।

সেদিন বাগদাদের মানুষ ঘুম ভেঙে দেখে একনায়কতান্ত্রিক রেজিমের পতন হয়েছে, আর তাদের ওপর নাজিল হয়েছে নতুন এক নেতা। বিদ্রোহী অফিসারদের সেদিন একটি গুলিও ছুড়তে হয়নি। কেন কাউকে হত্যা করার প্রয়োজন হয়নি সেদিন? কারণ, যে কয়টা খুঁটির ওপর রেজিম টিকে ছিল, সব কয়টাই বিশ্বাসঘাতকতা করে যোগ দিয়েছিল অভ্যুত্থানকারীদের সাথে।

হাশেমি শাসন থেকে শুরু করে বাথ পার্টির পতন পর্যন্ত ইরাকে অসংখ্য অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছে। এক হাশেমিরাই মোকাবিলা করেছে অন্তত সাতটি ক্যু। শেষ দফায় তাদের কেউ বেঁচে থাকেনি। গোড়াসুদ্ধ উৎখাত হয়েছে রক্তাক্ত এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। সেই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন বিগ্রেডিয়ার কাসিম। অনেকে বলে থাকেন, এর পেছনে আসল নায়ক তিনি নন। কাসিমের ডান হাত আবদ আল সালাম আরিফই ছিলেন আসল কান্ডারি। ব্রিগেডিয়ার কাসিমকে তার জীবদ্দশায় ২১ বার খুনের চেষ্টা হয়েছে।

মিশর আর সিরিয়াকে নিয়ে নাসের যে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক গড়তে চেয়েছেন, তার পেছনে মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ ছিল। বিপরীতে ইরাক আর জর্ডানের হাশেমিরাও ঐক্য গড়ে তুলছিল নিজেদের মধ্যে। তাদের মিত্র হলো যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেন। ১৯৫৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নুরি পাশা আল সৈয়দ কমান্ডার আবদ আল সালাম আরিফকে নির্দেশ দিলেন ঐক্য প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সৈন্য নিয়ে জর্ডানের দিকে অগ্রসর হতে। সালাম মুভ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার বাহিনী জর্ডানের দিকে না গিয়ে চলে এসেছিল রাজধানী বাগদাদে। পৃথিবীর অন্যতম একটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থান পরিচালনা করে হাশেমিদের নিঃশেষ করে দিয়েছিল কাসিম-আরিফ জুটি।

অভ্যুত্থানপরবর্তী ইরাক নাসেরের জোটের দিকে যাবে কি যাবে না, এ নিয়ে বিবাদ দেখা দেয় ইরাকি জাতীয়তাবাদী কাসিম আর আরব-জাতীয়তাবাদী সালামের মধ্যে। ফলে হাশেমিদের বিরুদ্ধে প্রথম সফল অভ্যুত্থানের কয়েক বছর বাদে আরেকটি অভ্যুত্থান হয় ১৯৬৩ সালে। কাসিমকে কবরে পাঠিয়ে ক্ষমতায় আসেন সালাম। সাথে ছিল বাথ পার্টি। সালাম প্রেসিডেন্ট হন আর প্রধানমন্ত্রী করা হয় বাথিস্ট নেতা আহমেদ হাসান আল বকরকে। কিন্তু শিগগিরই পরস্পর বিরোধে জড়ায় বিপ্লবের পক্ষগুলো। বাথিস্টদের পুরোপুরি ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নেন সালাম।

১৯৬৬ সালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সালাম মারা গেলে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয় তার ভাই আবদ আল রহমান আরিফ। ততদিনে ইরাক বেশ উত্তপ্ত। বাথিস্টদের উৎপাত, কমিউনিস্টদের হাঙ্গামা—সবকিছু সামলে উঠে রাষ্ট্র পরিচালনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় অনভিজ্ঞ রহমান আরিফের পক্ষে। দুই ভাই মিলে এতদিনে যে রেজিম গড়ে তুলেছে, তার ভিত্তি ছিল চার কর্নেল। এরা হলেন সামরিক গোয়েন্দাপ্রধান আবদ আল রাজ্জাক নায়িফ, রিপাবলিকান গার্ডের কমান্ডার আবদ আল রহমান দাউদ ও সাইদুন গেইদান এবং বাগদাদ সেনানিবাসের প্রধান হামাদ শিহাব।

রহমান তার ভাইয়ের মতো লৌহমানব ছিলেন না। তার দুর্বলতা আর নমনীয়তার সুযোগে পুনরায় সংগঠিত হতে শুরু করে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা বাথিস্টরা। অনেক দিন ধরেই রেজিম উপড়ে ফেলার ছক কষে আসছিল তারা। ১৯৬৮-এর জুলাইয়ের এক ভোরে রহমান জেগে দেখেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাথিস্টরা ক্যু করেছে, তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদে নেই। একটা গুলিও ছুড়তে হয়নি এই অভ্যুত্থানে। কারণ, একটাই—আরিফ রেজিমের চার শক্ত খুঁটি (আর্মি অফিসার) বিশ্বাসঘাতকতা করে যোগ দিয়েছিল বাথিস্টদের সাথে। ফলে ৬৮-এর বিপ্লব পুরোপুরি বাথিস্টদের ছিল না। তাদের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদার হয় অতীত রেজিমের দুই অফিসার নায়িফ আর দাউদও। এই কোয়ালিশনে বাথিস্ট না হয়েও প্রধানমন্ত্রীর পদে অসীন হন নায়িফ। আর প্রেসিডেন্টের পদে বসেন বাথিস্ট নেতা আল বকর।

বিপ্লবের দুই সপ্তাহ পেরোয়নি তখনও। বাথিস্টরা দেখল, বিপ্লবী দুই নন-বাথিস্টকে না সরালে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করা যাচ্ছে না। তাই কূটচালে ইরাকি আর্মি মিশনের দায়িত্ব দিয়ে জর্ডান পাঠিয়ে দেওয়া হলো দাউদকে। এরপর অবসরের পরও আর দেশে ফিরতে পারেননি দাউদ। বন্দুকের নলের মুখে ইরাকের রাষ্ট্রদূত বানিয়ে মরক্কো পাঠিয়ে দেওয়া হয় নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নায়িফকেও। মূলত এটা ছিল তার জন্য একধরনের নির্বাসন। বছর দশেক বাদে সাদ্দাম ক্ষমতায় আরোহণের ঠিক আগের বছর লন্ডনে খুন হন নায়িফ।

১৯৬৮-এর মতোই প্রায় রক্তপাতহীন দুটি অভ্যুত্থান ঘটেছিল ৫২ ও ৫৪-তে, মিশরে। আগেই বলা হয়েছে, লিবিয়াতে গাদ্দাফির অভ্যুত্থানও প্রায় রক্তপাতহীন ছিল। তবে ইরাকের বাথ আর লিবিয়ার গাদ্দাফি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে ক্ষমতায়

এলেও নিজেদের শাসনামলকে বেশ রক্তাক্ত করেছে তারা। দুই রেজিমই বিরোধীদের শায়েস্তা করতে বেছে নিয়েছিল গুম, খুন আর প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার মতো নির্মম কৌশল। অবশ্য এই অত্যাচারেরও অবসান হয়েছে। তাদেরও বিদায় ঘণ্টা বেজেছে অত্যন্ত নির্দয় ও শোচনীয় অবস্থায়।

ইরাকের ৬৮-এর বিপ্লবের সাথে তুলনা করা যায় আফগানিস্তানের সরদার দাউদ খানবিরোধী অভ্যুত্থানকে। দুটোতেই কাছের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা অভ্যুত্থানের পথকে সহজ করে দিয়েছিল। তবে প্রথমটি রক্তপাতহীন হলেও দাউদ খানবিরোধী অভ্যুত্থান ছিল ভয়ংকর। যেসব সহযোগী আর্মি অফিসারকে নিয়ে বাদশাহ জহির শাহ-এর বিরুদ্ধে সফল অভ্যুত্থান করেছিলেন দাউদ, সেই সহযোগীরাই আবার চুরমার করে দিয়েছিল তার সাধের প্রাসাদ। সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন এই একনায়ক। ৬৮-এর বিপ্লবে বকর ইরাকের প্রেসিডেন্ট হলেও নেপথ্যে থেকে যিনি দেশ চালাতেন, তিনি আর কেউ নন, পদমর্যাদায় প্রেসিডেন্টের ডেপুটি—সাদ্দাম হোসেন।

মেসোপটেমিয়ার ছোট্ট শহর তিকরিত। ইসফাহান আর বাগদাদের মতো এখানেও গণহত্যার চিহ্ন ফেলে পশ্চিমে ধেয়ে গিয়েছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তৈমুর লং। টাইগ্রিসের তীরে গড়ে ওঠা এই তিকরিত সেসব শহরের একটি, যেখানে মাথার খুলি দিয়ে মিনার বানিয়েছিল তৈমুরের দল। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে রাজধানী বাগদাদ থেকে কয়েকশো মাইল উত্তরের এই ক্ষুদে শহরেই সাদ্দাম হোসেনের জন্ম। সাদ্দাম যখন পৃথিবীর আলো দেখেন, তখন ইরাকের মসনদে হাশেমি পরিবার। এককালে তারা মক্কা শাসন করেছে; কিন্তু ইরাকিদের সাথে কোনোদিন কোনো সম্পর্ক ছিল না এই পরিবারের।

সাদ্দামের বেড়ে ওঠা খুব সাধারণ পরিবারে। মামা খাইরুল্লাহ তালফার মাটির ঘরেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। সন্তান জন্মের আগেই মারা যান (কারও তথ্যমতে, তিনি নিরুদ্দেশ ছিলেন) ভূমিহীন বাবা হাসান আল মজিদ। স্বামীহারা মায়ের পক্ষে এই অনাথের ভরণপোষণ করা সম্ভব হয়নি। জন্মের অনতিকাল পরেই তার মায়ের বিয়ে হয়ে যায় এক চাচার সাথে। তিকরিত ছেড়ে মায়ের নতুন সংসারে চলে যান সাদ্দাম। গ্রামের পরিবেশ-পরিস্থিতি তার জীবনে হাহাকার বাড়িয়ে দেয়। পদে পদে শুরু হয় শোষণ, বঞ্চনা, অনাদর আর অবহেলা। কখনো তাকে পিতৃহীন অনাথ বলে উপহাস করা হতো, কখনো-বা চালানো

হতো শারীরিক নির্যাতন। আক্রমণ থেকে বাঁচতে একটা লোহার দণ্ড সাথে নিয়ে ঘুরতেন সব সময়। সৎ-পিতা হাসান ইবরাহিমও উপহাস কম করেননি তাকে নিয়ে। এই দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনই কি নিষ্ঠুর করে তুলেছিল সাদ্দামকে?

সাদ্দামের মামা খাইরুল্লাহ তালফা ছিলেন সেনাবাহিনীর অফিসার। সরকার বিরোধী তৎপরতার কারণে তাকে জেলে পাঠানো হয়। পাঁচ বছর কারাবাসের পর যখন ছাড়া পেলেন, অনাথ ভাগনে গিয়ে হাজির হলো তার আঙিনায়। মামাতো ভাই আদনানের সাথে সেখানেই বড়ো হতে থাকেন শিশু সাদ্দাম। এরপর মামার হাত ধরে রাজনীতিতে আসা। সেই হিসেবে মামাই তার প্রথম জীবনের রাজনৈতিক গুরু। ১৯৫৮ সালে সেনা অভ্যুত্থানের আগের বছর বাথ পার্টিতে যোগ দেন সাদ্দাম হোসেন।

আরব জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম আর স্যোশালিজমের মিশেলে তৈরি খিচুড়ি আইডিওলজির এক আজগুবি রাজনৈতিক দল হলো বাথ পার্টি। চল্লিশের দশকে সিরিয়ার দামেশকে দুজন স্কুলশিক্ষক মিলে কিম্ভূতকিমাকার এই পার্টির গোড়াপত্তন করেন। এদের একজন অর্থডক্স গ্রিক খ্রিষ্টান মাইকেল আফলাক, অপরজন সুন্নি মুসলিম সালাদিন আল বিতার। বাথিস্টরা বিশ্বাস করতেন—আরবদের আলাদা আলাদা রাষ্ট্র থাকার কোনো অর্থ নেই; বরং সাকুল্যে রাষ্ট্র থাকবে একটি। সব আরব ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করবেন সেখানে। আর সেই রাষ্ট্রের অবস্থান হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। যদিও সাম্রাজ্যবাদ তাড়ানোর ছুতোয় পরবর্তী সময়ে নিজেরাই একেকটা ধেড়ি ইঁদুরে পরিণত হয়েছিল বাথিস্টরা। বাথ শাসন কায়েম করতে পারা দুই দেশ—ইরাক ও সিরিয়াতেও আমরা এমনটা হতে দেখেছি। তাদের একেকজন শাসক ছিলেন চরম স্বৈরাচার। আবার এই বাথ আদর্শেও আন্তঃকোন্দল কম হয়নি। ফলে জন্ম নিয়েছে নিউ বাথ পার্টি নামে আরেকটা স্বতন্ত্র দল। ব্যাপারটা যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর চাইনিজ স্যোশালিজমের মধ্যকার মান-অভিমানের খেলা।

সিরিয়ার বাথপন্থি সিভিলিয়ান আর সামরিক নেতাদের কোন্দলে ১৯৬৬ সালে অভ্যুত্থানের মুখে বিভক্ত হয়ে পড়ে বাথ পার্টি। আফলাকদের হটিয়ে ফ্রন্টে চলে আসে সামরিক নেতা সালেহ জাদিদ আর হাফেজ আল আসাদরা। সিরিয়ার বাথ বেসামরিক মুক্ত হয়, যদিও ইরাকের ৬৮-এর অভ্যুত্থানে

সামরিক-বেসামরিক সবারই অংশগ্রহণ ছিল। সাদ্দাম নিজেও কোনো সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না কখনো।

সাদ্দামদের সামনে ইরাককে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ দুটোই ছিল। কিন্তু বাথিস্টরা চ্যালেঞ্জের পেছনে এতটাই ছুটেছেন যে, ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ এক ইরাক গড়ার সুযোগ তারা হাতছাড়া করে ফেলেছে অবলীলায়। হাশেমিদের মতো তারাও কুর্দিদের বহিরাগত আর অপ্রাসঙ্গিক ভেবেছেন, বৈষম্য আর বঞ্চনার ক্ষত তৈরি করে দূরে ঠেলে দিয়েছেন এই স্পর্শকাতর জনগোষ্ঠীকে। অথচ কুর্দিদের তেলেই ইরাকের সুন্নি জনপদ সমৃদ্ধ হয়েছে। অনেকটা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তানের মতোই যেন কুর্দিদের এই গল্প।

ইরাকের শীর্ষ বাথিস্ট নেতারা শিয়া, সুন্নি ও কুর্দি জনগোষ্ঠীর জন্য অভিন্ন ন্যায্য শাসন কায়েম করতে পারেননি। সাদ্দাম নিজেই ছিলেন এর মূল অন্তরায়। কুর্দি ও শিয়া ইস্যুতে রাষ্ট্রের বাইরেও আলাদা নীতি ছিল তার। সেই নীতি চাপাতে গিয়ে তিনি ইরাকের একতার সম্ভাবনা ধ্বংস করেছেন, আর নিজের রাস্তা পরিষ্কার করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বীদের একে একে সরিয়ে দিয়ে। ইরাকের ক্ষমতায় এসে তিনি যেমন অস্থিরতা আর আতঙ্ক ছড়িয়েছেন, পাশপাশি রাষ্ট্র ও দলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বসিয়েছেন আত্মীয়স্বজন আর কাছের লোকদের। মামা খাইরুল্লাহকে বাগদাদের মেয়র বানিয়েছেন, মামাতো ভাই আদনানকে করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। অবশ্য দুর্নীতি আর উচ্চাভিলাষের জন্য পদ খোয়াতে হয় খাইরুল্লাহকে। মামার হাতে গড়ে ওঠা বিজনেস সিন্ডিকেট সাদ্দাম সরাসরি ভেঙে দেন। বন্ধ করে দেওয়া হয় খাইরুল্লাহর ১৭টি কোম্পানি। এমনকি মামাতো ভাইকেও ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কেবল যে সরকারের ইমেজ রক্ষার জন্যই এসব করা হয়েছে তা নয়, এর মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিও কমিয়ে এনেছিলেন সাদ্দাম।

১৯৬৩ সালে প্রথম দফা সরকার উৎখাত করে ক্ষমতায় এসেছিল বাথ পার্টি। কিন্তু বেশিদিন সেই রেজিম টেকেনি। ১৯৬৮ সালে বাথ পার্টিকে আরেক দফা অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হয়। সেবার ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে বসেন সাদ্দাম। মূলত তখন থেকেই তিনি ইরাকের নেপথ্য শাসক। ১৯৭৯ সালের ১৬ জুলাই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদ আল হাসান আল বকর পদত্যাগ করলে (কিংবা পদত্যাগে বাধ্য হলে) ইরাকের ক্ষমতায় আসেন

তখনকার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। ইরাকের ইতিহাসে শুরু হয় সবচেয়ে নির্মম শাসনের যুগ। এক মুহূর্ত দম ফেলার অবকাশ ছিল না সাদ্দামের। ছিল না উদ্‌যাপনের কোনো সুযোগও। সাদ্দাম দেখেছেন, ইরাকের রাজনীতিতে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় তাড়া করেছে তাঁকে। নিজের ছায়াকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। মাথার মধ্যে শুধু একটাই চিন্তা—দলে ঘাপটি মেরে থাকা শত্রুদের হাত থেকে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা। আর এজন্য কিছু চরম ও নির্মম সিদ্ধান্ত নিতে হবে; কিন্তু পিছিয়ে আসা যাবে না কোনোমতেই। কারণ, ইরাকের যে রাজনৈতিক ইতিহাস, সামান্য ভুল কিংবা নীরবতায় ক্ষমতা এবং জীবন দুটোই হারাতে পারেন সাদ্দাম। ১৯৭৯ সালের ১৬ জুলাই ইরাকিরা টেলিভিশন অন করে দেখতে পায় প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিচ্ছেন—'আমি দেশ চালানোর মতো সুস্থতা অনুভব করছি না।' সেদিনই সাদ্দাম হন প্রেসিডেন্ট। তার ছয় দিন পরের এক ঘটনায় থমকে যায় ক্ষমতাসীন বাথ পার্টি, সেইসাথে পুরো দেশও।

# গোড়াতেই নিষ্ঠুরতা

২২ জুলাই, ১৯৭৯

ইরাকের ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির কয়েকশো নেতাকে ডেকে আনা হয়েছে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের কাছেই এক সম্মেলন কেন্দ্রে। সবকটা দরজা আটকিয়ে তাদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুরু হলো। বাইরে থেকে সম্মেলন কক্ষ ঘিরে রেখেছে একদল সশস্ত্র গোয়েন্দা। উপস্থিত বাথ সদস্যদের কাউকেই বৈঠকের কারণ জানানো হয়নি। কাজেই ঠিক কী ঘটতে চলেছে, সাদ্দামের অনুগত শীর্ষ কয়েকজন ছাড়া কারও পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না। সাদ্দামের সহযোগী 'পপুলার আর্মি' কমান্ডার তাহা ইয়াসিন রামাদান দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে ডায়াসে এসে দাঁড়ালেন। হলভর্তি মানুষের দিকে তাকিয়ে ইয়াসিন জানালেন—

> 'একটা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়েছে, দলের কিছু সিনিয়র ও প্রমিনেন্ট লিডার এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।'

সাদ্দামের নিষ্ঠুর শাসনের সহযোগী রামাদান যাদের 'কথিত ষড়যন্ত্রকারী' হিসেবে ঘোষণা দিতে চলেছেন, তারা তখন সম্মেলন কক্ষেই উপস্থিত। তিনি যখন জানালেন—ষড়যন্ত্রকারীরা এখানেই আছে, রীতিমতো একটা ঝড় বয়ে গেল হলরুমজুড়ে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল উপস্থিত বাথ নেতা-কর্মীদের মধ্যে। রামাদান তারপর আগে থেকেই কারারুদ্ধ মাসাদি নামের একজনকে সামনে নিয়ে এলেন। রামাদান মাসাদিকে নির্দেশ দিলেন—'ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে খুলে বলো সবাইকে।' মাসাদি জানালেন—১৯৭৫ সাল থেকে সিরিয়ার উসকানিতে তিনি বকর আর সাদ্দামকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য সেদিন মাসাদি মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন, মনে হচ্ছিল জীবনরক্ষার জন্য তিনি যেকোনো কিছু করতে রাজি। তিনি যে সত্য বলছেন,

সেটা তার আতঙ্কিত চেহারা দেখে একদমই মনে হয়নি। দীর্ঘ বর্ণনায় উঠে আসে, হাফেজ আল আসাদের হয়ে তারা সিরিয়া-ইরাক ইউনিয়ন গড়তে চেয়েছিলেন। মাসাদি আরও জানালেন—'এই প্লটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন রেভ্যুলেশনারি কমান্ড কাউন্সিল-আরসিসি মেম্বার মুহাম্মাদ আয়েশ হামাদ।' সাদ্দামকে এবার একটু মনোযোগী হতে দেখা গেল। আয়েশের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে সাদ্দাম বললেন—'আমি দেখেছি, আয়েশ আরসিসি মিটিংয়ে অদ্ভুত আচরণ করত। ঘৃণার চোখে তাকাত আমার দিকে।'

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম এবার ডায়াসে গেলেন। জানালেন—'নিজের সহযোগীদের দ্বারাই তিনি বিশ্বাসঘাতকার শিকার হয়েছেন।' ইরাকি নেতা আরও বললেন—'চক্রান্তকারীদের উচ্চাশা আকাশচুম্বী। তবে আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই যে, আমি নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নেব এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়ব।'

গানেম আবদ আল জলিল সৌদি নামে আরেকজনের নাম শোনা গেল সাদ্দামের কণ্ঠে। অভিযুক্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়েই কাঁদতে শুরু করলেন। পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে কান্না আড়াল করতে দেখা গেল তাকে। হাতে থাকা ভাঁজ করা একটি কাগজ থেকে অভিযুক্তদের নাম বলতে লাগলেন গানেম। তিনি একেকজনের নাম উল্লেখ করতে থাকলেন আর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ওই ব্যক্তিকে হল থেকে বের করে নিয়ে যেতে লাগল। এভাবে একজন একজন করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো ৬৬ জন রাজনীতিবিদকে। আরসিসির ২১ জনের মধ্যে ৫ জনেরই নাম ছিল অভিযুক্তদের তালিকায়। তারা হলেন—মাসাদি, গানেম, আয়েশ, আদনান হুসাইন আল হামাদানি ও মুহাম্মাদ মাহজুব মাহদি।

প্রচণ্ড উত্তেজনা আর আতঙ্কে কাঁপছিল পুরো সম্মেলন কক্ষ। হঠাৎ একজন দাঁড়িয়ে গেল। বজ্রমুষ্ঠি উত্তোলন করে বলে উঠল—'বাথ পার্টি জিন্দাবাদ! সাদ্দাম হুসাইন জিন্দাবাদ!' সেই স্লোগানে শামিল হলো বাকিরাও। সাদ্দাম তখন নিবিষ্টচিত্তে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন, কিছুই দেখছেন না যেন। তার চাওয়া শুধু একটাই—আনুগত্য। যারা কক্ষে অবশিষ্ট ছিলেন তাদের হাতেও পথ ছিল মাত্র একটাই, সাদ্দামের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য বা বাইয়াত।

মাসাদি আর আয়েশ ছিলেন সাদ্দাম হোসেনের কড়া সমালোচক। তাই তাদের রাজনৈতিক বিরোধিতার মূল্য চুকাতে হলো নিজেদের জীবন দিয়ে। আদালত বসিয়ে ৫৫ জনকে অভিযুক্ত করা হলো, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো হলো আরসিসির ৫ মেম্বারসহ ২২ জনকে। বাকিদের কপালে জুটল বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড। হাস্যকর ব্যাপার হলো—আরসিসির ২১ সদস্যের মধ্যে সাতজন ছিলেন বিচারে গঠিত ট্রাইব্যুনালে আর তিনজন ছিলেন তদন্ত কমিটিতে। রেভ্যুলেশনারি মুভমেন্টে এ ঘটনা বিরল। সম্ভবত মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসেও এটা প্রথম ঘটনা যে, কথিত ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে একটা দলের প্রথমসারির নেতাদের অর্ধেকাংশ নিজেরাই বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। নিজেরাই বাদী, নিজেরাই বিচারক—কী অদ্ভুত তামাশা!

মাসাদি ও হামাদানি ছিলেন শিয়া মুসলিম। ফাঁসি কার্যকরের দিন প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের বাগানে জড়ো হয়েছিল একদল মানুষ। সাদ্দাম তাদের উদ্দেশে বললেন—'এটা বড়ো সফলতা'। পহেলা আগস্টের মধ্যে বাথ পার্টির আরও ১০০ জনের মতো সদস্যকে হত্যা করা হলো। অনেকে স্থান পেল কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, কিছুসংখ্যককে এরপর আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি ইরাকের মাটিতে।

সাদ্দাম যখন চরম নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে নিজ দেশে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করছেন, তখন তার সামনে এসে দাঁড়ায় আরেক আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী—আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি। খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর ইরাকের সাদ্দাম প্রশাসনের ওপর নানা রকম চোরাগুপ্তা হামলা হয়। ১৯৮০ সালের ১লা এপ্রিল বাগদাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় হামলা করা হয় ইরাকি উপ-প্রধানমন্ত্রী তারিক আজিজের ওপর। এর কয়েক সপ্তাহ পরই হাউজ এরেস্ট থাকা জনপ্রিয় শিয়া নেতা **আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বাকির আল সদর**[২৮]-কে তাঁর বোন আমিনা বিনতে আল হুদাসহ হত্যা করা হয়। ফায়ারিং স্কোয়াডে দেওয়া হয় দাওয়া আল ইসলাম পার্টির সাথে জড়িত

[২৮] আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বাকির আল সদর ছিলেন ইসলামি দাওয়া পার্টির তাত্ত্বিক গুরু। তিনি জনপ্রিয় ইরাকি শিয়া নেতা মুক্তাদা আল সদরের শ্বশুর। বাকির সদরকে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। কথিত আছে, সাদ্দাম সরাসরি এই খুনের সঙ্গে জড়িত। বাকির হত্যাকাণ্ডে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি। কারণ, তিনি ছিলেন ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনির সরাসরি সমর্থক।

কয়েকশো শিয়া নেতাকে। শিয়াদের তৎপরতা ঠেকাতে না পারার কারণে ডজনখানেক অফিসারকেও হত্যা করা হয়। ইরাক ছাড়তে বাধ্য হয় কমপক্ষে এক লাখ শিয়া।

এত সব হত্যা, গুম-খুনের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয় সাদ্দামের একচ্ছত্র রাজত্ব। ২২ জুলাইয়ের ঘটনার মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর মধ্যে যে ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তী দুই দশক ধরে সেটা সমানভাবে জাগরূক ছিল প্রতিটি ইরাকির মনে।

# সাদ্দামের গুম-খুনের শাসন

প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেও গুম-খুনের রাজনীতি চর্চা করেছেন সাদ্দাম হোসেন। ইরাকের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা থাকাকালে যখন যাকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয়েছে, ঠেসে ধরেছেন তাকেই। বিরোধিতা তো অনেক পরের ব্যাপার, সাদ্দামের সন্দেহ আর জেদের কারণে অনেক নেতা-কর্মীকে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। বাথ পার্টি ছেড়ে আরেফ-এর দলে যোগ দেওয়া একসময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রশিদ মুসলিকে সিআইএ-এর এজেন্ট অপবাদ দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। বহু বছর কারাবন্দি করে রাখা হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী আবদ আল রহমান আল বাজাজ এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদ আল আজিজ আল উকাইলিকে। ১৯৬৮-এর বিপ্লবী ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাসের আল হানিকে রাতের আঁধারে ধরে নিয়ে যায় বাথিস্টরা। কদিন পর তার বুলেটবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। সাবেক মন্ত্রী কর্নেল আবদ আল করিম মোস্তফাকেও হত্যা করা হয়। আর এই খুনের দায় চাপানো হয় দুর্বৃত্তদের ওপর। পরে আর কখনোই সেই 'দুর্বৃত্ত রহস্য' উন্মুক্ত হয়নি। বছর না ঘুরতেই খুন হন ইরাকি বাথ পার্টির একসময়কার ফার্স্ট সেক্রেটারি জেনারেল ফুয়াদ আল রিকাবি।

সাদ্দাম তার অনুগতদের দিয়ে এমনই এক দমবন্ধ পরিবেশ জারি রেখেছিল গোটা ইরাকজুড়ে। কাকে কখন তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, কোথায় কার লাশ পড়ে থাকবে—আগে থেকে সেটা অনুমান করা ছিল অসম্ভব। সাদ্দামের অন্যতম কৌশল ছিল 'ইজরাইলি এজেন্ট' অপবাদ দেওয়া। কারণ, এই অভিযোগে কাউকে কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দিলে গণপ্রতিক্রিয়ার তেমন কোনো ঝুঁকি নেই। ফলে এই সহজ তরিকাতেই নিজের দুশমন নিধন প্রকল্প চালিয়ে গেছেন সাদ্দাম। গাদ্দাফির মতো তিনিও জনসম্মুখে ফাঁসি দিয়ে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখতেন বাগদাদ আর বসরার সড়কে। এতে শত্রু তো বিনাশ হতোই, ভয়ের বার্তা পৌঁছে যেত জীবিত দুশমনদের অন্তরেও।

১৯৭০ সালে বাথ সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে বলে জানানো হয়। যদিও এমন কোনো অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দাবি করা হয়—এই চক্রান্তে জড়িত ছিল সাবেক আরেফ সরকারের অনুগত কিছু কর্মকর্তা। ইরাকি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়—ইজরাইল, ইরান আর সিআইএ এই বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছে। ৭৩ জন আর্মি অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কারাবন্দি করা হয় আরও অনেককে। কাসিম সরকারের আশকারায় বাথিস্টসহ অন্যদের ওপর একসময় নির্যাতন চালিয়েছে কমিউনিস্টরা। বাথিস্টরা এসে শত শত কমিউনিস্টকে গুম-খুন করার মধ্য দিয়ে তার শোধ নেয়। ক্ষমতার রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে বাথিস্টরা নিজ দলের অনেক নেতা ও আর্মি অফিসারকে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি। এই হতভাগাদের একজন মেজর জেনারেল ওয়ালিদ মাহমুদ শেইরাত।

১৯৭৮ সালের জুলাইতে ইরাকের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আবদ আল রাজ্জাক নায়িফ লন্ডনে খুন হলে ব্রিটিশ সরকার ১১ ইরাকি কর্মকর্তাকে পারসোনা নন গ্রাটা (অবাঞ্ছিত) ঘোষণা করে তাদের ব্রিটেন ছাড়ার আলটিমেটাম দেয়। কদিন বাদেই অবশ্য এর প্রতিশোধ নেয় ইরাক। অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে এক ব্রিটিশ নাগরিক গ্রেফতার হন; ফলে ব্রিটেনে যেতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় ইরাকিদের। ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর সাথে কোনো চুক্তি না করতে নির্দেশ জারি করা হয়। ১৯৭৯ সালের আগস্টে গ্রেফতার হন বাথ ন্যাশনাল কমান্ডের সহকারী মহাসচিব মুনিব আল রাজ্জাক। তার এক বছরের মাথায় খুন হন সাদ্দামের পুরোনো বন্ধু আবদ আল করিম শায়েখলি। ১৯৭৪ সালে আরসিসি (বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল) থেকে সরিয়ে দেওয়ার দুই মাস পর সাদ আবদ আল বাকি আল হাদিতিও খুন হন।

২২ জুলাইয়ের মতো আরও অসংখ্য গণহত্যার সাক্ষী সাদ্দামের শাসনামল। এত সব হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি ইরাকজুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। এ রকমই একটি গণহত্যা সংঘটিত হয় ১৯৮২ সালের ৮ জুলাই, যা 'দুজাইল গণহত্যা' নামে পরিচিত। তখন ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলমান। আর দুজাইল ছিল ইরাকের শিয়া অধ্যুষিত একটি এলাকা। সেখানকার অসংখ্য পুরুষ সদস্য ইরাকের বিপক্ষে শিয়া রাষ্ট্র ইরানের হয়ে যুদ্ধ করছিল। এই পরিস্থিতিতে ৮ জুলাই দুজাইল পরিদর্শনে যান সাদ্দাম হোসেন। তিনি স্থানীয় কিছু পরিবারের সাথে দেখা করেন, খোঁজখবর নেন এবং জনগণের সামনে একটি ভাষণ দেন।

সাদ্দাম তার বক্তৃতায় ইরাকের পক্ষে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের বেশ প্রশংসা করেন। কিন্তু বক্তৃতা শেষে বাগদাদে ফেরার পথে সাদ্দামের গাড়িবহরে হামলা করে বসে একদল গুপ্তঘাতক। সেদিন সাদ্দাম বেঁচে গেলেও প্রাণ হারান তার দুই দেহরক্ষী। হামলার পর সাদ্দাম হোসেন রাজধানীতে ফেরার বদলে পুনরায় দুজাইল যান এবং জনগণের সামনে আরও একটি বক্তৃতা রাখেন। তিনি শপথ করেন যে, তিনি অবশ্যই বিদ্রোহীদের ধ্বংস করে দেবেন।

হামলার জন্য দায়ী করা হয় ইরানকে। পরদিন দুজাইলে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ৬০০-এর বেশি গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে যায় ইরাক সরকারের এলিট রিপাবলিকান গার্ডের একটি বিশেষ ইউনিট। তাদের সবাইকে বাগদাদ থেকে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে কুখ্যাত আবু গারিব কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ৬০০ জনের মধ্যে ১৪৮ জনকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি পরবর্তী সময়ে। বাকিদেরও অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং জীবনের একটা বড়ো সময় তাদের কাটাতে হয় কারাগারে। পরবর্তী সময়ে আমেরিকার হাতে বন্দি সাদ্দামকে এই দুজাইল গণহত্যার জন্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও কুর্দি গণহত্যা এবং তাদের ওপর রাসায়নিক বোমা হামলা, ইরান ও কুয়েতে ইরাকের যুদ্ধাপরাধ সাদ্দামের শাসনামলের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। *দ্যা ইকোনোমিস্ট* পত্রিকা সাদ্দামকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম কুখ্যাত একনায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যার শাসনকাল ২,৫০,০০০-এর বেশি ইরাকি জনতার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেন এতটা নিষ্ঠুর ছিলেন সাদ্দাম? তার নির্দয় শাসনের গভীর ব্যাখ্যা কী হতে পারে? সাদ্দামের নিজের কাছেও কি এর কোনো ব্যাখ্যা ছিল? একটি ব্যাখ্যা আমরা জানতে পারি সিআইএ কর্মকর্তা জন নিক্সন-এর কাছ থেকে। ২০০৩ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হাতে আটক হয়েছিলেন সাদ্দাম হোসেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ পান সিআইএ কর্মকর্তা জন নিক্সন। পরে নিক্সন একটি বইও লিখেছেন—*ডিব্রিফিং দ্যা প্রেসিডেন্ট : দ্যা ইন্টারোগেশন অব সাদ্দাম হোসেন* নামে। বইয়ে একটি অংশে নিক্সন লিখেছেন—

> 'আমি যখন সাদ্দামকে জিজ্ঞাসাবাদ করি, তিনি আমাকে বলেন—
> "ইরাকে তোমরা ব্যর্থ হতে যাচ্ছ। ইরাক শাসন করা অত সহজ নয়, সেটাই তোমরা বুঝতে পারবে।"'

নিক্সন আরও লিখেন—

> ‘সাদ্দামের এ কথায় আমার কৌতূহল হয়। কেন এভাবে ভাবছেন, জানতে চাইলে সাদ্দাম বলেন—“ইরাকে তোমরা ব্যর্থ হতে যাচ্ছ; কারণ, তোমরা ইরাকের ইতিহাস, ভাষা ও আরব জাতির মানসিকতা জানো না।” সাদ্দাম হোসেনের একটি যুক্তি ছিল—“বহু জাতি-গোষ্ঠীর দেশ ইরাক” পরিচালনা এবং সুন্নি উগ্রবাদ ও শিয়া নেতৃত্বাধীন ইরানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তার মতো একজন কঠোর শাসকেরই প্রয়োজন ছিল। সাদ্দাম একসময় আমাকে বলেছিলেন—“ইরাকে একসময় শুধু ঝগড়া আর বাদানুবাদ ছিল। আমি এর অবসান ঘটাই এবং জনগণের মধ্যে ঐকমত্যের একটা জায়গা তৈরি করি।”’

সাদ্দামের এই কথার কিছু না কিছু সত্যতা তো আছেই। আরব বসন্তপরবর্তী লিবিয়া আর ইয়েমেনই তার প্রমাণ।

# কুর্দি বিদ্রোহ ও হালাবজা ট্র্যাজেডি

ইরাক-ইরান যুদ্ধ দেখা দিলে মাসুদ বারজানি ও জালাল তালাবানি—দুজনই বিদ্রোহ করেন। তারা সমর্থন দেন ইরাকের শত্রু ইরানকে। কুর্দি নেতারা হয়তো ভেবেছিলেন, ইরানই শেষমেশ জিতে যাবে। আর যদি সত্যিই এমনটা ঘটত, ইতিহাস ভিন্ন রকম হতো নিশ্চয়ই। পুরোপুরি না হলেও অন্তত ইরাক ভূখণ্ড থেকে স্বতন্ত্র একটা কুর্দি রাষ্ট্রের ভূমিষ্ঠ হওয়ার নজিরও হয়তো দেখতে পারতাম আমরা। ইতিহাস অবশ্য কুর্দি নেতাদের স্বপ্নের মতো হয়নি। যুদ্ধে একতরফা কেউ জেতেনি। দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে কুর্দিদের স্বপ্ন। নিষ্ঠুর সাদ্দাম-প্রশাসন কুর্দিদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক বোমা প্রয়োগ করেছে। ইরান সীমান্তবর্তী কুর্দি এলাকা হালাবজায় এই বোমা হামলার দায় অবশ্য কখনোই স্বীকার করেনি ইরাক। হালাবজায় হাজার হাজার কুর্দি হত্যার পেছনে সাদ্দামের আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ সহচর জেনারেল আলি হাসান আল মজিদ (কুর্দিদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য তাকে ডাকা হতো কেমিক্যাল আলি) জড়িত বলেও গুঞ্জন ছড়ায়। কুর্দিদের স্বপ্ন মাটিচাপা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই ব্যক্তিকে। ইরাক নিজেই তো এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেনি, উলটো দোষ চাপিয়েছে ইরানের ঘাড়ে।

তখন আমেরিকানদের হাবভাব ছিল যথেষ্ট ধোঁয়াশে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়—ইরান সম্ভবত প্রথম হালাবজায় আর্টিলারি ফায়ার করেছিল; যাতে সায়ানাইড গ্যাস ছিল এবং বেশিরভাগ মানুষ সায়ানাইড গ্যাসেই মারা গেছে। আমেরিকান কর্মকর্তাদের তখনকার দাবি অনুযায়ী ইরাক নয়; সায়ানাইড গ্যাস ব্যবহার করেছে ইরান। আমেরিকাতেই অপর একটি স্টাডিতে বলা হয়, সম্ভবত উভয়পক্ষ থেকেই সায়ানাইড ছোড়া হয়। যদিও বেশিরভাগ স্টাডিতেই দায়ী করা হয়েছে সাদ্দাম প্রশাসনকে, প্রকৃতপক্ষে ইরাকই এই হত্যাকাণ্ডের নাটের গুরু। নির্দয় কেমিক্যাল আলি সাদ্দামের হয়ে এই কুকর্মটি বাস্তবায়ন করেছেন। কুর্দি নিধনে আরও ব্যবহার করা হয়েছে মাস্টার্ড, ভিএক্স

ও সারিন গ্যাস। এজন্য কেমিক্যাল আলিকে কেউ কেউ কুর্দিস্তানের কসাই বলেও ডাকত। ২০১০ সালে কুখ্যাত এই লোকটিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে সাদ্দামপরবর্তী সরকার।

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কুখ্যাত কেমিক্যাল আলি। সামনের সারিতে ডান পাশে বসে আছেন সাদ্দাম হোসেন। ছবি : এনবিসি নিউজ

ইরান-ইরাক যুদ্ধের শেষদিকে কুর্দি বিদ্রোহীদের প্রতি আগের চাইতেও কঠোর অবস্থানে নেয় ইরাক। ইরানকে সহযোগিতার অভিযোগে কুর্দি গ্রামগুলোতে 'আন আনফাল ক্যাম্পেইন' চালানো হয়। সরকারি বাহিনী ধ্বংসযজ্ঞ চালায় কুর্দি গ্রামগুলোতে। হাজার হাজার কুর্দিকে জোরপূর্বক স্থানান্তর করা হয় বহু দূরের পাহাড়ি এলাকায়। এর মধ্যেই উপসাগরীয় এলাকায় আরও একটি যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। এই যুদ্ধ কুর্দিদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে দেয়।

কিন্তু ১৯৯১ সালের নতুন এই উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় গোটা ইরাকজুড়ে। পশ্চিমারা সিরিজ অবরোধ দিয়ে ইরাকের তেল অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে দেয়। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়— ইরাকিরা দুর্ভিক্ষপূর্ব পরিস্থিতিতে রয়েছে, কাজেই তাদের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া উচিত। যুদ্ধের সুযোগে দক্ষিণ ইরাকে শিয়া বিদ্রোহ চাঙা হয়ে ওঠে। এর দেখাদেখি উত্তরে সরব হয় কুর্দিরা। তারা ভাবল, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। কুর্দি নেতা জালাল তালাবানি বললেন—

'স্বাধীন কুর্দিস্তানের স্বপ্ন দেখা আমার অধিকার। আর কুর্দি জনগণেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আমরা বর্তমান সীমানা পরিবর্তন করতে পারি না। আমরা এখন যেটা চাই তা হলো—ইরাকি কাঠামোর মধ্যে থেকেই একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ।'

তালাবানি জানতেন স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে স্বাধীনতার আওয়াজ তুললে ইরাকের প্রতিবেশী শত্রুরাও কুর্দিদের পক্ষে দাঁড়াবে না। কারণ, তাতে ইরাকের পাশাপাশি নাক কাটা যাবে ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কেরও। ইরাকি কুর্দিস্তান ফ্রন্টের পররাষ্ট্রপ্রধান জালাল তালাবানি কুয়েত আক্রান্ত হওয়ার পর আমেরিকা সফরে যান। ইরাক সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন জোটকে গোয়েন্দা সহায়তা দেওয়ার বিনিময়ে আমেরিকার কাছে তিনি অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন প্রার্থনা করেন। মার্কিন তরফ থেকে টাকা ও বন্দুক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ণ স্বীকৃতি না দেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয় তাকে। কুর্দিরা সেটা মানেনি। তবে যুদ্ধ শুরুর পর আমেরিকা কুর্দিদের অস্ত্র দিয়েছিল। ইরান সীমান্তবর্তী রানিয়া এলাকা থেকে কুর্দিদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ শুরু হয়। শিগগিরই তা ছড়িয়ে পড়ে সোলায়মানিয়া, ডাহুক, ইরবিল, কিরকুক ও জাখোত অঞ্চলে। এক থেকে দুই লাখের মতো কুর্দি মিলিশিয়া যারা কিনা সরকারের হয়ে ৭০ ও ৮০-এর দশকে কুর্দি ন্যাশনালিস্টদের দমনে ভূমিকা রেখেছিল, এবার তারাও বিদ্রোহে সহযোগিতা করে। এই কুর্দিরা এসেছিল বারজানি ও তালাবানি বিরোধী গোত্রগুলো থেকে। তাদের নেতাদের টাকা ও পদ দিয়ে এতদিন তুষ্ট রেখেছিল সরকার। যখন বিদেশি কোয়ালিশন বাহিনী সফল হতে থাকল, কুর্দিরা ধরে নিল—সময় এসে গেছে, সাদ্দামকে গদি ছাড়তে হবে এবার। বুশকে সম্মান করে তারা বলা শুরু করল 'হাজি বুশ'।

দক্ষিণের বিদ্রোহের সাথে সুর মেলাতে ইরান ও সিরিয়া কুর্দিদের উৎসাহ দেয়। উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক হেরে গেলে শিয়াদের সাথে সমন্বয় করে হামলা শুরু করে কুর্দিরা। উত্তর ইরাকে তাদের বিদ্রোহ শুরু হয় '৯১-এর ৪ মার্চ। আরব এলাকা মসুলেও ঢুকে পড়ে তারা। মার্চের মধ্যেই কুর্দি অধ্যুষিত বেশিরভাগ এলাকা তো বটেই, এমনকি কিরকুকও কুর্দি মিলিটারির নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সোলায়মানিয়াতে একদিনের হামলাতেই ৯০০-এর মতো সরকারি কর্মকর্তা নিহত হয়। খুন হন সোলায়মানিয়ার গভর্নরও। তবে কুর্দি সেনাদের মতে—তারা আর্মি সদস্য হত্যা করেনি, হত্যা করেছে সরকারের এজেন্টদের। সরকারের বিরুদ্ধে বড়ো সাফল্যে উৎফুল্ল কুর্দি নেতা মাসুদ বারজানি বলেন—

'৭০ বছর ধরে কুর্দি সংগ্রামের ফল এখন আমাদের হাতে। আমি সারাজীবন এটাই চেয়েছিলাম।'

কুর্দিরা ট্যাংক, কামান, আর্মরড ভেহিকল, সামরিক ট্রাক এমনকি বিমানঘাঁটিও দখল করে নেয়। ডাহুক, আক্রা ও ইমাদিয়াতে খুন হন অন্তত হাজার খানেক সরকারি কর্মকর্তা। কুর্দি এলাকার বাথ পার্টি অফিস, প্রধান নিরাপত্তা অফিস আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হত্যা করা হয় অধিকাংশ বাথ নেতা, পুলিশ ও সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের। এদের কারও কারও আবার ইরানবিরোধী গ্রুপ **মুজাহিদিন খালকের** সাথে লড়াই হয়। মুজাহিদিন খালকের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়—কুর্দিদের পোশাকে ইরাকে ঢুকেছে ইরানের রেভ্যুলেশনারি গার্ড সদস্যরা এবং তারাই সোলায়মানিয়া ও কিরকুকে হামলা করেছে।

ভারী অস্ত্রশস্ত্র, সুশৃঙ্খল বাহিনীর অভাব আর সরকারি বাহিনীর মারমুখী হামলার মুখে একটা সময় পর কুর্দিদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। তাদের শেষ ভরসা ছিল বিদেশি কোয়ালিশন বাহিনী। মার্কিন ও তার মিত্ররা সাহায্য করতে আসবে—এ আশাতেই সাদ্দাম সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল তারা। অথচ তাদের হতাশ হতে হয়েছে। মাথার ওপর মৃত্যু আতঙ্ক নিয়ে '৯১-এর এপ্রিলের মধ্যে ১৫ লাখের মতো কুর্দি ইরান ও তুর্কি সীমান্তের দিকে চলে যায়। ইরান নমনীয় হলেও তাদের ঢুকতে দিলো না তুরস্ক। পরিস্থিতি জটিল হলো। সীমান্তে দেখা দিলো শরণার্থী সংকট। মারাত্মক খাবার সংকটে পড়ল কুর্দিরা। অচিরেই এই দিকভ্রান্ত সম্প্রদায় বুঝতে পারল, '৭৫-এর মতোই আরও একবার বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে তারা। কুর্দি নেতারা বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনল আমেরিকার বিরুদ্ধে। আর আমেরিকা অবস্থান পালটিয়ে বলে উঠল—ইরাকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা নাক গলাতে চায় না। কুর্দিদের প্রতিনিধিদল বুশের সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে পারেনি।

কিন্তু কেন এমন হলো? আমেরিকার গোয়েন্দারা বিদ্রোহে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও কেন এগিয়ে এলো না? প্রধানত এর কারণ ছিল এই অঞ্চলে আমেরিকার তৎকালীন পরীক্ষিত মিত্র তুরস্কের আপত্তি। তুর্কিরা নিশ্চিত ছিল, কুর্দি বিদ্রোহ তুরস্ককে অস্থিতিশীল করে তুলবে। সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই কুর্দি সংকটে ভুগছিল তারা। মিশর, সৌদি আরবসহ আরও কিছু আরব দেশ ইরানের রাষ্ট্রীয় মদদে শিয়াবাদ উত্থানের শঙ্কা করল বাগদাদে। ফলে তাদেরও ইরাকের এই গৃহযুদ্ধে আগ্রহী হয়ে কিছু করতে দেখা যায়নি। অপারেশন

ডেজার্ট স্টর্মের সৌদি কমান্ডার প্রিন্স খালিদ বিন সুলতান বললেন—সাদ্দামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইরাকের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এটা ইরাকি জনগণের ইস্যু।

ইরাকি বাহিনী যখন একের পর এক শহর পুনর্দখলে নিল, কুর্দি শরণার্থী সংকটও বাড়তে থাকল পাল্লা দিয়ে। কুর্দিদের রক্ষায় মাসুদ বারজানি জাতিসংঘ, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সহযোগিতা চাইলেন। অবরোধে ইরাকে ক্ষুধার্তের সংখ্যাও বাড়ছিল। ত্রাণের আহ্বান জানানো হলো। এপ্রিলের ৬ তারিখ ঘোষণা এলো—ইরাক সরকার বিদ্রোহীদের দমন করেছে। এরপর কুর্দিদের সাথে যুদ্ধবিরতিতে গেল সরকার। কিছু এলাকা কুর্দিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো, যাতে পরে বড়ো কোনো সমঝোতায় পৌছানো যায়। জাকো, ডাহুক ও ইমাদিয়াতে কুর্দিদের জন্য সেফ হোম ঘোষণা করা হলো। সেসব এলাকায় আর হস্তক্ষেপ করতে যায়নি সরকারি বাহিনী।

স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনেই নেওয়া হয়েছিল প্রায়, কিন্তু সাদ্দাম দাবি করলেন—পেশমার্গা ও রেডিও থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। বিদেশিদের সাথে স্বাধীনভাবে যোগাযোগের সুবিধাও দেওয়া হবে না কুর্দিদের। জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে বাথ পার্টিকে সমর্থন দেওয়া আবশ্যক করা হলো কুর্দিদের জন্য। এরই মধ্যে তালাবানি ও বারজানির মধ্যে বিবাদ দেখা দিলো। বারজানি কুর্দিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য সরকারের অনেক কিছু মানতে চাইলেন, কিন্তু তালাবানি সাদ্দামকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তার মতে, সাদ্দাম শক্তিশালী হলে আবার আক্রমণ করবে। এই চুক্তির মাধ্যমে মৌলবাদী এবং জাতীয়তাবাদী কুর্দি বিশেষ করে পিকেকে ও কুর্দিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট শক্তিশালী হতে পারে বলে শঙ্কা ছিল তার। এ ছাড়া তেলসমৃদ্ধ এলাকা কিরকুক কুর্দিদের হাতেই রাখতে চেয়েছিলেন তালাবানি। তালাবানির সাথে সমঝোতায় ব্যর্থ হয়ে একপর্যায়ে কুর্দি এলাকা থেকে সেনা ও সরকারি কর্মকর্তাদের সরিয়ে আনে ইরাক সরকার। অর্থনৈতিক অবরোধ দেওয়া হয় সরকারের তরফ থেকে। তালাবানি ও বারজানি নিজস্ব পার্লামেন্টের জন্য একটা নির্বাচন আয়োজন করে। প্রায় কাছাকাছি আসনে জয়লাভ করে কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (কেডিপি) এবং পেট্রোয়োটিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তান (পিইউকে)। ৯৩-৯৪-তে রাজস্ব সংগ্রহ নিয়ে আবারও দুই দলের বিরোধ বাধে। কুর্দিশ রাজধানী ইরবিলের দখল নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংঘাতে জড়ায় এই দুই গ্রুপ। হাজারো মানুষের প্রাণ যায় এই সংঘর্ষে। কুর্দি রাষ্ট্রের স্বপ্ন মূলত এভাবেই একসময় আঁধারে ঢেকে যায়।

# ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন কি পূর্বপরিকল্পিত

উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে বিশ্ব তেল বাণিজ্য থেকে ছিটকে পড়ে ইরাক। পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশ ইরাকের তেলের ওপর নির্ভর করত, তারাও তেল আমদানির সুযোগ হারায়। তেলসমৃদ্ধ একটি দেশের তেল বিশ্ববাজারে অবাধে প্রবেশ করতে না পারায় জ্বালানি তেলের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই ইরাকের এই দুর্যোগে পূর্ব ইউরোপকে অত্যন্ত বাজে পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। কৃষি ও শিল্পপণ্যের বিনিময়ে রাশিয়া থেকে তেল নিত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো; কিন্তু '৯১-এর যুদ্ধে সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রুশ তেল কিনতে প্রয়োজন পড়ে পশ্চিমা ডলার। কমপক্ষে এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের তেল দেওয়ার কথা ছিল বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরিসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে—উপসাগরীয় যুদ্ধে সেই সাপ্লাই চেইন ধ্বংস হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে অনেকেই ভেবেছিলেন পৃথিবীতে শান্তি ফিরবে। তা আর ফিরল কই! আমেরিকা আরও আগ্রাসী হলো। রাশিয়া ও চীনের আগ্রাসন বন্ধের পর আমেরিকার ফোকাস ছিল অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের খতম করা। ৯১-পরবর্তী সময়ে তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তখন জাপান, পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ধীরে ধীরে গ্লোবালাজাইজেশনের ধারণা এলো। সম্ভাবনাময় শত্রুদের কৌশলে নিরস্ত্র করে শক্তিশালী হলো আমেরিকা। স্নায়ুযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছিল—কমিউনিস্ট আগ্রাসন ঠেকাতে তার বাহিনী প্রস্তুত। যদি কোনো দেশ সাহায্য চায়, সাহায্য করা হবে। ২০০১ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকার ক্ষমতায় আসেন জর্জ ডব্লিউ বুশ। তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হন ডিকচেনি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডনাল্ড রামসফেল্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার

পদে বসানো হয় কন্ডোলিসা রাইসকে। এদের বেশিরভাগই ছিলেন তেল বাণিজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কেউ তেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, আবার কেউ ছিলেন কোম্পানির মালিক কিংবা উপদেষ্টা। চেনি একসময় হ্যালিবার্টন ইনকর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী ছিলেন। কন্ডোলিসা রাইস ছিলেন শেভরনের বোর্ড সদস্য। বাণিজ্যমন্ত্রী ডন ইভান্সও ছিলেন একজন বিখ্যাত অয়েলম্যান। বুশের নিজেরও তেল বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা ছিল। বুশ যেভাবে পেট্রোলিয়ামকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এর আগে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ততটা দেননি। তেল আর জিওপলিটিক্স ছিল ওয়াশিংটনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চেনির কাজ ছিল এনার্জি পলিসি রিভিউ করা। অন্য ভাইস প্রেসিডেন্টের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ক্ষমতাবান ছিলেন তিনি। ২০০১ সালের এপ্রিলে চেনি ও জেমস বেকার এক প্রতিবেদনে জানান, আগামী দুই দশক যুক্তরাষ্ট্রের তেলনির্ভরতা বাড়বে। এতে আরও বলা হয়—বিশ্বে তেলের মজুত কমছে। সুতরাং নজর ফেরাতে হবে ইরাকের দিকে। এই প্রতিবেদনে তেলের ওপর মার্কিন নির্ভরতা স্পষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে বিদেশের মাটিতে থাকা তেল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবে—হঠাৎ-ই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই আলোচনা। বেশিরভাগ তেলই তখন জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোর হাতে। আর স্বভাবতই মার্কিন স্বার্থ পূরণ করবে না তারা। চেনিরা টেনশনে পড় গেল। কীভাবে বাইরের তেল নিজেদের ঘরে আনা যায়।

১৯৯৯ সালে হ্যালিবার্টনের পদে থাকার সময়ই ডিকচেনি বুঝতে পারেন, মধ্যপ্রাচ্য তেলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তেল ব্যবসায়ীদের বলা হয়, ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিদিন অতিরিক্ত আরও ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল প্রয়োজন হবে তাদের। দৈনিক ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল মানে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ; যা সৌদি আরবের তখনকার মোট উৎপাদনের ছয় গুণেরও বেশি। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়, এসব দেশের সব তেল সরকারি নিয়ন্ত্রণে। তবে সৌদি আরবের চেয়েও বড়ো তেল রিজার্ভ রয়েছে ইরাকে। আপাতত ডিকচেনির নজর তাই সেখানেই। সুতরাং ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন যে পূর্বপরিকল্পিত, তাতে আর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

পল ও নেইল নামে বুশ কেবিনেটের একজনকে ২০০২ সালে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি ২০০৪ সালে অর্থাৎ ইরাক যুদ্ধ শুরুর পরের বছর একটি টিভি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন—নাইন-ইলাভেনের আগেই ইরাকে সরকার পরিবর্তনের

পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন বুশ। তার দাবি, ক্ষমতায় আরোহণের পরই বুশের প্রধান টার্গেট হয় ইরাক। লাদেন ইস্যুকে সামনে রেখে বুশ ও চেনি সাদ্দামকে উৎখাতে সামরিক অভিযান পরিকল্পনা করেন। ইরাকে হামলার আগের বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত মার্কিন থিংক ট্যাংক 'প্রজেক্ট ফর দ্যা নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি' (পিএনএসি) একটি পেপার পাবলিশ করে। এর বিষয়বস্তু ছিল—কীভাবে মার্কিন আধিপত্য ধরে রাখা যায়। এই থিংক ট্যাংকের দায়িত্ব হলো মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কাজ করা, যাতে বিশ্বব্যাপী মার্কিন দাদাগিরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই থিংক ট্যাংকে ছিলেন চেনি, রামসফেল্ড, উইলফোজ। এ ছাড়া কার্ল রোভেও যুক্ত ছিলেন এই দলে। তাকে বলা হতো বুশের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারক। এই চিন্তকরা যুক্তরাষ্ট্রকে জীবাণু অস্ত্র এবং স্পেসর্ফোস তৈরির পরামর্শ দেয়। পরিকল্পনা মোতাবেক শুরুতে ইরান, ইরাক আর উত্তর কোরিয়াকে দুর্বৃত্তের দেশ বলে আখ্যা দেন প্রেসিডেন্ট বুশ। বলা হয়—এই তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বহু বছরের মার্কিন লড়াই আফগান যুদ্ধের মাধ্যমে 'সন্ত্রাসাবাদ' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। টুইন টাওয়ারে হামলার পর রামসফেল্ড ও উইলফোজ কোনো প্রমাণ ছাড়াই সন্ত্রাসে মদতদাতা হিসেবে দোষারোপ করতে থাকে সাদ্দাম হোসেনের ওপর। মূলত সন্ত্রাসবাদ নয়; মামলাটা তেলের।

জাতিসংঘ চার্টার লঙ্ঘন করে ইরাকে আক্রমণ চালায় যুক্তরাষ্ট্র। চার প্রভাবশালী রাষ্ট্র রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন ও জার্মানি অবশ্য এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। একে অবশ্য মানবদরদি মনোভাব হিসেবে দেখার কারণ নেই। ইরাকের সাথে দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থই ছিল এর মূল কারণ। পশ্চিম ইরাকের কুরনা ওয়েলফিল্ডে ২৩ বছরের একটি চুক্তিতে তেল ডেভেলপ করছিল রাশিয়ার কয়েকটি কোম্পানি। চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি এবং ফ্রান্সের কিছু কোম্পানিও কাজ করত দেশটিতে। তারা জানত, এই আক্রমণ পণ্যের বিনিময়ে তেল পাওয়ার বাসনা শেষ করে দেবে। তবে ইরাক যুদ্ধের আগে আফগানিস্তান আক্রমণ ছিল ছোটোখাটো একটা ওয়ার্মআপ।

# টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১, মঙ্গলবার

ফ্লোরিডাতে সফরে আছেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। আর কিছুক্ষণ পরই স্কুলে শিক্ষার্থীদের সামনে তার ভাষণ দেওয়ার কথা। কিন্তু ততক্ষণে ভয়ংকর এক বিপদ নেমে এসেছে মার্কিনিদের ভাগ্যাকাশে। গত ২০০ বছরের ইতিহাসে এমন ভয়াল মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ দেখেননি কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের গর্বের সিটি নিউইয়র্ক, যার মূলকেন্দ্র ম্যানহাটন। ম্যানহাটনকে বলা যেতে পারে একটি দ্বীপ। এর চারদিকে কেবল নদী আর সমুদ্র। উত্তরে হারলেম রিভার, দক্ষিণে নিউইয়র্ক বে, পূর্বে ইস্ট রিভার এবং পশ্চিমে আছে বিখ্যাত হাডসন রিভার।

১৫২৪ সালে ইতালীয় নাবিক গিয়াভানি ডা ভেরাজানো প্রথম শ্বেতাঙ্গ হিসেবে ম্যানহাটনে আসেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তার আগে আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের বসবাস ছিল এখানে। ১৭৯২ সালে ম্যানহাটনে প্রথম স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই এটি পরিণত হয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়ররা সব সময়ই শহরটিকে পৃথিবীর রাজধানী বলে দাবি করে থাকেন। তাদের দাবি মানলে সেই রাজধানীর হেডকোয়ার্টার নিঃসন্দেহে ম্যানহাটন। অনেকেই একে পৃথিবীর বাণিজ্য, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বলতে স্বস্তিবোধ করেন। কী নেই এখানে? বিশ্বখ্যাত সংস্কৃতিকেন্দ্র ব্রডওয়ে, ওয়ালস্ট্রিট, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, চায়না টাউন, ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল সেন্টার, ফিফথ অ্যাভিনিউ, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, টাইমস স্কয়ার, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, গ্রিনউইচ গ্রাম এবং সেন্ট্রাল পার্ক—সবকিছুর এক অনবদ্য বিন্যাস এই ম্যানহাটন। শহরটিতে থাকা ১১০ তলার টুইন টাওয়ারটি ৪০-৫০ মাইল

দূর থেকেও খালি চোখে দেখা যায়। ১১ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এই টাওয়ারেই হামলে পড়েছে বোস্টন থেকে উড়ে আসা দুটি যাত্রীবাহী বিমান। বোস্টন বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই বিমান দুটি আচমকা দিক পরিবর্তন করে নিউইয়র্ক সিটির দিকে চলে আসে।

একই দিনে আরও দুটি বিমান ছিনতাই হয়, যার একটি গিয়ে আঘাত হানে আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনে। চতুর্থ বিমানটি পেনসিলভানিয়ায় বিধ্বস্ত হয়। অনেকে সন্দেহ করেন, হয়তো-বা এই বিমানের লক্ষ্যবস্তু ছিল খোদ হোয়াইট হাউজ।

সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বোয়িং-৭৬৭ উড়োজাহাজটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর দিকের টাওয়ারে আঘাত হানে। ১১০ তলা ভবনটির ৮০তম তলায় ঢুকে পড়ে বিমানটি। ১৮/১৯ মিনিট পরই দ্বিতীয় বিমানের হানা। এটি দক্ষিণ দিকের টাওয়ারের ৬০তম তলা বরাবর আঘাত করে বসে। ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় টুইন টাওয়ার। সকাল ১০টার দিকে দক্ষিণের টাওয়ার, আর তার আধা ঘণ্টা পর উত্তরের টাওয়ারটি খাড়াভাবে নিচে নেমে এসে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

হামলাকারী ১৯ জনসহ সেদিনের ঘটনায় নিহত হয় মোট ২৯৯৬ জন নরনারী। উদ্ধার করতে যাওয়া দমকলকর্মী ও পুলিশ সদস্যও আছেন এদের মধ্যে। হামলার পর প্রথম দিনেই নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে বড়ো ধরনের ধস নামে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে এক মাসেই চাকরি হারান প্রায় দেড় লাখ মানুষ।

নিজ দেশের ওপর এ রকম ভয়াল সন্ত্রাসী হামলার পর পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষেই স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়। হামলার খবর শুনে বুশ যখন শিশুদের সামনে বক্তব্য দিতে উঠে দাঁড়ালেন, তিনি ছিলেন বিচলিত, বিমর্ষ ও মুষড়ে পড়া এক চিতাবাঘ।

এ ধরনের বিপর্যয়ে সাধারণত রাষ্ট্রনায়করা সব কাজ ফেলে রাজধানীতে ফিরে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করেন, জনগণকে সাহস জোগায়। প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক সহকর্মীরাও এমনটাই চেয়েছিলেন। কারণ, জনমনে প্রশ্ন উঠতেই পারে—জাতির ক্রান্তিলগ্নে রাষ্ট্রপতি কোথায়? কিন্তু নিরাপত্তাকর্মীদের বাধায় আর হোয়াইট হাউজ আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সেদিন তাৎক্ষণিক রাজধানীতে

ফেরেননি বুশ। দুটি যুদ্ধবিমানের প্রহরায় গিয়ে আশ্রয় নেন ফ্লোরিডার কাছের একটি বিমানঘাঁটিতে।

ততক্ষণে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় চলে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউজ খালি করে ফেলা হয়েছে। নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ফার্স্টলেডি লরা বুশ ও অন্য স্টাফদের। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিকচেনিকে উপ-রাষ্ট্রপতির ভবন থেকে একরকম টেনে-হিঁচড়ে বের করে বাঙ্কারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লাতিন আমেরিকা সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে চলে এসেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল। বুশের তখনও রাজধানীতিতে ফেরার নাম নেই। অবশেষে যখন তিনি হোয়াইট হাউজের দক্ষিণ লনকে পেছনে রেখে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন, ঘড়িতে রাত তখন সাড়ে আটটা। তিনি বললেন—'এই হামলা একটি যুদ্ধের সূচনা!'

মাসখানেকের মধ্যে সত্যি সত্যিই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল আমেরিকা। বুশ প্রশাসন উপসংহার টানল—এটা আল-কায়েদা ও ওসামা বিন লাদেনের কাজ। ২৩ সেপ্টেম্বর কলিন পাওয়েল টেলিভিশনে বললেন—'আমরা পৃথিবীর সামনে এমন জোরালো তথ্য দাঁড় করাব যে, তাতে প্রমাণিত হবে—ওসামা বিন লাদেন এই সন্ত্রাসের সাথে জড়িত।' অতএব, লাদেনের আশ্রয়দাতা ও মদতদাতাদের ধরো। তারা কারা? আফগানিস্তানের তালেবান সরকার।

# আফগানিস্তানে আমেরিকার দীর্ঘ ২০ বছরের লড়াইয়ের সূচনা

৭ অক্টোবর, ২০০১

টুইন টাওয়ারে হামলার ২৬ দিন পর শুরু হলো 'অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম'। আরব সাগরে অবস্থান নেওয়া মার্কিন রণতরিগুলো গর্জে উঠল। ঝাঁকে ঝাঁকে টমাহক মিসাইল ছুটে গেল জালাল উদ্দিন রুমির জন্মভূমি আফগানিস্তানের দিকে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে রাজধানী কাবুল, তালেবানের শক্তিশালী ঘাঁটি কান্দাহার আর ঐতিহাসিক শহর জালালাবাদ কেঁপে উঠল। যুক্তরাষ্ট্র হয়তো সেদিন বুঝতে পারেনি—যে যুদ্ধের সূচনা তারা করেছে, দুই দশকেও সেখান থেকে বের হতে পারবে না তারা। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, দুই দশকের ব্যবধানে তালেবানের সাথে সন্ধি করে একেবারে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে নিজের দেশে।

১৯৯৬ সালের শেষ দিকে বা ৯৭-এর শুরুতে কাবুলের ক্ষমতায় আসে তালেবান। তাদের উত্থান নিয়ে কয়েক ধরনের বক্তব্য থাকলেও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য হলো—তালেবানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হাত ধরে; প্রধানত কান্দাহার থেকে। আর সুযোগটা করে দিয়েছিল আফগান গৃহযুদ্ধ। তালেবান সৃষ্টির সূচনায় পাকিস্তান বা আইএসআই-এর কোনো ভূমিকা না থাকলেও তাদের উত্থান কিংবা ক্ষমতায় যাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই আইএসআই-এর অবদান ছিল অসামান্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বসিয়ে যাওয়া কমিউনিস্ট শাসক নজিবুল্লাহর প্রতিরক্ষামন্ত্রী উজবেক যুদ্ধবাজ নেতা আবদুল রশিদ দোস্তাম, অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন রাব্বানির সমরনায়ক তাজিক নেতা আহমেদ শাহ মাসুদ এবং পশতুন নেতা

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়াররা একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পুরো আফগানিস্তানকে ঠেলে দিয়েছিলেন ভয়ংকর এক গৃহযুদ্ধের দিকে। এই গৃহযুদ্ধ আফগানিস্তানকে গোরস্থান বানিয়ে দিয়েছিল। অথচ কয়েক বছর আগে এই মুজাহিদরাই একজোট হয়ে নিজেদের জমিনকে স্বাধীন করেছিলেন রুশদের কবল হতে।

সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় ঘোড়ায় চড়ে টহল দিচ্ছে আফগান মুজাহিদরা।

রাশিয়ার শেষ সৈন্যটি আফগানিস্তান ছেড়ে যায় ১৯৮৯ সালে। দুই বছরের মাথায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গঠিত হয় ১৫টি নতুন রাষ্ট্র। রুশরা চলে যায় বটে, কিন্তু মস্কোপন্থি সরকারের কাছে রেখে যায় অগণিত স্কাড মিসাইল, যুদ্ধবিমান, হাজার হাজার টন গোলাবারুদ আর স্থলমাইন। কমিউনিস্ট প্রতিপক্ষ আমেরিকাই-বা বাদ থাকবে কেন? তারাও মুজাহিদদের হাতে তুলে দেয় তখনকার আলোচিত স্টিংগার মিসাইল আর গোলাবারুদের বিশাল ভান্ডার। বেশিরভাগ স্টিংগার মিসাইল ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও ৬০০-এর মতো মিসাইলের কোনো হদিস মেলেনি। পরে ইরান, ক্রোয়েশিয়া, কাতার আর উত্তর কোরিয়াতে চুরি হওয়া এই সব মিসাইলের খোঁজ পাওয়া যায়।

স্টিংগার মিসাইল হাতে এক আফগান মুজাহিদ। সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ের সময় বিভিন্ন মুজাহিদিন গ্রুপের হাতে এ রকম কাঁধে বহনযোগ্য ২৩০০ মিসাইল তুলে দিয়েছিল সিআইএ।

নজিবুল্লাহ সরকার তার মিলিশিয়া বাহিনী আর উজবেক নেতা দোস্তামের নেতৃত্বে রাজধানী কাবুল, পুবের নানগারহার প্রদেশের রাজধানী জালালাবাদ, এবং বালখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই-শরিফ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। কিন্তু ক্রমেই নজিবুল্লাহর অনুগতরা দল ত্যাগ করে গোত্রভিত্তিক মুজাহিদ গ্রুপে যোগ দিতে থাকে। বেশিরভাগ যায় উত্তরে রাব্বানি গ্রুপের মাসুদের দলে এবং দক্ষিণের গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সাথে। এই দুই দলের জনবল বৃদ্ধি অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপের জন্যও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের সময় বুরহান উদ্দিন রাব্বানি ও আহমেদ শাহ মাসুদ সশস্ত্র মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ছবি : *ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস*

আফগানিস্তানে তখন তিনটা প্রভাবশালী পক্ষ—উত্তরে রাব্বানি সমর্থিত আহমেদ শাহ মাসুদের জামায়াতে ইসলামি, কাবুলে নজিবুল্লাহর সরকার সমর্থিত আবদুল রশিদ দোস্তাম এবং দক্ষিণে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হিজব-ই ইসলাম। এভাবেই শুরু হয় সোভিয়েতপরবর্তী আফগান গৃহযুদ্ধ। তবে এর মধ্যেও কমান্ডারদের দল বদল অব্যাহত থাকে। নজিবুল্লাহর প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাহনেওয়াজ তানাই যোগ দেয় হেকমতিয়ারের বাহিনীতে, আর সুবিধাবাদী রশিদ চলে আসে মাসুদের সাথে। ফলে কাবুল দখল নিয়ে লড়াই তীব্র হয় হেকমতিয়ার আর মাসুদের মধ্যে। এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে পড়ে ১৯৯২ সালের শেষের দিকে এক ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয় কাবুল। রাজধানীতে কোনো কার্যকর সরকার ছিল না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, দিনের বেলা কাবুল মাসুদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রাতের মধ্যে তা চলে যেত হেকমতিয়ারের যোদ্ধাদের দখলে।

ছবিতে পাশাপাশি আফগান মুজাহিদ নেতা আহমেদ শাহ মাসুদ ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। মুজাহিদরা যে বছর কাবুল দখল করে, এটি সে বছরের ছবি। ছবির বামপাশে আছেন পাকিস্তানের তখনকার একজন মন্ত্রী, আর ডান পাশে এক সৌদি কূটনীতিক। ছবি : এএফপি

অথচ মাসুদ ও হেকমতিয়ার দুজনই একসময় ইখওয়ানের আদর্শ লালন করতেন। কিন্তু গোষ্ঠীগত বিবাদের জের ধরে একে অন্যের ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হয় তারা।

১৯৮৪ সালে পাঞ্জশির উপত্যকায় সহযোদ্ধাদের সাথে আফগান মুজাহিদিন কমান্ডার আহমেদ শাহ মাসুদ। ছবি : ইন্টারনেট

রাজধানী কাবুল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মাসুদরা একসময় সরকার গঠন করলেও তা বেশিদিন টেকেনি। দোস্তাম আবারও মাসুদকে ছেড়ে চলে যায়। অনেক পশতুন নিহত হয় তাজিক-উজবেকদের হাতে। রাব্বানি, মাসুদ, হেকমতিয়াররা কিছুদিনের জন্য যৌথ সরকার গঠন করলেও পুনরায় সম্পর্কে ফাটল ধরে। আবারও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় মাসুদ ও রশিদ। আফগানিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। ডাকাতি, ধর্ষণ, খুনোখুনিসহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে সোভিয়েতবিরোধী মুজাহিদরা। সেই গৃহযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকেই জন্ম নেয় 'তালেবান' নামক এক নতুন শক্তি।

কুখ্যাত উজবেক যুদ্ধবাজ নেতা ফিল্ড মার্শাল আবদুল রশিদ দোস্তাম। ছবি : ইন্টারনেট

# তালেবানের জন্ম ও উত্থান

একটা সময় আলেকজান্ডার ওরফে ইস্কান্দারের স্মৃতি বিজড়িত কান্দাহার ছিল বৃহত্তম শহর। বর্তমানে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এটি। পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের প্রধান সড়ক ধরে মধ্য এশিয়ায় যেতে হলে কান্দাহার, হেরাত হয়েই যেতে হবে। হেরাত থেকে মহাসড়কটির একটি অংশ ইরানের গা-ঘেঁষে চলে গেছে, আরেকটি অংশ স্পর্শ করেছে তুর্কমেনিস্তান বর্ডার। আর পূর্ব দিকে পাকিস্তানের কোয়েটা থাকায় এখান থেকে বেলুচিস্তান হয়ে সরাসরি ভারতে প্রবেশ খুবই সহজ। উত্তরে কাবুল, জালালাবাদ হয়ে তাজিকিস্তান পর্যন্ত কান্দাহারের যোগাযোগ বিস্তৃত। ফলে মধ্য এশিয়াতে বাণিজ্য বিস্তারে জায়গাটি পকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাক সহায়তায় তালেবান উত্থানের কেমিস্ট্রিও লুকিয়ে রয়েছে এখানেই।
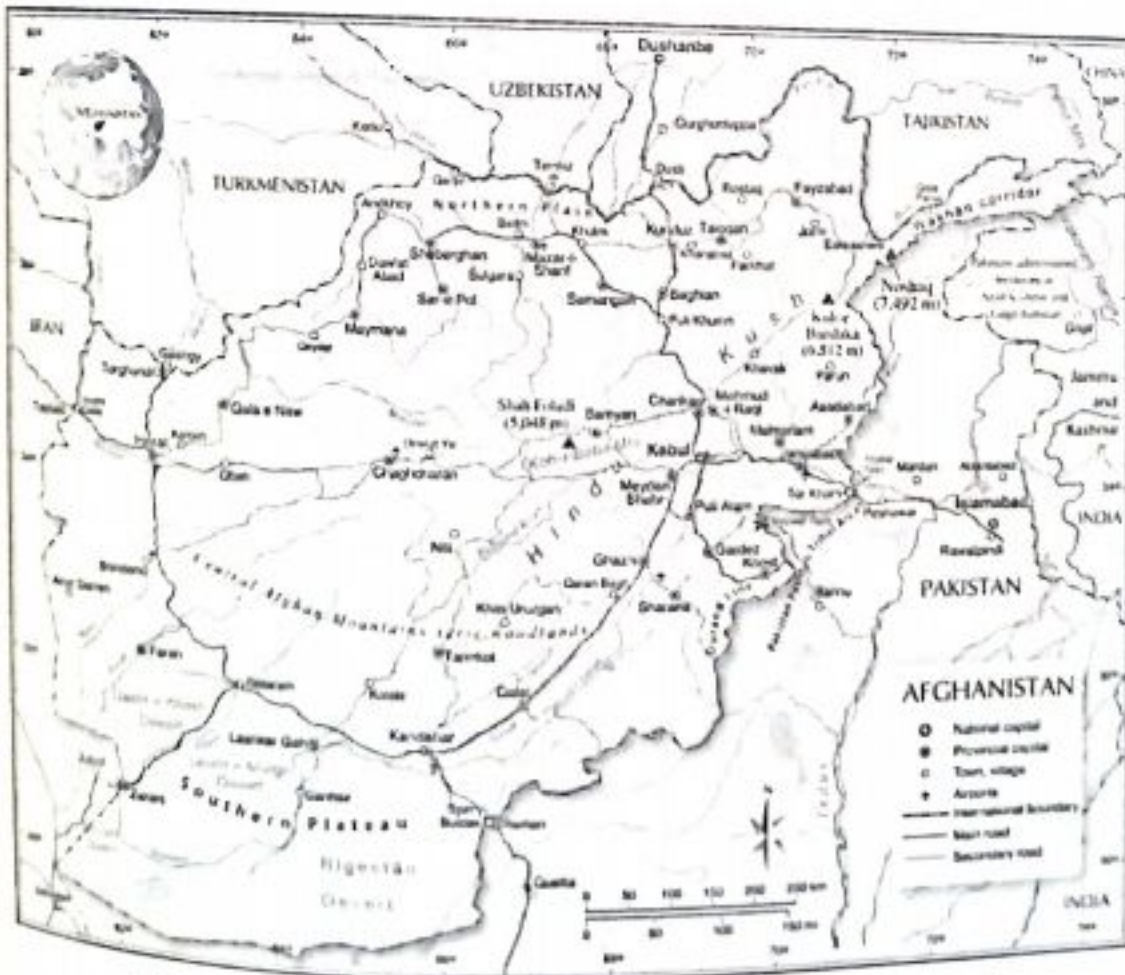
আফগানিস্তানের রাজনৈতিক মানচিত্র। সূত্র : নেশনস অনলাইন প্রজেক্ট

স্থলপথে মধ্য এশিয়ায় নিজের বাণিজ্যবহর টেনে নিতে চেয়েছিল পাকিস্তান। আর এক্ষেত্রে আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করা তার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক।

আফগানিস্তানে ঢুকে হাফিজুল্লাহ আমিনের জায়গায় বাবরাক কারমালকে বসিয়েছিল রাশিয়ান বাহিনী। পরে মিখাইল গর্বাচেভ কারমালকে সরিয়ে বসান গোয়েন্দা পুলিশপ্রধান নজিবুল্লাহকে। রাশিয়ানরা চলে যাওয়ার পর আরও তিন বছর ক্ষমতায় টিকেছিলেন তিনি। ১৯৯২ সালে মুজাহিদদের হামলায় কাবুলের পতন ঘটে, নজিবুল্লাহ আশ্রয় নেন জাতিসংঘ কম্পাউন্ডে। একটি ইসলামি রাষ্ট্র (ইসলামিক স্টেট অব আফগানিস্তান) হিসেবে আফগানিস্তান আত্মপ্রকাশ করে। রুশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সাতটি মুজাহিদ গ্রুপের জোটের সাথে কাজ করতে সম্মত হয় তিনটি শিয়া উপদল। কিন্তু এই ঐক্য বেশিদিন টেকেনি। শিগগিরই শুরু হয় ভয়াবহ যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে উত্থান ঘটে তালেবান নামক স্বতন্ত্র শক্তির।

দখলদার সোভিয়েত বাহিনীকে পরাস্ত করার পর মুজাহিদদের হাতে অস্ত্রগুলো থেকে যায়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তাদের কেউ কেউ। এতে করে দক্ষিণ আফগানিস্তানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, ক্ষুণ্ণ হতে থাকে মানবিক অধিকার। এ রকম চরম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে আফগান ভূখণ্ডে তালেবানের উত্থান ঘটে। মাদরাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর নেতা ছিলেন কান্দাহারের উমর আখুন্দ ওরফে মোল্লা উমর।

সম্রাট আলেকজান্ডারের হাতে গড়া কান্দাহার ছিল তালেবানের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। আরবি ও পশতুন ভাষার 'তালেব' কথাটির অর্থ শিক্ষার্থী, যার বহুবচন 'তালেবান'। শুরুর দিকে তালেবানকে স্বাগত জানিয়েছিল আফগান জনগণ। কারণ, টানা যুদ্ধবিগ্রহ আর চরম অস্থিতিশীলতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারা। এই সুযোগে দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তান থেকে শুরু হওয়া তালেবান সংগ্রাম ক্রমেই বিস্তার লাভ করতে থাকে। কান্দাহার থেকে এগিয়ে গিয়ে তারা দখল করে নেয় ইরান সীমান্তবর্তী প্রদেশ হেরাত। ১৯৯৬ সালে প্রেসিডেন্ট বুরহান উদ্দিন রাব্বানির সরকারকে ফেলে দিয়ে তালেবান যোদ্ধারা রাজধানী কাবুলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পরাজিত রাব্বানিরা চলে যান আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকায়। পরে সেখান থেকেই উত্থিত হয় তালেবানবিরোধী জোট 'নর্দান এলায়েন্স'। প্রথমে এই জোট গড়ে তোলেন

জামায়াতে ইসলামির বুরহান উদ্দিন রাব্বানি এবং তার সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সমরনেতা আহমেদ শাহ মাসুদ। শুরুতে তাজিকদের নিয়েই এটি গঠিত হয়। কারণ, তারা দুজনই ছিলেন তাজিক জাতিগোষ্ঠীর। বালখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই শরিফে সংগঠনটির সদরদপ্তর স্থাপন করা হয়। কিন্তু ১৯৯৭ সালে তালেবানের হাতে মাজার-ই-শরিফের পতন হলে প্রথমে তাখার এবং তারপর বাদাখশানে চলে যান এই দুই নেতা। প্রথমদিকে কেবল তাজিকরাই দলটির নেতৃত্ব দিলেও ২০০০ সালের দিকে উজবেক, তুর্কমেন ও হাজারা জাতিগোষ্ঠীর সমরনেতারাও এতে যোগ দেয়। রাব্বানি ও মাসুদ ছাড়াও এতে ছিলেন উজবেক নেতা আবদুল রশিদ দোস্তাম, জামায়াতের বিসমিল্লাহ খান মুহাম্মাদি, আতা মুহাম্মাদ নুর, মুহাম্মাদ দাউদ, গুল হায়দার, মুহাম্মাদ ফাহিম, ইসমাইল খান, হিজব-ই ওয়াদার সৈয়দ মুস্তফা কাজেমি এবং ইত্তেহাদ-ই ইসলামির শের আলম ইবরাহিমি। ২০০১ সালে তালেবান পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নর্দান এলায়েন্স। সে সময় তাদের মিত্র ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, রাশিয়া, ইরান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুরস্ক এবং তুর্কমেনিস্তান।

তালেবানের উত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তালেবান সরকারকে কখনোই স্বীকৃতি দেয়নি মার্কিন প্রশাসন। পাকিস্তান আর তাদের দুই মিত্র সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বীকৃতি নিয়েই টানা পাঁচ বছর আফগানিস্তান শাসন করে তালেবান যোদ্ধারা। তালেবান উত্থানের অবশ্য একটা পটভূমি রয়েছে। সিনেমার গল্পকেও হার মানায় সে কাহিনি। সোভিয়েতবিরোধী মুজাহিদদের প্রতিরোধযুদ্ধে অর্থ ও অস্ত্রের জোগান দেওয়া পাকিস্তান সে সময় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল। যুদ্ধের কারণে পাক সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে গড়ে উঠেছিল পশতুন শরণার্থী ক্যাম্প। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসে বেনজির ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি। নয়া সরকারের সামনে তখন কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ, সমস্যার চূড়ান্তে পাকিস্তানের অর্থনীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অকাশ ছুঁই ছুঁই। ওই সময় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হাতে পরিচালিত হচ্ছিল পাকিস্তান ও আমেরিকার আফগান নীতি। এদিকে আফগান গৃহযুদ্ধে পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার তখন তার বাহিনী নিয়ে পিছু হটছিলেন। এমতাবস্থায় দেশের অর্থনীতি রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সদ্য স্বাধীন হওয়া মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে (তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও তাজিকিস্তান) পাকিস্তানি পণ্যের বাজার তৈরির

উদ্যোগ নেন বেনজির ভুট্টো। একই সময় বেলুচিস্তানের সুই গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস প্রায় শেষ হওয়ার পথে থাকায় আর্জেন্টাইন তেল কোম্পানি বিরদাস ও পাকিস্তান মিলে তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাইপলাইনে গ্যাস পাকিস্তান পর্যন্ত আনার পরিকল্পনা করা হয়। তবে এই সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন ছিল একটি স্থিতিশীল আফগানিস্তান। প্রবল ঝুঁকি সত্ত্বেও নিজেদের অর্থনীতি বাঁচাতে মধ্য এশিয়ায় পণ্য রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। এজন্য পশতুন বংশোদ্ভূত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিরউল্লাহ বাবরের মাধ্যমে হেরাত প্রদেশের যুদ্ধবাজ নেতা ইসমাইল খান (হেরাতের সিংহ) ও উত্তরের মাজার-ই শরিফে আবদুল রশিদ দোস্তামের সাথে পাকিস্তান সমঝোতা করে।

কিন্তু কান্দাহারের যুদ্ধবাজ গোত্রনেতাদের সাথে কোনোভাবেই সমঝোতায় পৌঁছানো যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানি পণ্যবাহী ট্রাকের বিশাল বহর সীমান্ত অতিক্রম করে কান্দাহার হেরাত ও মাজার-ই-শরিফ রুট হয়ে আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর দিকে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু কান্দাহারে এই কনভয় পৌঁছলে স্থানীয় যুদ্ধবাজ নেতাদের হাতে শত শত কোটি টাকার পণ্যের এই চালান আটক হয়। বেনজির ভুট্টোর সরকার পড়ে মহা মসিবতে। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের বাহিনী ব্যাকফুটে থাকায় পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইএসআই কর্নেল সুলতান ইমামের সাহায্য চান। কান্দাহারের এক মাদরাসার শিক্ষক, প্রাক্তন মুজাহিদিন ও সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের কমান্ডার মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে স্থানীয় মাদরাসার ছাত্রদের সহায়তায় মাল বোঝাই কনভয় উদ্ধার করে আইএসআই।

এ ঘটনার পরই লাইমলাইটে চলে আসেন মোল্লা উমর, কান্দাহারে অরাজকতা অবসানে স্থানীয় মাদরাসার ছাত্রদের প্রতি লড়াইয়ের ডাক দেন তিনি। এই খবর পাকিস্তানের পেশোয়ারের মাদরাসা ও শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে পৌঁছলে হাজার হাজার পশতুন বংশোদ্ভূত মাদরাসার ছাত্র বা তালেব সীমানা পেরিয়ে মোল্লা উমরের সাথে যোগ দেয়। তখনই মানুষ জানতে পারে 'তালেবান' নামের এক সংগঠনের কথা। ধারণা করা হয়, শুরুতে ৪০-৫০ জনের মতো অনুসারী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তালেবান। অবশ্য সে সময় মোল্লা উমরের ঠিক কতজন অনুসারী ছিল, সেই সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে পাক সীমান্তবর্তী মাদরাসাগুলোতে পড়াশোনার সাথে জড়িত ব্যক্তিরাই যে 'তালেবান' গড়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ বা বিতর্ক নেই।

# তালেবান উৎখাত কি পূর্বপরিকল্পিত

১৯৯৫-এর এক সকাল। সংগঠন হিসেবে তালেবান মাত্র একটি বছর পার করেছে। কাবুলে তখন বুরহান উদ্দিন রাব্বানি ও আহমদ শাহ মাসুদদের প্রতিষ্ঠিত সরকার। কিন্তু দক্ষিণের শহর কান্দাহারের চিত্রটা ব্যতিক্রম। এই শহরে তালেবানই সর্বেসর্বা। সরকারি কোনো নিয়মনীতি, হুকুমাত কান্দাহারকে স্পর্শ করে না। কারণ, সরকারের বাইরে এখানে ছায়া সরকার বসিয়েছে তালেবান। শহরটির যিনি কর্তা, তাঁর নাম মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান। কিছুক্ষণ আগে তাঁর কক্ষে ঢুকেছেন ধূসর রঙের স্যুট পরিহিত এক সুদর্শন বিদেশি। এই ব্যক্তি আর্জেন্টিনার তেল-গ্যাস উত্তোলন ও রপ্তানিকারক কোম্পানি বিরদাস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। নাম কার্লোস বুলঘোরেনি।

কয়েক বছর ধরেই এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির উপায় খুঁজতে কাজ করে যাচ্ছে বিরদাস। মধ্য এশিয়ার দেশ তুর্কমেনিস্তানে পাওয়া গ্যাস, পাইপলাইনের মাধ্যমে দক্ষিণে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত নিয়ে আসার প্রজেক্ট নিয়ে তারা মহাব্যস্ত। দেশটির সাথে কয়েক বছর আগেই দুটি খনি থেকে গ্যাস উত্তোলনের চুক্তি সই হয়ে আছে। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী এই গ্যাস নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন আফগানিস্তানের ভূমি।

আফগানিস্তান তখন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। দেশটিতে পূর্ণাঙ্গ কোনো শাসনব্যবস্থা নেই; শাসকের অবস্থাও নড়বড়ে। একেক শহরে একেক বাহিনীর রাজত্ব। কাবুলে রাব্বানির সরকার, কান্দাহারে তালেবান। এর বাইরেও মস্কোপন্থি পতিত শাসক নজিবুল্লাহর অনুগত আরেকটা গ্রুপ যুদ্ধে লিপ্ত। এই গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন উজবেক নেতা আবদুল রশিদ দোস্তাম। আর রশিদরা তৎপরতা চালাচ্ছে চতুর্থ বৃহত্তম শহর এবং বালখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই শরিফে।

কাজেই ব্যাবসা করতে হলে বিরদাসকে সব পক্ষের সাথেই বসতে হবে। সে কারণেই তালেবান গভর্নরের কাছে এসেছেন কোম্পানির চেয়ারম্যান। কিন্তু মোল্লা হাসান তাকে কোনো সুখবর দেননি, আবার ফিরিয়েও দেননি একেবারে। বিরদাসও চেয়েছেন যেকোনোভাবে তালেবানকে হাতে রাখতে। কারণ, তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, এই তালেবানই হতে চলেছে আফগানিস্তানের পরবর্তী পরাশক্তি।

আফগানদের অনুমতি পাওয়া না পাওয়ার অনিশ্চয়তার মধ্যেই বিরদাসের লোকজন ব্যাবসার স্বার্থে যুদ্ধবাজ নেতা ও গোষ্ঠীর দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে। আফগানিস্তান এমনই এক জায়গা, যেখানে রাজপরিবারের লোকজন রাজাকে তাড়িয়েছে, কমিউনিস্টরা একসময়ের কমরেডদের মেরেছে, তাজিক-উজবেকরা পশতুনদের হত্যা করেছে, আবার পশতুনরা কচুকাটা করেছে উজবেক-হাজারাদের। এখানে রুশদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা মুজাহিদরা আবার নিজেদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরেছে। গল্প নয়; আফগানিস্তানে এটাই এক আশ্চর্য সত্য।

কান্দাহারে কাজ সেরেই কাবুলের পথ ধরলেন কার্লোস। তিনি যখন কাবুল পৌঁছলেন, ততক্ষণে শহরের বুকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পরদিন রাব্বানি সরকারের সাথে তার বৈঠক। এই বৈঠকেই আফগান ভূমি ব্যবহারের অঙ্গীকার আদায় করে নেন বিরদাসের চেয়ারম্যান। গ্যাস পাইপলাইনের ব্যাপারে মাজার-ই শরিফের যুদ্ধবাজ নেতা দোস্তামের গ্রিন সিগন্যাল তো আগেই পাওয়া গেছে; বাকি থাকল কেবলই তালেবান। আর্জেন্টিনার কোম্পানি বিরদাস এ অঞ্চলে পা রাখার কয়েক মাস আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। স্বাধীনতা লাভ করে মধ্য এশিয়ার পাঁচ মুসলিম প্রজাতন্ত্র। তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান আর কিরগিজস্তান জ্বালানি সম্পদের দিক দিয়ে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্যে আফগানিস্তানের সাথে সীমান্ত রয়েছে তিনটি দেশের—তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান।

বিশ্বে জ্বালানি সম্পদের ভান্ডার কোথায় কোথায় আছে—এ নিয়ে বরাবরই আগ্রহ ছিল আমেরিকার। '৯০-এর দশকের শুরুতে আমেরিকার কিছু নিরীক্ষণ সংস্থা কাস্পিয়ান সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে কী পরিমাণ জ্বালানি মজুত আছে, তার ধারণাসূচক তথ্য প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, কাস্পিয়ান অঞ্চলে জ্বালানি

তেলের মজুত রয়েছে ১০০-১৫০ বিলিয়ন ব্যারেল। আর প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত রয়েছে ২৩৬-৩৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তেল-গ্যাসের মজুত রয়েছে কাজাখস্তান, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান আর তুর্কমেনিস্তানে। এ কারণেই পরবর্তী বছরগুলোতে এ অঞ্চলে আসে এক ডজনেরও বেশি বিদেশি কোম্পানি।

প্রথমে যে দেশটি বিরদাসের নজরে পড়ে, তার নাম তুর্কমেনিস্তান। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে কনকনে শীতের মধ্যে তুর্কমেনিস্তানের আশখাবাদে আসেন বিরদাস চেয়ারম্যান কার্লোস বুলঘেরেনি। ১৩ তারিখে দেশটির সাথে গ্যাসচুক্তি করে বিরদাস। এই কোম্পানি প্রথমত তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস রপ্তানি করতে চেয়েছিল দক্ষিণ এশিয়াতে, বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানে। বুলঘেরেনির ধারণা ছিল, অর্থ দিয়ে আফগান যুদ্ধবাজ নেতাদের কিনে ফেলা যাবে সহজেই। বিরদাসের পরিকল্পনায় ইরানকে বাদ দিয়ে আফগানিস্তান-পাকিস্তান পাইপলাইনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়; যার নাম তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান পাইপলাইন (ট্যাপ)। ৭৫০ মাইল দীর্ঘ এই পাইপলাইন পাকিস্তানের মুলতান হয়ে গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কথা। পরবর্তী সময়ে ভারতের দিল্লি পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনাও রয়েছে কোম্পানিটির হাতে। কিন্তু এই গ্যাস পাইপলাইন নিয়ে বিরদাস যে এক অদৃশ্য লড়াইয়ে নেমে পড়েছে, সেটা তারা আন্দাজও করতে পারেনি।

১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিরদাস তুর্কমেনিস্তানের দুটি আলাদা খনি থেকে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে, যার একটি থেকে প্রতিদিন তেল উত্তোলিত হয় ১৬,৮০০ ব্যারেল। আর অপর খনিতে পাওয়া যায় ২৭ টিসিএফ গ্যাসের মজুত। ফলে তাৎক্ষণিক বাজার ধরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে কোম্পানিটি।

১৯৯৬ সালে কার্লোস পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো আর তুর্কমেনিস্তানের ডিক্টেটর সাপার মুরাদ নিয়াজভকে জানান, তাদের প্রকল্পের সাথে আফগান যুদ্ধবাজ নেতারা একমত হয়েছেন। কাবুলে রাব্বানি সরকারের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি সই করেছিল বিরদাস। তার আগে পাকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের মধ্যেও একটি চুক্তি সই হয়। কাবুলের সাথে চুক্তি মোতাবেক প্রতিবছর শুধু ট্রানজিট ফি বাবতই রাব্বানি সরকারের পাওয়ার কথা ছিল ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন

ডলার। এই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৃথিবীর অন্য বড়ো বড়ো কোম্পানির সাথে অংশীদারত্বের জন্য উদ্যোগ নিল বিরদাস। এসব কোম্পানির মধ্যে ছিল ইউনোকলও। এটি তখন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ বৃহত্তম কোম্পানি। ইউনোকলের সাথে তুর্কমেনিস্তানের যোগাযোগ হয় ১৯৯৫ সালে। সে বছর দেশটির একটি প্রতিনিধি দল টেক্সাসের হিউস্টনে ইউনোকলের সদর দপ্তরে যায়। বিরদাসের আমন্ত্রণেই ইউনোকল কর্মকর্তারা আশখাবাদ ও ইসলামাবাদ সফর করেন; উদ্দেশ্য ছিল বিরদাসের পরিকল্পনা সরেজমিন যাচাই করে দেখা। যদিও ইউনোকল কর্মকর্তারা দুই দেশের মধ্যবর্তী আফগানিস্তান সফর করেনি। কারণ, রাশিয়ানরা চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তান নিয়ে আগের মতো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেনি সিআইএ; তার জায়গায় এসেছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। ফলে পাকিস্তানের ভাষ্যই আফগানিস্তানের ভাষ্য বলে মনে করে ইউনোকল।

তুর্কমেন নেতা সাপার মুরাদ নিয়াজভ তার দেশে মার্কিন বিনিয়োগ বাড়াতে চেয়েছিলেন। ইউনোকলকেই এজন্য বেস্ট অপশন মনে করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিরদাসের সাথে চুক্তি হয়ে গেছে ততদিনে। একরোখা নিয়াজভ তাই বিরদাসের সাথে করা আগের চুক্তিগুলো নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন, সরকারের অজ্ঞতার সুযোগে ৭৫ : ২৫ অংশীদারত্বের চুক্তিটি বাগিয়ে নিয়েছে বিরদাস। একরকম চাপের মুখে সরকারের অনুকূলে মুনাফার হার বাড়িয়ে দিয়ে ৭৫ থেকে কমিয়ে কোম্পানির শেয়ার করা হয় ৬৫ ভাগ। কিন্তু তাতেও তুষ্ট হননি নিয়াজভ। গ্যাস নিয়ে করা চুক্তির ব্যাপারেও চাপ দেন তিনি। এই অবস্থায় বিরদাস বুঝতে পারে, তুর্কমেন রাষ্ট্রপ্রধানের বিপরীতে ব্যাবসা টিকিয়ে রাখতে হলে তাদের কনসোর্টিয়ামে যেতে হবে, সাথে রাখতে হবে শক্তিধর কোনো কোম্পানিকে। তাই তারা দৃষ্টি দেয় ইউনোকলের দিকে।

১৯৯৫ সালের অক্টোবরে নিউইয়র্কে মুরাদ নিয়াজভ বিরদাস ও ইউনোকলের সাথে বৈঠক করে। এরপর বিরদাসের কর্মকর্তাদের সামনেই মার্কিন কোম্পানি ইউনোকল আর সৌদি আরবের ডেলটা ওয়েল কোম্পানির সাথে আলাদা চুক্তি সই করেন এই তুর্কমেন প্রেসিডেন্ট। এই চুক্তির আওতায় তুর্কমেনিস্তান থেকে আরও একটি পাইপলাইন আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত যাবে। এভাবে মূলত বিরদাসের প্রকল্পের আদলেই পাঠানো হবে প্রাকৃতিক গ্যাস। তবে এই চুক্তিতে আফগানিস্তানেও গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। ভারতের বাজার ধরাও ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। হতভম্ব বিরদাসের জন্য

এটি প্রথম ধাক্কা। পরবর্তী সময়ে তারা এই ক্ষতি সামলে উঠতে পারেনি। সেদিন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইউনোকলের গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার।

বিরদাস বুঝেছিল সমগ্র মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতি আফগান পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল আর তালেবানই হবে দেশটির নতুন শক্তি। তাই কাবুলের সাথে তারা যে ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি করেছে, সেটাই হবে তাদের রক্ষাকবচ। সুতরাং তালেবান ক্ষমতায় এলেও এটা ধরে রাখতে হবে। সেজন্যই তালেবান ও পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখলেন কার্লোস বুলঘোরেনি।

অন্যদিকে, ইউনোকল জেঁকে বসল তুর্কমেনিস্তানে। তারা সৌদির ডেলটা আর তুর্কমেন কোম্পানিকে সাথে নিয়ে বিরদাসের সমান্তরাল একটি গ্যাস পাইপলাইনের পরিকল্পনা হাতে নেয়, যাতে দৌলতাবাদের গ্যাস পাকিস্তানের মুলতান গ্রিডে যুক্ত করা সম্ভব হয়। এর বাইরে 'সেন্ট্রাল এশিয়ান অয়েল পাইপলাইন' নামে ১০৫০ মাইল দৈর্ঘ্যের একটি পাইপলাইন স্থাপনে তুর্কমেনিস্তান সরকারের সাথে চুক্তি সই করে ইউনোকল। দ্বন্দ্ব বাড়ে বিরদাস ও ইউনোকলের মধ্যে। ১৯৯৬ সালের জুলাইতে বিরদাস তার কার্যক্ষেত্রে অযথা হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের প্রকল্পকে নস্যাৎ করার অভিযোগ এনে হিউস্টনে ইউনোকলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়। এর মধ্যেই কাবুলে চলে আসে তালেবান। ভরসা পায় বিরদাস। শুরু হয় অনুমতির অপেক্ষা। ওদিকে তালেবানকে হাত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে ইউনোকলও।

তালেবান যোদ্ধাদের শক্তিশালী ঘাঁটি কান্দাহারে একটি অফিস খোলে ইউনোকল। পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টো পরবর্তী মুসলিম লীগ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে উভয়পক্ষকেই ঝুলিয়ে রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তালেবান। ১৯৯৮ সালে বিরদাসের মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। ইউনোকল কর্মকর্তারা সরাসরি মোল্লা উমরের কাছে গেলে তিনি 'না' করে দেন। শেষমেশ একটা বোঝাপড়া হয়েছিল অবশ্য। অন্যদিকে, একরকম বসেই গেল বিরদাস।

ওয়াশিংটন প্রথমে ইউনোকলকে দিয়ে তালেবানের সাথে ব্যাবসা করাতে চেয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালের শেষ দিকে তালেবান প্রতিনিধি দলকে টেক্সাসের হিউস্টনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মার্কিন কোম্পানি ইউনোকল।

দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা গউস। যদিও সেদিন কোনো চুক্তি হয়নি। এই অবস্থাতেই আফগানিস্তান হয়ে কাস্পিয়ান তেল ও গ্যাসের সম্ভাব্য রুট নির্ধারণে আরও একটি বুশ ঘনিষ্ঠ কোম্পানি পর্দার অন্তরালে আলাপ করছিল। কোম্পানির নাম এনরন; আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো জালিয়াতির কারণে ২০০১ সালের নভেম্বরে যেটি দেউলিয়া হয়ে যায়।

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মধ্য এশিয়ার বিশাল গ্যাস ও তেল রিজার্ভ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক রিলেশনসংক্রান্ত মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের একটি কমিটির কাছে আফগান পাইপলাইনের ব্যাপারে সরকারের সমর্থন চেয়েছিলেন ইউনোকলের ভাইস প্রেসিডেন্ট জন মারিসকা। তার প্রস্তাব করা পাইপলাইন তুর্কমেনিস্তান থেকে শুরু করে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান ও ভারত মহাসাগরে যাবে। এর মাধ্যমে ভারত, চীন ও জাপানের বাজার ধরা যাবে সহজেই। ২০০১ সালের জুলাইতে যুক্তরাষ্ট্র তালেবানকে প্রস্তাব দেয়—

> 'আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করো; নতুবা বোমা মেরে তোমাদের কবর রচনা করা হবে।'

তালেবান আফগান অবকাঠামো নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চেয়েছিল; আর চেয়েছিল স্বীকৃতি। তালেবান কেবল তেল-গ্যাসের পাইপলাইনের মাধ্যমে ইন্ডিয়ামুখী ট্রানজিটই হতে চায়নি, নিজেদের চাহিদাও মেটাতে চেয়েছিল পুরোদমে। ওয়াশিংটন তা মানেনি। নাইন-ইলাভেন আফগানিস্তানে হামলার অজুহাত দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট বুশের আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়াসংক্রান্ত নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূত জালমে খালিলজাদ। পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তান ও ইরাকে বুশের দূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। এ ছাড়াও কাজ করেছেন ইউনোকলের আফগান পাইপলাইনে। অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম নামের অভিযানে তালেবান ও আল-কায়েদাকে কাবুল থেকে হটানোর পর ইউনোকলের আরেক উপদেষ্টা হামিদ কারজাইকে আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন খালিলজাদ। তার ছেলে আলেক্সান্ডার বেনার্ড পিতার আনুকূল্যে মধ্য এশিয়ায় খনি ব্যবসায়ীদের পক্ষে কনসালটেন্সি করে থাকেন। পিতার গড়া প্রতিষ্ঠান গ্রাইফোন পার্টনারের এমডি এখন বেনার্ডই। মাইনিং করপোরেটদের জন্য আসন্ন আফগানিস্তান একটা ভালো সম্ভাবনা।

# খনিজ সম্পদের ভান্ডার আফগানিস্তান

আমেরিকা আফগানিস্তান ছেড়েছে বটে, তবে লম্বা লড়াইয়ের বিষাক্ত এক স্মৃতি নিয়ে তাদের ফিরতে হয়েছে। কিন্তু আমেরিকা কি এখানে কেবল তালেবান হটাতেই এসেছিল? আফগানিস্তান নিয়ে চীন-ভারতেরই-বা কেন এত আগ্রহ?

সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে দুই শত্রু চীন আর ইরানের দরজায় ঘাঁটি গাড়তে পারা ছিল আমেরিকার কৌশলগত ভূরাজনৈতিক সফলতা। আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার জন্যও বিষয়টি অস্বস্তিকর ছিল বটে। যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন পলিসি যারা দেখভাল করেন, আফগানিস্তানের মাটির নিচে থাকা সম্পদ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তারা চোখ সরায়নি। তবে এ যাত্রায় সফলতার মুখ দেখা হয়নি আমেরিকার। ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে সাজঘরে ফিরতে হয়েছে একদম শূন্য রানে।

আফগানিস্তান কি আসলেই খনিজ সম্পদের ভান্ডার? আর থাকলেও তা কী পরিমাণে আছে? পতিত কাবুল সরকারের কাছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য ছিল না। তবে দুই গ্রুপের লড়াইকে কেন্দ্র করে প্রায়ই আফগান খনিজ সম্পদ বিশ্ব গণমাধ্যমের বড়ো খবর হয়েছে। ধারণা করা হয়—দেশটির মাটির নিচে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা, তামা, নিকেল ও লিথিয়ামসহ প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার আছে। এসব বেচে বছরে নাকি অনায়াসে কয়েক বিলিয়ন ডলার আয়ও করা সম্ভব।

যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই খনিজ সম্পদ আশীর্বাদস্বরূপ। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোর ওপর শিল্পোন্নত দেশগুলোও বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। যেসব দেশের কৃষি উন্নত নয়, ভারী কোনো শিল্পকারখানাও নেই, তাদের অর্থনীতি টিকে আছে কেবল খনিজ সম্পদের ওপর ভর করে। এই সম্পদকে পুঁজি করেই ধনী

হয়েছে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, আরব আমিরাত ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো। চরম নিষেধাজ্ঞার মুখে থাকা কিছু দেশ কেবল খনিজ সম্পদের জোরে তাদের অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছে। যেমন : ইরান ও ভেনিজুয়েলা। কিন্তু ধনী হওয়ার এই সহজ সূত্র সবার বেলায় খাটে না। কিছু কিছু দেশকে এই খনিজ সম্পদই গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তার প্রমাণ মালি, সেনেগাল, কঙ্গো, এঙ্গোলাসহ আফ্রিকার দেশগুলো। আবার এমন কিছু দেশ আছে– যাদের পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ থাকার পরও দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাব কিংবা ভৌগোলিক প্রতিকূলতার কারণে সেগুলো উত্তোলন করতে পারছে না। তেমনই এক হতভাগ্য দেশ আফগানিস্তান।

আফগানিস্তানের লিথিয়াম নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়। এ নিয়ে বেশ কয়েকবারই প্রতিবেদন হয়েছে বিবিসিসহ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়। এসব প্রতিবেদনের দাবি মোতাবেক আফগানিস্তানে এত বেশি পরিমাণে লিথিয়াম আছে যে, লিথিয়াম মজুতের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের রাজধানী হয়ে উঠতে পারে দেশটি। এই অনুমান কি একেবারেই অমূলক?

রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী হিসেবে অনেক দিন ধরেই আফগানিস্তান রাশিয়ার নজরে ছিল। আরও বিশেষভাবে বললে, এটি ছিল রুশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী বাফার স্টেট। পঞ্চাশের দশকে এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট শাসনের সময় আফগানিস্তানে কিছু জরিপ চালিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তালেবানের কাছ থেকে কাবুল উদ্ধারের কয়েক বছর পর সেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলোর কয়েকটি ন্যাটোর বিশেষজ্ঞদের হাতে পড়ে। ১৯৭০-৮০ সালের এসব নথির সঙ্গে মিলিয়ে নতুন করে অনুসন্ধান চালায় পেন্টাগন। অনুসন্ধান শেষে কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পুরোনো শহর গজনিতে লিথিয়ামের বিপুল মজুত প্রমাণিত হয়।

লিথিয়াম কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কম্পিউটারের ব্যাটারি থেকে শুরু করে সামরিক সরঞ্জামাদি তৈরিসহ অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগে লিথিয়াম। ধারণা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক গাড়ির বৈপ্লবিক জোয়ার আসবে। আর তাতে প্রয়োজন পড়বে লিথিয়াম। ২০১০ সালের এক প্রতিবেদনে লিথিয়ামের কারণে আফগানিস্তানকে 'ভবিষ্যতের সৌদি আরব' বলেও প্রচার করেছিল বিবিসি। অবশ্য অন্য গণমাধ্যমেও এ নিয়ে বহু লেখালিখি হয়েছে। লাতিন আমেরিকার

দেশ বলিভিয়ায় লিথিয়ামের সর্বোচ্চ মজুত রয়েছে বলে এতদিন ধারণা করা হতো। কিন্তু পেন্টাগনের তথ্য অনুযায়ী, কেবল গজনি প্রদেশেই লিথিয়ামের মজুত রয়েছে বলিভিয়ার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। আফগানিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কটি কাবুল থেকে গজনি হয়েই কান্দাহার ও হেরাতের দিকে গেছে।

আফগানিস্তানে কপারের ভান্ডার রয়েছে বলেও প্রতিবেদনে এসেছে। দেশটির লোগার প্রদেশের মেস আয়নাক খনিতেই কপার মজুত আছে প্রায় ৬০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। তবে এটা স্রেফ অনুমান; প্রকৃত পরিমাণ এর কমবেশি হওয়া স্বাভাবিক। কাবুল থেকে দক্ষিণে এই খনি এলাকার দূরত্ব মাত্র ১৯ মাইল। আফগান সরকার চীনের মেটালোরজিক্যাল গ্রুপের সাথে ৩০ বছরের একটা চুক্তি করেছিল। তিন বিলিয়ন ডলার মূল্যের ওই চুক্তি অনুযায়ী কপার বা তামার খনিটি থেকে সম্পদ আহরণের কথা ছিল চীনা সংস্থাটির। অনেকটা তাড়াহুড়ো করেই চীন এই লিজ নিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আর খনি এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের কাজ না এগোনোয় উত্তোলন শুরু করা যায়নি। তবে সামনের দিনে সম্ভাবনাময় এই মজুত কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চাইবে না চীন। তাই তালেবানের কাবুল দখল আর আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারকে চীন বলেছে নতুন যুগের সূচনা।

কাবুল থেকে ১৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে বামিয়ানে হাজিজাক খনির অবস্থান। ষাটের দশকে এক আফগান-সোভিয়েত যৌথ গবেষণায় বলা হয়, নিদেনপক্ষে ১.৮ বিলিয়ন টন লৌহ আকরিক মজুত আছে এখানে। অনুমান করা হয়, এটিই এশিয়ার সর্বোচ্চ অনাবিষ্কৃত লৌহ আকরিকের মজুত। ২০১১ সালে ভারতের কয়েকটি কোম্পানি ১০ বিলিয়ন ডলার দামে এই ক্ষেত্রটি বরাদ্দ পায়; তবে চীনের মতো তারাও কাজে নামতে পারেনি।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা-ইউএসজিএস ও আফগানিস্তানের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা এজিএস-এর একটি যৌথ গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে—আফগানিস্তানের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল পেট্রোলিয়ামের জন্য বিশাল এক ক্ষেত্র। কেবল দেশটির উত্তরাঞ্চলেই আনুমানিক ১.৬ বিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল, ১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ৫০০ মিলিয়ন তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত রয়েছে।

আমু দরিয়া এবং আফগান-তাজিক অববাহিকায় ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যৌথভাবে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান শুরু হয়। পরে আরও ছয়টি তেলক্ষেত্র এবং আটটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় আমু দরিয়া অববাহিকায়। এগুলোতে আনুমানিক ৯৬৩ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল এবং ৫২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস থাকার সম্ভাবনার তথ্য প্রকাশ পায়। অনুরূপ আফগান-তাজিক অববাহিকাতেও আনুমানিক ৯৪৬ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল এবং ৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত আছে বলে ধারণা করা হয়েছিল একসময়।

আফগানিস্তানের নীলকান্তমণির বিশ্বজোড়া সুনাম রয়েছে। প্রাচীন সিল্ক রোড দিয়ে ব্যবসায়ীরা আফগানিস্তান থেকে মণি-মুক্তা নিজেদের সাথে নিয়ে যেতেন। এভাবে আফগানিস্তানের নীলকান্তমণি ছড়িয়ে পড়ে ইরাক, মিশর, ভারতসহ পুরো পৃথিবীতে। দেশটির বাদাখশানের নীলকান্তমণি ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তানের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। মূল্যবান এই রত্নপাথরের পাশাপাশি গোল্ডেরও ভালো মজুত রয়েছে দেশটিতে। গজনি, জাবুল, কান্দাহার ও তাখার প্রদেশসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রায়ই সোনা উত্তোলন করা হয়। তালেবান যে সমস্ত খাত থেকে অর্থ পেয়ে থাকে, তার মধ্যে একটা হলো খনিজ সম্পদ।

# আফগানিস্তানে শেষ কমিউনিস্ট শাসকের পরিণতি

আফগানিস্তানের ইতিহাসে আরও একটু ঘুরে আসা যাক। নজিবুল্লাহকে না টানলে ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। নজিবুল্লাহ ছিলেন আফগানিস্তানের শেষ কমিউনিস্ট শাসক। ২০২১ সালে কাবুল দখলের পর আফগানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেই দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হামিদুল্লাহ। গনি আশ্রয় নিয়েছেন আরব আমিরাতে। যাওয়ার সময় হেলিকপ্টারে করে নিয়ে গেছেন প্রচুর অর্থ। কিন্তু নিকট অতীতের বেশ কজন শাসকের ভাগ্য এতটা ভালো ছিল না। অর্থকড়ি তো দূরের কথা, নিজের জানটাও রক্ষা করতে পারেনি তারা। এদেরই একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ নজিবুল্লাহ।

আফগানিস্তানে এক দশকের বিরামহীন লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। মুজাহিদদের কাছে পরাস্ত রুশ সেনারা নজিবুল্লাহর ঘাড়ে আফগান শাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তড়িঘড়ি করে স্বদেশে ফিরেছিল। ঠিক তিন দশক আগে যখন মুজাহিদরা কাবুল ঘিরে ফেলেছিল, সেই সময় প্রাণ বাঁচাতে আশরাফ গনির মতো দেশত্যাগের পরিকল্পনা করেছিলেন নজিবুল্লাহও; কিন্তু গনির মতো এতটা ভাগ্যবান তিনি ছিলেন না। যাদের বিশ্বাস করতেন, তারা কেউ কথা রাখেনি শেষ পর্যন্ত। পরিণামে তাকে ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। শুধু তা-ই নয়; মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের বাইরে বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল তার ক্ষতবিক্ষত দেহ।

সোভিয়েতমিত্র নজিবুল্লাহ ১৯৪৭ সালের ৬ আগস্ট পাকতিয়া প্রদেশের গারদেজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কাবুল থেকে দক্ষিণ-পূর্বের প্রদেশ পাকতিয়ার দূরত্ব প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। নজিবুল্লাহর সাথে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা

শাহনেওয়াজ তানাই-এর এলাকাও এটি। পাকিস্তানের কাছাকাছি এই অঞ্চলের অধিবাসী অধিকাংশই পশতুন। নজিবুল্লাহ নিজেও জাতিতে পশতুন। ১৯৭৫ সালে কাবুল ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র অবস্থাতেই আফগান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, জেলও খাটেন কয়েক দফা। তবে তার রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয় পিডিপিএ (পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান)-এর হাত ধরে। ১৯৬৫ সালে কমিউনিস্টপন্থিদের হাতে গড়ে উঠেছিল দলটি। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে বাদশাহ জহির কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী দাউদ খানকে বরখাস্ত করার পরের বছর ১৯৬৪ সালে আফগানিস্তানে নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দেওয়া হয় তাতে। ফলে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের আওতায় চালু হয় গণতন্ত্র। আর এই সুযোগেই এগিয়ে যায় কমিউনিস্টরা। দেশের বেশিরভাগ মানুষ যেখানে অশিক্ষিত, গরিব ও ধর্মপ্রাণ, সেখানে শিক্ষিত এলিট শ্রেণির প্রায় সবাই ছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। এই শিক্ষিত শ্রেণির কাঁধে ভর করেই ধীরে ধীরে সবল হতে থাকে পিডিপিএ।

১৯৬৭ সালের পর পিডিপিএ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বাবরাক কারমালের নেতৃত্বে একদল পরিচিতি পায় 'পারচাম' নামে। আর নুর মুহাম্মাদ তারাকি ও হাফিজউল্লাহ আমিনের আরেকদল পরিচিত হয় 'খালক/খালকি' নামে। এই দ্বিতীয় গ্রুপটিই সরদার দাউদ খানকে প্রাসাদে হত্যা করে ১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। সেই সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নজিবুল্লাহকেও। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই কোন্দলে জড়িয়ে দল ছাড়েন তিনি। এরপর ইরানে আফগান রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কিছুদিন ইউরোপে নির্বাসিত সময় কাটান নজিবুল্লাহ। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন নুর মুহাম্মাদ তারাকি হত্যাকাণ্ডের বদলা হিসেবে হাফিজউল্লাহ আমিনকে হত্যা করে আফগানিস্তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিলে নজিবুল্লাহ দেশে ফিরে আসেন। ততদিনে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় পিডিপিএ'র প্রথম গ্রুপ 'পারচাম'। সেই সূত্রে কারমাল হয়ে ওঠেন একচ্ছত্র নেতা।

সোভিয়েত জামানায় আফগান গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান ছিলেন নজিবুল্লাহ। পরে তাকে প্রেসিডেন্ট পদে বসায় রাশিয়া। এদিকে আফগান মুজাহিদরা রুশ বাহিনী ও তাদের আফগান দোসরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জারি রাখে। আমেরিকার অস্ত্র ও অর্থে ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে তারা। দুশ্চিন্তায় পড়েন নজিবুল্লাহ। দ্বিধাগ্রস্ত নজিবুল্লাহ ইসলামিস্টদের মন রক্ষায় কমিউনিস্ট পূর্ববর্তী

'রিপাবলিক অব আফগানিস্তান' নাম ফিরিয়ে দেন, ইসলামকে ঘোষণা করেন প্রধান ধর্ম, কিন্তু তাতেও মুজাহিদদের মন রক্ষা হয়নি। অবস্থা বুঝে কাবুল সরকারের অনুগত সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিরা পলটি নিতে শুরু করে। তাদের কেউ যোগ দেয় মুজাহিদিন নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের বাহিনীর সাথে, আবার কেউ-বা আহমদ শাহ মাসুদদের দলে। চতুর্মুখী হামলায় সরকারি বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে ১৯৯২ সালে কাবুল দখল করে নেয় আফগান মুজাহিদিন। কাবুল থেকে নজিবুল্লাহকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালায় রুশমিত্র ভারত। কাবুলে নিযুক্ত তখনকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে করে গোপনে নজিবুল্লাহকে দিল্লি নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনামতো গাড়িতে উঠেও পড়েন নজিবুল্লাহ। কিন্তু কুখ্যাত 'যুদ্ধবাজ' হিসেবে পরিচিত যে আবদুল রশিদ দোস্তামকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, শেষ মুহূর্তে তারই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। আফগানিস্তানে এখনও সুবিধাবাদী যুদ্ধবাজ হিসেবে পরিচিত উজবেক নেতা দোস্তাম। বিজয়ী দলের সাথে হাত মেলাতে তিনি বরাবরই বেশ পারঙ্গম। তাকেই কিনা টাকা জোগাতেন নজিবুল্লাহ! অবশ্য টাকার জন্যই নজিবুল্লাহর পক্ষে লড়ত দোস্তামের বাহিনী। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর নজিবুল্লাহর ভান্ডার খালি হয়ে আসে। তাই টাকার উৎস সন্ধানে মুজাহিদদের সঙ্গে তলে তলে যোগাযোগ শুরু করেন দোস্তাম। শুধু এই সমীকরণের কারণে বিমানে চেপে ভারতে পালিয়ে আসার সময় বিমানবন্দরে ঢোকার মুখে নজিবুল্লাহর গাড়ি আটকে দেন খোদ দোস্তামেরই নিয়ন্ত্রণে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা।

রানওয়েতে বিমান দাঁড়িয়ে। ভেতরে অপেক্ষায় ভারত সরকার ও জাতিসংঘের প্রতিনিধিদল; কিন্তু বিমানবন্দরে ঢুকতেই পারেননি নজিবুল্লাহ। আবার প্রেসিডেন্ট ভবনে যে ফিরে যাবেন, সে উপায়ও ছিল না। কারণ, ভবনটি ততক্ষণে মুজাহিদদের কব্জায়। নিরুপায় নজিবুল্লাহ গাড়ি ঘুরিয়ে কাবুলে জাতিসংঘের একটি কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়েন। সাড়ে চার বছর এখানেই একরকম বন্দিজীবন কাটান তিনি। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে বুরহান উদ্দিন রাব্বানির নেতৃত্বাধীন সোভিয়েতবিরোধী মুজাহিদিন সরকারকে হটিয়ে কাবুলের দখল নেয় তালেবান। সেইসঙ্গে কপাল পোড়ে জাতিসংঘের দফতরে আশ্রয় নেওয়া নজিবুল্লাহর।

তালেবান হামলায় পলায়নপর তাজিক মুজাহিদিন নেতা আহমদ শাহ মাসুদ নজিবুল্লাহকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন। উত্তর দিক থেকে নিরাপদ করিডর

তৈরি করে সঙ্গীদেরসহ নজিবুল্লাহকে বের করে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাজিক নেতার এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন নজিবুল্লাহ নিজেই। রুশপন্থি এই পশতুন নেতা ভেবেছিলেন—যেহেতু তালেবানও পশতুনদেরই সংগঠন, কাজেই পশতুন নেতৃত্ব তালেবানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে পারবে এবং তিনি বেঁচে যাবেন। এই অবস্থায় পশতুনদের সাথে দা-কুমড়া সম্পর্ক থাকা কোনো তাজিক নেতার সাহায্য গ্রহণ উলটো পশতুনদেরই ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে। তাই নজিবুল্লাহ আর তার সঙ্গীদের রেখে সরে পড়েন 'পাঞ্জশিরের বীর' আহমদ শাহ মাসুদ; জাতিসংঘ কম্পাউন্ডের দখল নেয় তালেবান। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬-এর সকালে প্রেসিডেন্ট ভবনের বাইরে বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে।

# দ্বিতীয় অংশ

অমিতের সাথে আমার শেষ দেখা হয় ২০১২ সালে। দিনের শেষে সন্ধ্যায় ল্যাম্পপোস্টের আলোতে দাঁড়িয়ে একটুখানি হাই-হ্যালো, তারপর যে যার গন্তব্যে ছোটা। মনে হচ্ছে সেদিনই তো দেখা হলো; অথচ মাঝখানে অনেকগুলো বছরের ব্যবধান।

ব্যবধান কেবল দূরত্ব কিংবা সময়েরই হয় না; আত্মার হয়, চিন্তা বা বিশ্বাসের হয়, এমনকি হয় সম্পর্কেরও। আর সবকিছুই বাস্তবতার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা লুকাতে আমরা সন্ন্যাসীর অবয়ব ধরি। জীবন এমনই। নগরের স্পর্শে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় অল্পতেই। নিজের অস্তিত্বকেই তখন মনে হয় একদম অচেনা। নাগরিক কোলাহলের ভাঁজে পড়ে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়া এমনই একটা বিবর্ণ জীবনকে আমরা বয়ে বেড়াই শেষ দিন পর্যন্ত।

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, জীবন যখন বাস্তবতা খোঁজে, পেছনে ফেলে আসা সবকিছুই তখন অবাস্তব হয়ে যায়। এই বাস্তবতার কোনো সীমানা নেই, নেই কোনো সরল গাণিতিক ব্যাখ্যা।

এই যে ক্রমাগত ছুটে চলা; কীসের পেছনে ছুটছে মানুষ? অর্থ, সম্পদ, যশ কিংবা খ্যাতি। জীবনকে যতদিন জীবনের মতো মনে হয় না, ততদিন 'সময়' আমাদের পেছনে ধাওয়া করে, তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু 'প্রয়োজনীয়তা' যখন জীবনকে গ্রাস করে, উলটো আমাদেরই তখন দৌড়াতে হয় সময়ের পেছনে।

এবার বাড়িতে এসে নিজের শহরটা দেখার খায়েশ জাগল। এই শহরে গল্প, আড্ডার কতশত স্মৃতি! ভাবলাম শহরে যেহেতু যাওয়া হচ্ছে, এ সুযোগে নিজের কলেজটাও ঘুরে আসব একপাক। সাথে অমিতকেও ডেকে আনলে মন্দ হয় না।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ইন্টার শাখায় পড়েছি, রানি দিঘির পাড়ে ক্যাম্পাস। জমিদারের হাতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ আমলের কলেজ 'ভিক্টোরিয়া'।

কলেজ ছাত্রাবাসেই পার হয়েছে দুই দুইটি বছর। ধর্মসাগর, নানুয়ার দিঘি আর রানি দিঘির পাড়ে এরপরও কত আড্ডা হয়েছে, কিন্তু স্কুল জীবনের মতো বিশ্বরাজনীতি নিয়ে আলাপের নতুন সঙ্গী আর জোটেনি। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ নিয়েও আজকাল আর কারও সঙ্গে আলাপ জমে ওঠে না।

গাঁয়ের গোমতী ব্রিজ পেরিয়ে কংশনগর থেকে শাসনগাছার বাস ধরলাম। গন্তব্য ভিক্টোরিয়া কলেজ। অমিত চন্দ্র পাল আমার হাইস্কুল বন্ধু। ক্লাসের ফাঁকে প্রায়ই বিশ্বরাজনীতির আলাপে মজে যেতাম আমরা। বিশেষ করে টিফিনের সময়টাতে। ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধ শুরু হলে দুজনের নিত্যকার আলাপের ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়—সাদ্দাম, বুশ আর সাম্রাজ্যবাদ। উপসাগরীয় যুদ্ধের মতো ২০০৩-এর ইরাক যুদ্ধের সময়েও বাংলাদেশে সাদ্দামকে নিয়ে একধরনের হাইপ ছিল মানুষের মাঝে। মিলিটারি পোশাকে হাতে বন্দুক উঁচিয়ে ধরা সাদ্দামের সুন্দর সুন্দর ছবিযুক্ত ভিউ কার্ড আর পোস্টার বিক্রি হতো হাট-বাজার আর গলির মুখের স্টেশনারি দোকানগুলোতে। কিছু পোস্টার কিনে এনে রিডিংরুমের বাঁশের বেড়াতে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। কোনো মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে না পড়ে, আর্মি অফিসার না হয়েও সামরিক পোশাকই কেন তাকে পরতে হবে—এই ভাবনা অবশ্য মাথায় অনেকবারই এসেছে, জুতসই উত্তর পাইনি কখনো।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে বাস এসে থামল শাসনগাছায়। কুমিল্লা শহরে ইদানীং ইজিবাইকের রমরমা অবস্থা। বাস থেকে নেমেই চড়ে বসলাম একটাতে। এ কদিনে শহরটা বেশ বদলে গেছে। চারদিকে ধুলোবালি। শহরমুখী সরু সড়কটিতে পিলার বসানো হচ্ছে। সরকার ঘোষণা দিয়েছে, শিগগিরই ফ্লাইওভারে চড়ার সুখ পাবে নগরের মানুষ। অবশ্য কয়েক বছর বাদে কুমিল্লা দেখতে গিয়ে মনে হয়েছিল অপরিকল্পিত এই ফ্লাইওভার মূলত শহরের বুকে নেমে আসা এক অবাঞ্ছিত জঞ্জাল!

অটোতে চড়তেই জোবেদা ম্যাডামের কথা মনে পড়ল। ম্যাম ইন্টারে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। যমের মতো ভয় করতাম তাঁকে। একদিন ক্লাসে এসে ম্যাম দেখেন, ছেলেমেয়েদের মুখে কথার খই ফুটেই চলেছে। চিক্কুর মেরে বললেন—'ক্লাসে কি গরু ঢুকেছে নাকি? আমাকে শিক্ষক মনে হয় না?' বিনা মেঘে এমন আকস্মিক বজ্রপাতে চমকে উঠল সবাই। মুহূর্তেই পিনপতন নীরবতা নেমে এলো ক্লাসরুমে।

আমার আগেই রানি দিঘির পাড়ে অমিত এসে হাজির। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম মাতৃভান্ডারে—'চল! বহুদিন পর শহরে এলাম, একটু মিষ্টিমুখ করা যাক।' মাতৃভান্ডারের এই রসমালাই মোটামুটি দেশজুড়ে বিখ্যাত। এক কেজি কিনে ১০-১৫ মিনিট হেঁটে ধর্মসাগরের পাড়ে বসলাম দুজন। কাঠগোলাপ গাছের নিচে বসে আজ দুনিয়ার আলাপ হবে। বিশ্বরাজনীতি, পুঁজিবাদ, তেলরাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ, কমিউনিজম, মধ্যপ্রাচ্য—সব।

শুরুটা অমিতই করল। সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে তার ঘেন্নার শেষ নেই। ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশ ছেড়েছে সেই কবে, ফরাসিরাও কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে আফ্রিকাকে। এগুলো তো আর এমনি এমনি হয়নি; আন্দোলন হয়েছে, স্বাধীনতাকামীদের রক্ত ঝরেছে, তারপরই-না নিজেদের পুরোনো ঘর চিনেছে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গরা। তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—'নিউ কলোনিয়ালদের নিয়ে কী ভাবছিস? ৫০-এর দশকের পর থেকে যারা এশিয়া-আফ্রিকাকে কারবালা বানিয়ে খেলছে?' অমিতের উদ্‌বিগ্ন চোখ জবাব খুঁজছে। আর আমি পশ্চিমা সভ্যতার অসভ্যদের চরিত্র ব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত।

ফরাসিরা আফ্রিকাকে ব্যবহার করেছে নিজের উঠোন হিসেবে। আফ্রিকার মাটির নিচের সোনা, হীরক, ইউরেনিয়াম আর কয়লায় ফ্রান্সের অর্থনীতির ওজন ভারী হয়েছে। এই অঞ্চলের সম্পদ আর পুরাতত্ত্বের উপকরণ লুটে নিয়ে দুনিয়ার চোখে ফরাসিরা এখন শিল্পকলার ধারক-বাহক। কঙ্গোতে এক লিওপোল্ডের গণহত্যা বাদ দিলে বেলজিয়ানরা সে তুলনায় ফরাসিদের কাছে শিশু; এমনকি ভারতবর্ষ লুট করা ব্রিটিশরাও এতটা মন্দ পথে হাঁটেনি। সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতা আফ্রিকা যতটা দেখেছে, সে তুলনায় প্রায় কিছুই দেখেনি ভারতবর্ষ।

'সত্যি কি তা-ই?'

অমিতের প্রশ্নে আফ্রিকায় ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের ইতিহাস না টানলে পূর্ণতা আসছে না। 'দেখ অমিত! পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ এসেছে বাণিজ্য, ধর্ম আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা থেকে, তুই তা ভালো করেই জানিস। পুঁজিবাদ বিকাশের কারণে ইউরোপে প্রচুর পণ্য উৎপাদন হচ্ছিল। অর্থনীতির সাধারণ থিউরি বলে—কোথাও যখন কোনো জিনিস বা পণ্যের উৎপাদন বাড়ে, সেখানে সেই পণ্যের জোগান বেড়ে যায়। আর জোগান বেড়ে গেলে চাহিদা

কমে আসে। তখন ফলাফল কী দাঁড়ায়? দোকানপাট আর গুদামে অবিক্রিত জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে। ইউরোপের ক্ষেত্রেও হয়েছিল ঠিক তা-ই। নিজেদের বাজারে পণ্য যখন চাহিদার তুলনায় ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল, পুঁজিবাদীরা তখন বাজারের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ল বাইরের দেশে। এমন দেশ, যেখানে পুঁজিবাদ শক্তপোক্ত হয়নি। কারণ, পুঁজিবাদী দেশে গিয়ে তো লাভ নেই; সেখানেও তো অবিক্রিত পণ্যের বিরাট মজুত। ইউরোপের মাথায় তখন মুনাফার নেশা। কিন্তু বিক্রি না হলে মুনাফা আসবে কোত্থেকে? এই যে ভিনদেশি বাজারে সরাসরি ঢুকে নিজের অর্থনীতির পেট মোটা করার ধারণা—এটিই কলোনি স্থাপনের অন্যতম মৌলিক স্পিরিট। ইংরেজরা ভারতবর্ষে এ কারণেই এসেছিল। বাড়তি হিসেবে তারা এখান থেকে পেয়েছে শিল্পের কাঁচামাল, ধনরত্ন। ভারতের সম্পদ লুটে নিয়ে হয়ে উঠেছে পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী দেশ। এই তো কয়েক বছর আগে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেসে ছাপা এক গবেষণায় বলা হয়েছে—পৌনে দুইশো বছরের শাসনে ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে লুট করেছে প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এই অঙ্ক বর্তমান ব্রিটেনের মোট জিডিপির ১৬/১৭ গুণ বেশি!' অমিতকে বললাম—'তুই যদি ইউটিউবে গিয়ে ভারতীয় পলিটিশিয়ান শশী থারুরের ভিডিওগুলো দেখিস, তাহলেও ইংরেজদের লুটপাটের ভয়ংকর তথ্য পাবি।

এশিয়ার মতো আফ্রিকাতেও ইউরোপীয় মিশন ছিল বাণিজ্যিক। তারা জানত, স্বর্ণ আর হিরার মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার সেখানে। তাই বাণিজ্যের মাধ্যমে ক্ষমতার ভিত স্থাপন করেছে শুরুতে। তারপর ধীরে ধীরে ডানা মেলে প্রভাব বিস্তার করেছে স্থানীয় রাজনীতিতে। একপর্যায়ে দখলে নিয়েছে রাজস্ব সংগ্রহ ও শাসনকার্যের ভার। ইউরোপে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান চলত, তার বেশিরভাগ কাঁচামাল যেত আফ্রিকা আর এশিয়া থেকে।

আফ্রিকায় কলোনি গড়ার নেতৃত্ব দিয়েছে স্পেন আর পর্তুগাল। তাদের দেখাদেখি সেখানে আস্তানা গেড়েছে ডাচ, জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজরা। স্পেন প্রথমে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে কলোনি স্থাপন করে। তাকে অনুসরণ করে মরক্কোতে যায় পর্তুগাল। দুই দেশ আফ্রিকাকে রীতিমতো চুক্তি করে ভাগাভাগি করে নেয়। ১৮৮৪ সালের মধ্যেই ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের কবজায় চলে আসে পুরো আফ্রিকা।

১৮৮৪ সালের ১৫ই নভেম্বর বার্লিনে এক সম্মেলনে বসে সাম্রাজ্যবাদীরা। জার্মান চ্যান্সেলর অটোভন বিসমার্কের নিমন্ত্রণে সে সম্মেলনে যোগ দেয় ইউরোপের বাইরের আরও দুটি শক্তি। একটি তুরস্ক, আর অন্যটি একসময়ের ব্রিটিশ কলোনি যুক্তরাষ্ট্র। আসলে ব্রিটিশরা উপনিবেশবাদের সূচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমেই। ভার্জিনিয়ার জেমসটাউনে তারা তাদের প্রথম কলোনি স্থাপন করে সপ্তদশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে। বার্লিন সম্মেলনে যোগ দেওয়া ১৪টি দেশের মধ্যে কেবল রাশিয়া আর যুক্তরাষ্ট্রকেই আফ্রিকাতে কোনো কলোনি স্থাপন করতে দেখা যায়নি। সম্মেলনে ইউরোপের শক্তিগুলো আফ্রিকা মহাদেশকে বাপ-দাদার ভিটার মতো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সবচেয়ে বেশি দেশ পায় ব্রিটেন আর ফ্রান্স। অথচ যাদের ভূমি ইচ্ছেমতো ভাগ করা হলো, সেই আফ্রিকানদের কোনো প্রতিনিধি বার্লিনের সম্মেলনে ছিল না। এর ৩০ বছরের মাথায় অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে দেখা গেল, আফ্রিকার ৯০ ভাগ ভূমিই ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে!

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ইংরেজদের দখলদারত্ব অনেক দিন টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসি বেছে নিয়েছিল তারা। আসলে সব সাম্রাজ্যবাদীর চরিত্র এক ও অভিন্ন। ইউরোপীয়রা আফ্রিকাতে টিকেছিল গৃহযুদ্ধ আর সশস্ত্র সংঘাত জিইয়ে রেখে। নতুবা হিরা, সোনা, ইউরেনিয়াম, কয়লা আর তেলে সমৃদ্ধ আফ্রিকার এই বেহেপ চেহারা আমাদের দেখার কথা ছিল না। এক্ষেত্রে ব্রিটিশদের কিছুটা সুশীল বলা যেতেই পারে।'

অমিত ব্রিটিশদের পক্ষে কথা শুনে অভ্যস্ত নয়। তার মতে, এটা নিছক দালালি। আমাকে থামতে হলো। তাকে ফরাসিদের নিষ্ঠুরতার ইতিহাসটা তুলে ধরলাম। এবার অমিতই ঠিক করুক, সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে কারা অধিকতর নিষ্ঠুর—ব্রিটিশ না ফরাসিরা? ফলাফল যা-ই হোক, দুই পক্ষের ইতিহাসই লুটপাটের। একদল এশিয়া লুট করেছে, আরেকদল আফ্রিকা। নিউ কলোনিয়াল যুগে ফরাসিদের পাশাপাশি উৎপাত বেড়েছে আমেরিকান আর চাইনিজদের। ফ্রান্সের মুদ্রানীতি আর চীনের ক্রেডিট পলিসি ফাঁদে ফেলে রেখেছে কোটি কোটি আফ্রিকানের ভবিষ্যৎ।

তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মালি ও সেনেগালসহ আফ্রিকার অন্তত দুই ডজন দেশে কলোনি গড়েছিল ফরাসিরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক

সংকট ও স্বাধীনতাকামীদের দাবির মুখে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে যদিও-বা ফ্রান্স সব আফ্রিকান দেশকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়, কিন্তু লাগামমুক্ত করেনি মোটেই। আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর দুর্বলতা ও অনৈক্যের সুযোগে এক অর্থনৈতিক ফাঁদ তৈরি করা হয়। রাষ্ট্রগুলোর সাথে ফরাসিরা চুক্তি করে—এসব দেশের অর্জিত আয়ের সবটাই রাখা হবে এফসিএফএ নামের ব্যাংকে। মালি, সেনেগাল, নাইজার, বুরকিনা ফাসোসহ এক ডজনের মতো দেশকে এই চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়।

এফসিএফএ'র অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশ মুদ্রা হিসেবে হিসেবে ব্যবহার করে কারেন্সি অব ফ্রানক ফর আফ্রিকান (Currency of Franc for African), সংক্ষেপে সিএফএ। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলো তাদের অর্জিত আয় ও সম্পদ জমা রাখে এফসিএফএ নামের ব্যাংকে। কিন্তু যখন খরচ করবার প্রয়োজন হয়, তখন মাত্র ১৫ শতাংশ অর্থ উত্তোলন করার অধিকার পায় তারা। এরচেয়ে বেশি দরকার হলে আফ্রিকার দেশগুলোকে নিজেদের টাকা নিজেদেরই সুদের বিপরীতে ঋণ হিসেবে নিতে হয় এফসিএফএ থেকে। কিন্তু সেই ঋণও আবার ২০ শতাংশের বেশি নয়। ফরাসিরা এই ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করলেও তার লাভের তথ্য পায় না তালিকাভুক্ত দেশগুলো।

ফরাসিরা তাদের অধীনে থাকা দেশগুলোতে কিছু কিছু অবকাঠামো নির্মাণ করেছিল উপনিবেশ আমলে। আর এ সকল অবকাঠামোর নির্মাণ খরচ দেখানো হয়েছিল স্ব-স্ব কলোনির পক্ষে। এর ফলে এখনও এসব ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে ফরাসিদের কাছ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে। এ ছাড়াও আফ্রিকার দেশগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় ফ্রান্স তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল যে, দেশগুলোর সব খনিজ সম্পদ উত্তোলনের প্রাথমিক দাবিদার হবে ফ্রান্স। ফ্রান্স যদি কখনো তাতে আগ্রহ না দেখায়, তখনই কেবল চুক্তিতে যাওয়া যাবে অন্য দেশের সঙ্গে। এই যে দাসত্বের আধুনিক এক কাঠামো তারা গড়ে তুলল, তা থেকে অনেক দেশই আর বেরোতে পারেনি।

আমাদের আলোচনা ঘুরে গেল ভিন্ন এক প্রশ্নে। সৌদি আরবের মতো বিশাল এক দেশের অর্থনীতি টিকে আছে ভূগর্ভস্থ তেলের ওপর। কিন্তু তেলের ভান্ডার তো ফুরিয়ে আসছে, সত্তর-আশির দশক থেকে পরমাণুশক্তির দিকেও ঝুঁকে গেছে অনেকে। তা ছাড়া এখন সৌর বিদ্যুতেরও একটা বিপ্লব চলছে বলা যায়।

তেল ফুরিয়ে গেলে সৌদির কী হবে? আরব আমিরাত বা কাতারের মতো বহুমুখী অর্থনীতির দিকে তো তারা এগোতে পারেনি। অমিতের কথায় যুক্তি আছে—কোনো একমুখী অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র অনির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে পারে না। বিপদ আমাদেরও আছে। এই যে গার্মেন্টস শিল্পকেন্দ্রিক এখানকার অর্থনীতি, তার বিকল্প আমাদের ঠিক করে নিতে হবে।

অমিতকে বললাম, পৃথিবীতে তেলের ওপর ভরসা করে টিকে আছে গুটিকয়েক রাষ্ট্র। এদের বেশিরভাগেরই অবস্থান পারস্য উপসাগরের পাড়ে। যদিও আরব আমিরাত তেল-গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিদেশিদের জন্য অবাধ ব্যাবসা আর বিনিয়োগ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পর্যটন আর হোটেল ব্যাবসা থেকেও বড়ো একটা আয় হয় তাদের। সৌদিতে এতদিন এমনটা দেখা যায়নি। কিন্তু তারাও ইদানীং ভাবছে এসব নিয়ে। সেই ভাবনা থেকেই যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান ঘোষণা করেছেন সুদূরপ্রসারী প্ল্যান—ভিশন-২০৩০। এর আওতায় বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ডেকে বিনিয়োগের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তাদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থাও রক্ষণশীল সৌদির প্রায় সর্বত্র এখন প্রকাশ্য। আগে এ রকমটা কেবল আরামকো প্রকল্প এলাকাতেই দেখা যেত।

সৌদিতে সিনেমা হল খুলে দেওয়া হয়েছে, কনসার্টে এসে নিয়মিত রাজপথ মাতাচ্ছেন পশ্চিমা শিল্পীরা। বিশাল বাজেটের বিনোদন নগরী গড়ে তোলা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে। গড়া হচ্ছে শিল্প পার্ক, সিলিকন ভ্যালির মতো সিটি। আর সবই করা হচ্ছে যুবরাজ বিন সালমানের ভিশন-২০৩০ মিশনকে সামনে রেখে। সৌদিকে তিনি তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে বের করে মধ্যপ্রাচ্যের বিজনেস হাবে পরিণত করতে চাচ্ছেন।

অতীতে আমরা দেখেছি—তেল নিয়ে কত হানাহানি, রক্তপাত। তেল যার হাতে ছিল, তিনিই সমুদ্রের রাজা হয়েছেন; বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেছেন যখন যেভাবে খুশি। তেল বাদ দিলে বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। আর নিকট অতীতে তেলরাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি যে দেশটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, তার নাম সৌদি আরব। আমার মনে হলো—আমাদের আলোচনায় এ প্রসঙ্গ থাকাটা জরুরি। অমিতকে সেদিকে টেনে নিলাম ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই। তাহলে শুরু করা যাক সৌদি রাজতন্ত্র আর তেলরাজনীতির ইতিহাস।

# সৌদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

১২০ বছর আগের কথা। মাত্র এক বর্গকিলোমিটারের ছোট্ট শহর রিয়াদ। মরুভূমির বুকে ঘুমন্ত ও নিশ্চল এক শহর, যেন হাজার বছরেও কোনো পরিবর্তন হয়নি তার। রিয়াদের একসময়কার শাসকগোষ্ঠী ইবনে সউদ পরিবার রাজত্ব হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কুয়েত আমিরের আস্তানায়। সেই কুয়েত থেকে বের হয়েছে ৪০ জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী। তাদের পিছুপিছু আসছে আরেকটা দল। কোনো এক আঁধার রাতে রিয়াদ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেবে তারা। না কোনো জেনারেল, না কোনো সমরবিদ; এই বাহিনীর নেতৃত্বে আছেন আবদুল আজিজ নামে মাত্র ২১ বছরের এক যুবক। পুরো দলটিকে সাথে নিয়ে মরুভূমির নির্জন পথ ধরে ছুটে চলেছেন তিনি। কখনো বিশাল খেজুর বাগান, কখনো বিস্তীর্ণ চারণভূমি। হাজারো বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে; লোকজনের ভিড় এড়িয়ে, শান্ত শিকারির ন্যায় দলটি পৌঁছে গেল রিয়াদের দোরগোড়ায়। সবার পরনেই আরবের ঐতিহ্যবাহী জুব্বা, তার ভেতরেই লুকোনো আছে অস্ত্রশস্ত্র। ভাঙা দেয়ালের ফাঁক গলে শহরে ঢুকে পড়ল তারা। সিদ্ধান্ত হলো—যুবক কমান্ডার মাত্র পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে রিয়াদ গভর্নরের প্রাসাদে ঢুকবেন; বাকিরা লুকিয়ে থাকবেন আশপাশে।

রাতের জন্য অপেক্ষা। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামতেই ছয়জনের দলটি হানা দিলো রশিদি গভর্নরের কামরায়, কিন্তু গভর্নরের কোনো খোঁজই নেই। অপেক্ষায় শিকারি দলটির রাত কাটল সেখানেই। পরদিন সকালে গার্ডসহ রশিদি গভর্নরের খোঁজ পেয়ে অস্ত্র চালাতে দেরি করল না কুয়েত থেকে আসা যোদ্ধারা। তলোয়ারের কোপে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো গভর্নরের মস্তক। এরই মধ্যে ঝড়ের বেগে ফটক কাঁপিয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল বাকি সদস্যরা। রিয়াদ তখন ইবনে সউদ পরিবারের কবজায়। ধাপে ধাপে পুরো নজদেই উড়ল সউদ-এর পতাকা।

একসময় আজিজের পূর্বপুরুষরাই এই এলাকা শাসন করতেন। এরপর সউদ পরিবার কয়েক দফা ক্ষমতা হারায়, আবার ফিরেও পায়। বর্তমানে সৌদি আরবে

যে সাম্রাজ্য আমরা দেখছি, এটি মূলত পুরোনো সৌদি শাসনেরই তৃতীয় সংস্করণ। আর পুরো তিনটি সংস্করণ নিয়েই সৌদি সাম্রাজ্য। আরও একটু পেছনে গেলে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সৌদি সাম্রাজ্যের সূচনা হয় ১৭৪৪ সালে (হিজরি ১১৫৭) ঐতিহাসিক এক চুক্তির মাধ্যমে। সে সময় সৌদি রাষ্ট্রকে বলা হতো দিরিয়া আমিরাত, আর সেই আমিরাতই ছিল সউদ সাম্রাজ্যের প্রথম সংস্করণ বা প্রথম সৌদি রাষ্ট্র। তারপর কালানুক্রমে এই ভূখণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ মুহাম্মাদ বিন সউদের এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে হস্তান্তরিত হয়েছে ক্ষমতা। আজকের সৌদি আরব নামটির উৎপত্তি মূলত মুহাম্মাদ বিন সউদের পিতার নামানুসারেই। মুহাম্মাদ বিন সউদ ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবের মধ্যকার মিত্রচুক্তির মাধ্যমে প্রথম সৌদি রাষ্ট্র তথা দিরিয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুল ওয়াহাব নজদির অনুসারী মানে ওয়াহাবিরা এই চুক্তিকে দেখে তাওহিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হিসেবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এটি ছিল বড়ো পরিসরে সালাফি আন্দোলনের সূচনাবিন্দু।

সউদ পরিবার আর আবদুল ওয়াহাব নজদির পরিবারের মিত্রতার মাধ্যমে যে আমিরাতের জন্ম হয়েছিল, তার বিস্তৃতি ছিল আজকের সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, ওমান, কাতার ও ইয়েমেন পর্যন্ত। উসমানীয় সুলতানের মিশরীয় কমান্ডারদের হাতে এই আমিরাত ধ্বংস হয়।

১৮২৪ সালে তুর্কি ও মিশরীয়দের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া এক যুবরাজের মাধ্যমে আবারও সৌদি সাম্রাজ্য ফিরে আসে। সেই যুবরাজের নাম তুর্কি বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ। তার হাতে যে দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাকে বলা হতো নজদ আমিরাত। এটি ছিল সৌদি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সংস্করণ। এই আমিরাত টিকেছিল ১৮৯১ সাল অবধি; তবে দিরিয়া আমিরাতের তুলনায় এটা ছিল আকারে বেশ ছোটো। বলা হয়ে থাকে, সউদ পরিবারের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সমস্যার কারণেই দ্বিতীয় দফায় সৌদি রাজবংশের পতন হয়। ক্ষমতা চলে যায় রশিদি পরিবারের হাতে। আর পালিয়ে বেড়ানো সউদ পরিবারের ঠাঁই হয় কুয়েতে।

কুয়েত থেকে ৪০ জন সঙ্গী নিয়ে রিয়াদ গভর্নরের প্রাসাদ আক্রমণ করা সেদিনের সেই যুবক আজিজ কোনো সমরনায়কও ছিলেন না, আরব মানচিত্রের ওপর বিশেষ দখলও ছিল না তার। অথচ অনুগত ছোট্ট এক বাহিনী নিয়ে রিয়াদের দখল নিতে বড়ো কোনো বাধাই অতিক্রম করতে হয়নি তাকে।

বলা যায় প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পায়নি গভর্নরের বাহিনী। ক্ষমতা দখলের পর ইবনে সৌদ পরিবার রশিদ পরিবারকে তাদের স্বদেশভূমি জাবাল শাম্মার ও তার রাজধানী হাইলে তাড়িয়ে দিয়ে আসে।

মধ্য আরব তখন বেদুইন এলাকা। কারা ক্ষমতায় থাকবে এবং কারা থাকবে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা নির্ভর করত বেদুইন গোত্রগুলোর মন-মর্জির ওপর। এই বেদুইনদের সামলে রাখা ছিল রীতিমতো পর্বত জয়ের সমতুল্য। বেদুইনদের সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিল না। যখন-তখন সিদ্ধান্ত পালটাত, হুটহাট বিদ্রোহ করে বসত শাসকের বিরুদ্ধে। গনিমতের মালের লোভে জয়ীদের দলে ভিড়ে যেতেও দ্বিধা ছিল না তাদের। মানে শক্তি আর ক্ষমতা যেখানে, বেদুইনরাও সেখানে। রিয়াদ বিজয়ের ২০ বছর পর হাইলের দখল নিতে সক্ষম হন আজিজ। এরপর রশিদি রাজতন্ত্র তার রাজধানী হারিয়ে একরকম উৎখাতই হয়ে যায়। বয়স ৫০ ছাড়ানোর আগেই আজিজের হাতের মুঠোয় চলে আসে পবিত্র মক্কা, মদিনা, জেদ্দার নিয়ন্ত্রণ।

আজিজ যখন শিশু, তার বংশের লোকেরা মধ্য আরবে তখন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ইবনে সৌদ পরিবারের বাদশাহি চলে যায় ইবনে রশিদ পরিবারের হাতে। বাবা আবদুর রহমান ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সব আশা-ভরসাই ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু চোখের সামনে নিজ বংশের এমন আকস্মিক পতন মেনে নিতে পারেননি ছোট্ট আজিজ। তিনি দেখলেন, আমির ইবনে রশিদ নামে একজন ব্যক্তি তার পৈত্রিক নগরী রিয়াদ শাসন করছে। আর রশিদ পরিবারের ভাতাভোগী একটা পরিবার হিসেবে টিকে আছে সৌদ পরিবার। তারা এতটাই দুর্বল আর অক্ষম হয়ে পড়েছে যে, রশিদি বাদশাহ নিজেও সৌদ পরিবারকে গনায় ধরছেন না।

পরাজয় মানতে আপত্তি নেই আবদুর রহমানের, কিন্তু গুরুত্ব হারানোর বিষয়টা তার কাছে অশোভনীয় মনে হলো। রাগে, দুঃখে, অভিমানে সপরিবারে চলে গেলেন কুয়েত আমিরের দরবারে। ১৮৯৭ সালে রশিদ মারা গেলে রহমানের পুত্র আজিজ চিন্তা করলেন, এখনই ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার মোক্ষম সময়। কিন্তু শান্তিপ্রিয় বাবাকে কে বোঝাবে? বাবা আবদুর রহমান এসব নিয়ে আর ভাবতেই চান না। আজিজ ও তার ভাইয়েরা মিলে আবদুর রহমানকে রাজি করালেন। অনুগত গোত্র থেকে লোকজন জোগাড় করে গড়ে তোলা হলো সশস্ত্র ফৌজ। ৪০ জনের সেই ফৌজ নিয়েই আজিজ জয় করেন সৌদি আরবের আজকের রাজধানী রিয়াদ।

# তেল যেভাবে সৌদি আরবের চেহারা পালটে দিলো

রিয়াদ এখন আর ছোট্ট শহর নয়। শতাব্দীর ব্যবধানে তার পেট ফুলেছে, শহরটির আয়তন বেড়ে হয়েছে ১৯০০ বর্গকিলোমিটার। এখন কায়রোর পরে এটিই আরব বিশ্বের বৃহত্তম নগরী। হেজাজ থেকে শরিফ হোসেনের পরিবারকে হটিয়ে দেওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই আরব উপদ্বীপের ৮০ শতাংশ জায়গায় সউদ পরিবারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৩২ সালে তৃতীয় ধাপে সৌদি রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় 'সৌদি আরব' নামের নতুন রাষ্ট্রের ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আবদুল আজিজ ইবনে সউদের হাত ধরে আধুনিক সৌদির যাত্রা সেখান থেকেই শুরু।

'কিন্তু আমরা তো শুনে আসছি—সৌদি আরব আগে অতটা উন্নত ছিল না। সৌদি রাজা-বাদশাহ কিংবা সাধারণ নাগরিকরাও এতটা বিলাসী ছিল না, যেমনটা আমরা এখন দেখছি।'

অমিতকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—এটা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। সৌদি রাজপরিবারের আজকের যে চাকচিক্যময় বিলাসী জীবনযাত্রার প্রধান কারণ তেল।

সৌদি আরব যে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একটি বিশ্বযুদ্ধ পার করে আরেকটি যুদ্ধের গ্রাউন্ড খুঁজছে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। আমেরিকা তখন বিশ্বরাজনীতি আর অর্থনীতিতে ইমার্জিং টাইগার। পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসতে মরিয়া এই দেশটির বিশেষ নজর পড়ল আরব ভূখণ্ডের দিকে। নয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর বাদেই সৌদিতে মার্কিন তেল ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বাড়ল। কারণ একটাই, পাশের দেশ ছোট্ট বাহরাইনে মাটির নিচে পাওয়া গেছে তেলের মজুত। ওদিকে ইরানে বিশাল তেলের ভান্ডার পেয়ে মধ্যপ্রাচ্যে

আর অতটা নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি ব্রিটিশরা। তাই তাদের নজর এড়িয়ে সৌদি পড়ে যায় আমেরিকানদের হাতে। আমেরিকানরা বছরের পর বছর মরুভূমির মাটি খুঁড়েছে, জ্যামিতিক মানদণ্ডে মিলিয়ে দেখেছে খনি পাওয়ার সম্ভাবনা। চারটি পশ্চিমা কোম্পানির একটি জোট নগদ পাউন্ডের বিনিময়ে সৌদি মরুভূমির নিচে তেল অনুসন্ধানের অনুমতি পায়। সৌদি অর্থ মন্ত্রণালয় হিসাব করে দেখল—যদি তেল না-ও মেলে, তারপরও ৫৫ হাজার পাউন্ড তারা এমনি এমনি পাবে। অতএব খারাপ কী? এই নগদ অর্থ হাতছাড়া করতে চাননি বাদশাহর প্রিয় অর্থমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ সোলায়মান। ফলে হাজার হাজার মাইল দূরের একটি দেশের হাতে আরবের তেল ভান্ডারের চাবি তুলে দেওয়া হয়।

রাজপরিবারের কেউ না হলেও সোলায়মান ছিলেন সৌদি বাদশাহর বিশেষ পছন্দের ব্যক্তি। এজন্য বাড়তি ক্ষমতাও ভোগ করতেন তিনি। বাদশাহ আজিজের জমানায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল তারই হাতে। সোলায়মানকে বলা হতো 'মিনিস্টার ফর এভরিথিং'। বলা হয়ে থাকে, সোলায়মান ট্রেজারি পরিচালনায় গোপন ও আলাদা অ্যাকাউন্ট সিস্টেম চালু করেছিলেন। এটা গল্প নাকি সত্যি, তা অবশ্য জানা যায়নি। তার ইচ্ছেতেই মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোকে তেল অনুসন্ধানের অনুমতি দেন সৌদি বাদশাহ। সৌদিতে জন্ম নেয় আরামকোর মতো কোম্পানি। পালটে যেতে থাকে আরব অর্থনীতির চেহারা। মরুভূমির বুকে ঠাঁই নিতে থাকে ইট-পাথরের আধুনিক সব ভবন।

এক-দুবার নয়, সপ্তমবারের চেষ্টায় সৌদি আরবের দাম্মাম এলাকায় প্রথম তেলের খনির খোঁজ মেলে ১৯৩৮ সালে। এর পরপরই স্থানীয় দাহরান এলাকায় অফিস খুলে বসে মার্কিন ব্যবসায়ীরা। তাদের হাত হয়ে ছোট্ট গ্রাম দাহরান রূপ নেয় পশ্চিমা ছিটমহলে। গড়ে ওঠে সড়ক, বিমানবন্দর, গলফ ক্লাব, টেনিস কোর্ট, সুইমিংপুল প্রভৃতি। ফলে দাহরান আর গ্রাম থাকেনি, মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার আর কারিগরদের হাতের স্পর্শে রূপ নেয় দাহরান সিটিতে। বাদশাহ আবদুল আজিজ এমন একটি পরিবর্তনের স্বপ্নই দেখেছেন এতদিন। আমেরিকানরা তার চোখ খুলে দিয়েছে। তাই দাহরানের মতোই পুরো সৌদিকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন আজিজ। মার্কিন কোম্পানিগুলোর হাতে দাহরান ও তার আশপাশে কনস্ট্রাকশনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। সৌদিতে মার্কিনিদের অনুপ্রবেশ বাড়ে, ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হতে

থাকে মরুভূমির বালুচর। এভাবে মার্কিনিদের কাছে তেল বেচে যে ডলার আয় হতো, তা আবার ঘুরে মার্কিনিদের পকেটেই যেত থাকল অগোচরে।

প্রাকৃতিক সম্পদের আশীর্বাদে সৌদির চেহারা পালটেছে, মাটির তৈরি ঘরের জায়গায় উঠেছে ইট-পাথরে নির্মিত রাজপ্রাসাদ। বড়ো বড়ো ভবন, শপিংমল, মহাসড়ক; বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল—এভাবে সৌদির অবকাঠামো সমৃদ্ধ হয়েছে। ফলে তেল বেচে পাওয়া পেট্রোডলার যে কেবল সৌদিকে আধুনিক ও তারুণ্যের রূপ দিয়েছে, তা কিন্তু সেই ডলার নয়া যৌবন দিয়েছে আমেরিকার অর্থনীতিকেও।

কেবল আমেরিকাই নয়, সৌদি আরবের তেল ভান্ডারের দিকে নজর পড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নেরও। লেলিন ততদিনে পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, চালকের আসনে সহযোদ্ধা স্ট্যালিন। কিন্তু ক্রমেই তিনি কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠলেন। তার নিপীড়ন-নির্যাতন নিজ দলের মধ্যেও আতঙ্ক বাড়িয়ে তুলল। জেদ্দা ও হেজাজ অধিকারের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন আবদুল আজিজের গড়া সৌদি আরবকে স্বীকৃতি দিলেও দুই দেশের সম্পর্ক টিকেছিল মাত্র কিছু বছর। আজিজ যে বছর সৌদি আরব নামক নয়া রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন, সে বছরই সৌভিয়েত নাগরিকদের জন্য হজ নিষিদ্ধ করেন জোসেফ স্ট্যালিন। তিক্ততার শুরু সেখান থেকেই। তবে বিরোধ চরমে ওঠে—যখন সৌদি আরবে দায়িত্ব পালন করা দুই সোভিয়েত মুসলিম কূটনীতিককে ফাঁসিতে ঝোলায় স্ট্যালিন। দুজনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা হয়—সৌদি আরবের পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তি এবং সোভিয়েতের বিপক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন তারা। এদের একজন ছিলেন তাতার মুসলিম করিম খাকিমভ।

তাতার মুসলমানরা নিগ্রহের শিকার হয়েছে স্ট্যালিনের বাহিনীর হাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার অভিযোগে ক্রিমিয়ার অনেক তাতার পরিবারকেই বিতাড়ন করা হয়েছে। রুশ বাহিনী ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিলে স্ট্যালিন শাস্তি হিসেবে রেলগাড়িতে গাদাগাদি করে তাদের নির্বাসনে পাঠান। এ সময় রোগে ভুগে আর না খেয়ে মারা যায় অনেকে। অবশ্য আশির দশকে রুশ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের আমলে তাতাররা ক্রিমিয়ায় বাস করার সুযোগ পায়। এখন আবার ক্রিমিয়া ইউক্রেনের কাছ থেকে রাশিয়ার দখলে চলে যাওয়ায় উদ্‌বেগ বেড়েছে।

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে আধুনিক সৌদি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আজিজ ইবনে সউদকে হেজাজ ও নজদের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। মূলত ব্রিটিশদের থেকে আরবদের কাছে টানতেই এত তড়িঘড়ি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ থেকেই ব্রিটিশ আধিপত্য কমাতে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার পরিকল্পনা হাতে নেয় রুশ সরকার। তখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। আজিজের রিয়াদ জয়ের আগে রশিদিদের ভয়ে কুয়েতে নির্বাসিত ছিল সউদ পরিবার। সেই সময় রুশ নাবিকদের একটি দল এসেছিল কুয়েতে। তাদের সাথে আবদুল আজিজ ইবনে সউদ ও তাঁর বাবা আবদুর রহমানের পরিচয় হয়। রিয়াদ জয়ের পর প্রভাবশালী বিদেশি শক্তিগুলোর সমর্থন প্রয়োজন ছিল আজিজের। তাই তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী পাওয়ার হাউজ ব্রিটেনের সমর্থন না পেয়ে তিনি ঝুঁকে পড়েন মস্কোর দিকে। পাশের এলাকাগুলোতে দায়িত্ব পালন করা রুশ ডিপ্লোমেটদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন তরুণ এই সৌদি শাসক। আজিজের আমন্ত্রণে ১৯০৩ সালে পারস্যে দায়িত্ব পালন করা এক রুশ কূটনীতিক কুয়েতে আসে। তখনও মক্কা-মদিনার নিয়ন্ত্রণ শরিফ পরিবারের হাতে। তারাও মস্কোকে নিজেদের পক্ষে ভেড়াতে চাইলেন। কারণ, শরিফ পরিবারও পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছিল না ব্রিটিশদের ওপর।

১৯২৪ সালে করিম খাকিমভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত হিসেবে জেদ্দায় পাঠানো হয়। কিন্তু সৌদি ভূখণ্ডের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শরিফ হোসেন আর আবদুল আজিজ ইবনে সউদের মধ্যে কাকে বেছে নেবে সৌভিয়েত ইউনিয়ন? খাকিমভ যখন জেদ্দায় শরিফ হোসেনের কাছে এলেন, তখন আর হেজাজ তার নিয়ন্ত্রণে নেই। পবিত্র মক্কা চলে গেছে আজিজের মুঠোয়। ফলে খাকিমভের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে গেল—দুজনের মধ্যে তিনি বেছে নিলেন আবদুল আজিজকে। ১৯২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি করিম খাকিমভ জেদ্দা থেকে আবদুল আজিজ ইবনে সউদের বাসভবনে যান। সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে ইবনে সউদকে দেওয়া স্বীকৃতিপত্র তুলে দেওয়া হয়। দুই বছর পর নতুন রুশ রাষ্ট্রদূত হিসেবে সৌদি আরব আসেন আরেক মুসলিম নাজির বে তুরইয়াকুলভ। তার চেষ্টায় বাদশাহ আবদুল আজিজ রুশ পণ্যের ওপর থেকে পূর্বে জারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ব্রিটেনের প্রভাবে দীর্ঘদিন ধরে জারি ছিল এই বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা।

১৯৩২ সালে তথা সৌদি আরব নামক রাষ্ট্রের ঘোষণার বছরে বাদশাহ আজিজ মস্কোর দেওয়া আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ঋণের ফাঁদে ফেলে ব্রিটেনই তাকে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছিল। এরপর সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে কোনো ধরনের সহায়তাও আর নিতে চাননি আজিজ। বলশেভিক নেতা জোসেফ স্ট্যালিনও ততদিনে পরিণত হয়েছেন রক্তপিপাসু দানবে। স্বাভাবিকভাবেই মস্কোর সাথে রিয়াদের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করল।

১৯৩২ সালে হজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্ট্যালিন সরকার। এতে সৌদির সাথে রুশদের দূরত্ব আরও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় করিম খাকিমভ পুনরায় জেদ্দায় ফেরেন, আলোচনা শুরু করেন সৌদি বাদশাহর সাথে নতুন করে বাণিজ্য চুক্তি করার জন্য। কিন্তু মস্কোর উর্ধ্বতন মহলের কোনো আগ্রহ ছিল না তাতে। জোসেফ স্ট্যালিন মনে করতেন, আবদুল আজিজের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে লাভবান হওয়া অসম্ভব। সৌদি বরং নিজের সুবিধামতো সময়ে ব্রিটেনের দিকেই ঝুঁকবে।

সৌদি আরবে আমেরিকানদের তেল আবিষ্কারের আগের বছর, ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে করিম খাকিমভকে মস্কোতে ডেকে পাঠানো হয়। মস্কো পৌঁছার পর তাকেসহ তুরইয়াকুলভকে আটক করে রুশ সরকার। গোয়েন্দাগিরি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাদের। স্ট্যালিন প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্ত বাদশাহ আজিজকে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তোলে। কারণ, খাকিমভ ও তুরইয়াকুলভ সৌদি রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ মিত্রতে পরিণত হয়েছিলেন। খাকিমভের মৃত্যুদণ্ডের পর মার্কিন ভূতত্ত্ববিদরা সৌদি আরবের দাহরানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল খনির সন্ধান পায়। মস্কো জেদ্দায় নতুন রুশ রাষ্ট্রদূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পুরোনো দ্বন্দ্বের জেরে রাশিয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় সৌদি আরব। সৌদি আরবে থাকা অন্যান্য রুশ কর্মকর্তাদেরও নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সৌদি-সোভিয়েত কূটনৈতিক সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক জোড়া লাগতে পেরিয়ে যায় দশকের পর দশক।

# আরামকো

আমেরিকানরা তেল কোম্পানি আরামকো প্রতিষ্ঠার দুই দশক পর আবদুল আজিজের ছেলেরা কোম্পানিটি কিনে নিয়েছিল। এরপর তেলই সৌদির প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। তেলের টাকায় সৌদিরা F-15 যুদ্ধবিমান কেনে; তৈরি করে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি। সৌদির প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতেও পৌঁছে যায় রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোনের সেবা।

আরামকো শুরুর দিকে কেবল সৌদি ভূখণ্ডেই তেল অনুসন্ধান করত; আর কোথাও তেল পাওয়া গেলে তা শোধন করে বিক্রি করত দেশি-বিদেশি গ্রাহকদের কাছে। কিন্তু তেল ব্যাবসার বাজার সম্প্রসারিত হলে আরামকোও আর নিজেকে সৌদিতে গুটিয়ে রাখেনি; বরং পুরো দুনিয়ার তেল বাণিজ্যের নেতৃত্ব দিতে বিশ্বজুড়ে বিজনেস অপারেশনে যায় কোম্পানিটি। দেশের বাইরে কোথাও নতুন তেল শোধনাগার বানায়, আবার পুরোনো শোধনাগার কিনে নিতে থাকে কোথাও কোথাও। মাত্র এক জেনারেশন বাদেই বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অন্যতম পাওয়ারফুল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয় সৌদি আরব।

আবদুল আজিজ যে বছর আধুনিক সৌদি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন, সে বছরই সৌদিতে এসেছিল রকফেলারের 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অব ক্যালিফোর্নিয়া'। তারাই আরও কয়েকটি কোম্পানিকে সাথে নিয়ে খুলেছিল আরামকো (অ্যারাবিয়ান-আমেরিকান অয়েল কোম্পানি)। আমরা আজকে শেভরন নামের যে কোম্পানির কথা জানি, তারই আদি মাতা হলো স্ট্যান্ডার্ড অয়েল। বলা হয়েছিল—তেল পাওয়া গেলে শিল্পসমৃদ্ধ ভূমিতে পরিণত হবে সমগ্র মরুভূমি। ১৯৩৩ সালের একদিনে *নিউইয়র্ক টাইমস* তার ফ্রন্ট পেইজে সৌদি বাদশাহ

আর স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির মধ্যকার চুক্তির খবরটি প্রকাশ করে। পত্রিকার শিরোনাম ছিল এ রকম—

'AMERICANS GET OIL CONCESSION IN ARABIA; TRANSFORMATION OF DESERT LIFE MAY RESULT.'

এই চুক্তি আমেরিকান বাণিজ্যিক স্বার্থের আরেকটি দ্বার উন্মোচন করে দেয়। সৌদি আরবের তেল থেকে প্রচুর অর্থ কামিয়ে নেয় আরামকো। সৌদি আরবও মুনাফার ভাগ পায়। আসল কথা হলো—রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ আর উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য সৌদি আরবের দরকার ছিল প্রচুর নগদ অর্থ। শুরুতে আজিজের ধারণা ছিল মরুভূমিতে তেল পাওয়া যাবে না। কিন্তু অচিরেই তার ভুল ভেঙে দেয় আমেরিকান ভূতত্ত্ববিদরা। অথচ ইরানে সবার আগে যে বিদেশিরা তেলের খোঁজ পেয়েছিল, সেই ব্রিটিশরাও সৌদি নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

মূলত সৌদির অদূরে বাহরাইনে তেলপ্রাপ্তির ঘটনাই উজ্জীবিত করেছিল আমেরিকান তেল ব্যবসায়ী ও ভূত্ত্ববিদদের। আর সেজন্যই আশান্বিত বাদশাহ আজিজ আমেরিকাকে তেল অনুসন্ধানের অনুমতি দিতে একদমই দেরি করেননি। মরুর সন্তান আজিজ আমেরিকা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতেন না, অনুরূপ মরুভূমি নিয়ে আমেরিকানদেরও ছিল না কোনো গভীর ধারণা। আমেরিকানরা তখন সৌদি আরবে এলে জেদ্দাতেই থাকতেন। কারণ, এটাই ছিল সৌদির একমাত্র শহর; যেখানে বিদেশিদের থাকার অনুমতি ছিল। অবশ্য তখন পর্যন্ত কোনো মার্কিন কূটনীতিক জেদ্দাতে ছিলেন না।

১৯৩৩ সালের ৯ মে সৌদি ভূখণ্ডে মার্কিন কোম্পানির পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের প্রস্তাব বাদশাহর কাছে উত্থাপন করেছিলেন অর্থমন্ত্রী সোলায়মান। চুক্তি সই হওয়ার পর দ্রুতই সৌদিকে ৩৫ হাজার পাউন্ড দিয়ে দেওয়া হয়। ১৮ মাস পর দেওয়া হয় আরও ২০ হাজার পাউন্ড। এ ছাড়াও ভাড়া বাবদ ৫ হাজার পাউন্ড দেওয়ার চুক্তি হয়। এর বাইরে ৫০ হাজার দেওয়া হবে তেল পাওয়া গেলে। এক বছর বাদে আরও ৫০ হাজার দেওয়া হবে তেল বিক্রির রয়্যালটি থেকে। সৌদি আরবের অর্থমন্ত্রণালয় দেখল, গুণে গুণে ৫৫,০০০ পাউন্ড এমনি এমনি পেয়ে যাচ্ছে তারা।

আগেই বলেছি, বাদশাহ আজিজ মরুভূমিতে তেল পাওয়া নিয়ে বেশ সন্দিহান ছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল, তেল পাওয়া না গেলেও যেন নিদেনপক্ষে মাটির নিচে কিছু জলাধার মিলে। তাতে অন্তত পানির কষ্ট করতে হবে না আরবদের।

১৯৩৮ সালের মার্চে সাত নম্বর কূপ থেকে প্রথম তেলের সন্ধান মেলে। শুরুতে দৈনিক ১৫৮৫ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা যেত। তিন দিন পর সেটা গিয়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার ব্যারেলে। দাম্মামের এই খনির দিকে চোখ পড়ে সানফ্রান্সিসকোর। আরও ৪ লাখ ৪০ হাজার বর্গমাইলে তেল খোঁজার অনুমতি বাগিয়ে নেয় মার্কিন তেলচক্র। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম সৌদিতে আরও একটি বড়ো তেলখনি আবিষ্কৃত হয়। বছর খানেক বাদেই পারস্য উপসাগর হয়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করে সৌদি তেল। ইরানের পর প্রতিবেশী সৌদি আরবের এবার ইতিহাস গড়ার পালা।

১৯৪৭ সালে আরামকো দৈনিক ২ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। এ সময় প্যালেস্টাইনে চলছিল আরব-ইহুদি সংঘাত। মার্কিনিদের কাছে তেল সরবরাহ করা নিয়ে আজিজের ওপর চাপ ছিল আরবদের। কিন্তু আজিজ ব্যাবসা ঠিক রাখতে চাইলেন। এমনকি প্রতিবেশীদের সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে নিরাপত্তা সহায়তা চাইলেন আমেরিকার কাছে। আরামকো থেকে তখন প্রতিবছর গড়ে যে ১৫ মিলিয়ন ডলার আসত, তা ঝুঁকিতে ফেলতে চাননি তিনি। শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ তৎপরতা। আজিজ প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্রের একদমই বিরুদ্ধে ছিলেন না। তবে তার ভয় ছিল ভবিষ্যতে অন্যান্য আরব অংশেও বিস্তার লাভ করতে পারে এই রাষ্ট্র। তাই হ্যারি ট্রুমানকে আশঙ্কার কথা জানিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন আজিজ। মার্কিন তেল ব্যবসায়ীরা ১৯৩২ সাল থেকে সৌদিতে থাকলেও ১৯৪৬ সালের জুনের আগ পর্যন্ত সেখানে অফিসিয়াল কোনো মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিল না। জে রাইভস চাইল্ড হলেন সৌদিতে নিয়োগ পাওয়া প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তিনি এমন একসময় মরুভূমিতে এলেন, যখন পশ্চিম ইউরোপ আর মার্কিন সামরিক কাজের জন্য সৌদির তেল হয়ে উঠেছে স্মরণকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে সৌদি আরবের তেলের বাজার আগের অবস্থান ছাড়িয়ে গেল। এতদিন কর আর হজ-ই ছিল সৌদির আয়ের উৎস। এখন বাড়তি হিসেবে যোগ হলো তেল। ১৯৪৬ সালের মধ্যেই হজকে ছাড়িয়ে সৌদি আরবের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে উঠল পেট্রোলিয়াম অয়েল।

আরামকো কোম্পানি সৌদি আরবের খনি এলাকা দাহরানের চেহারাটাই পালটে দিলো। বাদশাহ আজিজও কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই মার্কিনিদের ফ্রি স্টাইলে কাজ করার সুযোগ দিলেন। স্টাফদের সুবিধা দিতে রেলসড়ক,

বিমানবন্দর এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধার আবাসিক এলাকা গড়ে তুলল আরামকো। অচিরেই দাহরান নামের ক্ষুদ্র গ্রামটি একটা পশ্চিমা ছিটমহলে রূপ নিল। সুইমিংপুল, টেনিস কোর্ট, গলফ কোর্স সবই ছিল সেখানে। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়াররা এলো, সৌদি অবকাঠামো উন্নত হতে থাকল তরতর করে। রিয়াদ ও জেদ্দা সমৃদ্ধ শহরে রূপ নিল। মক্কায় আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা হলো হাজিদের থাকার জন্য। এসব কনস্ট্রাকশনের কাজও পেল সানফ্রানসিসকোভিত্তিক কোম্পানি 'বেকটেল'। কোম্পানিটি হাজার মাইল লম্বা একটি পাইপলাইন করতে চাইল, যাতে সৌদির তেল ইরাকের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলো পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। উন্নয়নে নতুন মাত্র যোগ করতে রিয়াদ ও পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরনগরী দাম্মামের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইলেন বাদশাহ আজিজ। এজন্য তিনি ৪৬ সালে সোলায়মানের কাছ থেকে যাওয়া ১০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে চাইলেন। এর আগে কেবল বাগদাদের সাথেই আরব উপদ্বীপের রেল যোগাযোগ ছিল। নতুন রেললাইনটি প্রস্তুত হতে সময় লাগল চার বছর। আর এই রেল যোগাযোগ তৈরি বাবত আমেরিকানরা কামিয়ে নিল অন্তত ৫০ মিলিয়ন ডলার।

আমেরিকানরা সড়ক-মহাসড়ক আর পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করল। কাদার দেয়ালবিশিষ্ট রাজকীয় প্রাসাদ রূপ নিল অতিকায় দালানে। ৫০-এর দশকের মধ্যেই সৌদির প্রধান শহরগুলোতে বিদ্যুৎ ও পরিবহন সুবিধা চালু হলো। রিয়াদ ও জেদ্দায় জমে উঠল হোটেল, রেস্টুরেন্ট হাসপাতাল ও ক্যাফের ব্যাবসা।

# আরামকো নিয়ে বিবাদ

কথায় বলে, বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয় না। লেলিন, স্ট্যালিন আর ট্রটস্কি মিলে রুশ বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তাদের মিত্রতা ভেঙে যায় লেলিনের জীবদ্দশাতেই। স্ট্যালিন ক্ষমতায় আসার পর তার ভয়েই দেশ ছাড়তে হয়েছে একসময়ের মিত্র ট্রটস্কিকে। শেষ পর্যন্ত জীবনও দিতে হয়েছে তাকে। একই পরিণতি হয়েছিল মুঘল সম্রাট আকবরের অভিভাবক বৈরাম খানেরও। বলা হয়ে থাকে, আকবরের লোকজনই হত্যা করেছে তাকে। আফগানিস্তানে একসাথে রাজনীতি করা কমিউনিস্টরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে ক্যু করে শেষ হয়েছে। আরামকো-সৌদির দোস্তিও তেমন মোড় বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। তবে বড়োসড়ো একটা ধাক্কা আসে ৫০-এর দশকের শুরুতে।

১৯৫০ সালের মে মাসে, দাহরানে থাকা আরামকোর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস টেরি ডিউসকে নিজের অফিসে ডেকে নিয়ে যান সৌদি অর্থমন্ত্রী সোলায়মান। টেরিকে বার্তা দেওয়া হয়, কোম্পানির মুনাফার বড়ো একটি অংশ দিয়ে দিতে হবে সৌদি আরবকে। সোলায়মানের কথায় অবাক বনে যান ডিউস। সৌদি অর্থমন্ত্রী বলছেন—'তোমরা কত টাকা মুনাফা করো আমরা জানি! মার্কিন সরকারকে মুনাফার ৩৮ শতাংশ কর দিচ্ছ তোমরা।'

আরামকোর হাঁড়ির খবর কী করে জানলেন সৌদি অর্থমন্ত্রী? তিনি তো আধুনিক কোনো অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমই ফলো করেন না। বিস্মিত ডিউস চিঠি লিখলেন কোম্পানির সদর দফতর সানফ্রান্সিসকোতে। কোম্পানির বোর্ড কর্মকর্তারা কোনো কূলকিনারা খুঁজে পেলেন না। শেষে সহায়তা চেয়ে হাজির হলেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দরবারে। শুরু হলো দূতিয়ালি। রেলরোড তৈরির বিপরীতে সৌদি সরকার আরামকোকে ৬ লাখ ডলারের যে কিস্তি দিয়ে আসছিল,

তা স্থগিত করা হলো বাদশাহকে খুশি করতে। ১৯৪৯ সালে ট্যাক্স বাবদ যুক্তরাষ্ট্রকে ৪০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে আরামকো। কোম্পানিটি দেখল, সৌদি অর্থমন্ত্রীর হিসাব ঠিকই আছে। আরামকো জানে, ইরান ও অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির মধ্যকার তিক্তকার কথা। কোম্পানিটির প্রেসিডেন্ট তখন ফ্রেড মুর। সৌদির চাপাচাপিতে লিখিত উত্তর দিলো আরামকো—

> 'সৌদি অর্থমন্ত্রীর এ ধরনের অবন্ধুসুলভ আচরণ আরামকোর জন্য উদ্‌বেগের ব্যাপার। আমরা বিশ্বের পুরো তেল ইন্ড্রাস্টিতে অনেকটা নজিরবিহীনভাবে সৌদিতে তেল পেয়েছি এবং এই তেল বাজারজাত করছি। আমরা সৌদি সরকারকে আশাতীত মুনাফাও দিয়েছি। এজন্য আমরা মোটেও অখুশি নই। কিন্তু কোম্পানি সৌদি সরকারকে ঠিক কতটুকু সাপোর্ট দিতে পারবে, তার তো একটা সীমাবদ্ধতা আছে। মূল কথা, তেল নিজেই তার পথ ঠিক করে নেবে।'

দুই পক্ষের আলোচনা ভেস্তে গেল। আরামকোর জবাবে চটে গেলেন আবদুল্লাহ সোলায়মান। আরামকো তার সাথে আলোচনা পর্যন্ত করতে রাজি না! অথচ কোম্পানিটি তার জৈবনিক রক্ত পেয়েছে সৌদির দয়া থেকে। আমেরিকানরা তেল খোঁজার সুযোগটিও পেয়েছিল সোলায়মানের কারণেই। সেই সোলায়মানকে গুরুত্ব দিচ্ছে না আমেরিকা? আরামকো মূলত সোলায়মানকে চিনতে ভুল করেছে। ওরা ভেবেছে—'একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে দুর্নীতিকে ভর করে। দুর্নীতিই হয় তার টিকে থাকার জ্বালানি। শাসকের চারপাশ ঘিরে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা হয় লুটের সম্পদ। সোলায়মান নিশ্চয় সে রকমই কেউ।' ভুলটা এখানেই। আরামকোর কর্তারা ভাবতে থাকে, তাদের উত্তোলিত তেলের অর্থ দিয়েই সৌদি সরকার চলে এবং সেটাই একমাত্র সত্য। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতে পারবে না সৌদি সরকার। বড়োজোর তারা যেটা করতে পারে তা হলো, সৌদিতে আরামকোর কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করা। আর বাস্তবে হয়েছেও তা-ই।

সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল তো বাঁকা করতেই হয়। ফ্রেড মুর যখন আলোচনায় বসতে রাজি হলেন না, একটা উচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন সোলায়মান। সৌদি কাস্টমস কর্মকর্তাদের তিনি নির্দেশ দিলেন—'আরামকোর যত প্যাকেজ সৌদিতে ঢুকবে সবকিছু খুলে পরীক্ষা করতে হবে।' এর কিছুদিন পর আরামকোর রেডিও সুবিধা বন্ধের নির্দেশ এলো সরকারের তরফ থেকে।

দিনদিন চাপ বাড়তে থাকল। এয়ারক্রাফট ল্যানডিং ফি, পাইপলাইন সিকিউরিটি ফি—এ রকম আরও নানা কাস্টমস ডিউটি বাড়িয়ে দিলেন সৌদি অর্থমন্ত্রী।

মাটির নিচের তেল যে সৌদি রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, তা অবশ্য সোলায়মানের বুঝতে বাকি নেই। কাজেই এই তেলের নিয়ন্ত্রণ কীভাবে আমেরিকার হাত থেকে নিজেদের হাতে নেওয়া যায়, সেই কৌশল খোঁজা জরুরি। দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থেই তা প্রয়োজন। রাজপরিবারের তৎপরতা টের পায় আরামকো। সমঝোতার চেষ্টায় এগিয়ে আসে কোম্পানিটি। এরপর মুনাফা ভাগাভাগির প্রস্তাব পেলেন সৌদি অর্থমন্ত্রী সোলায়মান। তিনি বললেন—'ভালো কথা। আমি তাহলে প্রিন্স ফয়সালের সাথে কথা বলি; দেখি তাকে রাজি করাতে পারি কি না। তবে প্রতি ব্যারেল তেলে ৪০ শতাংশ রাজস্ব বাড়াবে, এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিতে হবে।'

বাদশাহ আজিজের দ্বিতীয় পুত্র ফয়সাল প্রতাপশালী রাজপুত্র। কথা বলেন কম; কিন্তু যা বলেন, খুব ভেবে-চিন্তেই বলেন। আরামকোর কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠালেন প্রিন্স ফয়সাল। সৌদি প্রতিনিধিদের নিয়ে বসলেন তাদের সাথে। ফয়সালের চাওয়া—ব্যাবসা থেকে আরামকো যা মুনাফা পাবে, তার দ্বিগুণ দিয়ে দিতে হবে সৌদি আরবকে। আমেরিকাকে আর ট্যাক্স দেওয়া চলবে না, দিতে হবে সৌদি সরকারকে। প্রিন্স ফয়সালের চাপাচাপিতে চুক্তি একটা হলো অবশ্য—মুনাফার অর্ধেক পাবে সৌদি আর বাকি অর্ধেক আরামকো। আরামকো যে একদিন সৌদি আরবের নিজের প্রতিষ্ঠান হবে, এই সফলতাই হলো তার প্রাথমিক ধাপ।

আরামকোর কর্তাদের চোখে ঘুম নেই। যে রুক্ষ ভূমির দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না, সেই উষর মরুর বুক চিরেই বিপুল তেলের ভান্ডার খুঁজে পেয়েছে তারা। এখানে তারা নগর গড়েছে, প্রতিষ্ঠা করেছে স্কুল-কলেজ, শপিং কমপ্লেক্স আর হাসপাতাল। পশ্চিমা শহরের মানদণ্ডে নিয়ে এসেছে এই ধূ ধূ বালুচর। হাজার বছরের মাটির ঘরের ঐতিহ্য থেকে বের করে আরবদের ঠাঁই দিয়েছে কংক্রিটের ছাদের নিচে। অথচ এখন কিনা সেই অবদানের কোনো মূল্যায়ন-ই নেই। তাহলে কী ব্যাবসা গোটানোর সময় চলে এসেছে আরামকোর? সৌদি বাদশাহ অবশ্য আমেরিকানদের উদ্দেশে বললেন—

> 'আমরা চাই না তোমরা চলে যাও। এখনও চাচ্ছি না, কখনো চাইবও না। তোমাদের কত বছর এখানে তেল অনুসন্ধানের সুযোগ

দেওয়া হয়েছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি তোমাদের এখানে চাই এবং আমি চাই, আমাদের দেশের উন্নয়নে আরামকো এখানে চিরকাল থাকুক। তোমরা আমাদের সন্তান। কখনোই যেন না শুনতে হয়, তোমরা চলে যাচ্ছ। তোমাদের জায়গায় অন্য কোনো কোম্পানিকেও দেখতে চাই না আমরা।'

রাজতন্ত্রে বাদশাহ যা বলেন, সেটাই চূড়ান্ত আইন। বাদশাহর প্রতিশ্রুতিতে এবার বেশ স্বস্তি পেল আরামকো। কর্তাব্যক্তিরা ভাবলেন—নাহ, কোনো ঝামেলা নেই তাহলে। সৌদির সাথে সম্পর্ক ঠিকই আছে। এবারের মতো তাহলে মিটেই গেল সবকিছু। আসলে আরামকোর লোকজন ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। এটা ছিল সৌদি সরকারের প্রথম চাল। এর মাধ্যমেই আরামকোর ওপর সৌদি সরকারের থাবা বসানো শুরু হলো মাত্র।

১৯৫০ সাল। ইরানের সাথে তেল ব্যাবসা নিয়ে বিবাদ বাড়ছে ব্রিটিশদের। অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির ওপর চাপ বাড়ছে, তেলশিল্পকে জাতীয়করণের দিকে ঝুঁকছে দেশটির সরকার। সে বছরই সৌদিকে ১১০ মিলিয়ন ডলার দেয় আরামকো। পরের বছরের মে মাস থেকে প্রতিদিন সাড়ে আট লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলন শুরু হয়। এতদিন এক লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হতো। যদিও আরামকোর মাতব্বরিতেই বেশিদিন টিকেনি সেই সমঝোতা। সৌদি প্রতিনিধিদলের সাথে এক বৈঠকে আরামকো জানতে চায়—তেল থেকে পাওয়া অর্থ দেশটি কোন খাতে ব্যয় করে। বিষয়টাকে হালকাভাবে নেয়নি সৌদি রাজপরিবার। সৌদি আরব ভাবল—এই প্রশ্ন তেল কোম্পানির এখতিয়ারের বাইরে এবং স্রেফ খবরদারি। বাদশাহ আজিজ ক্রুদ্ধ হলেন। পরে তায়েফের রাজপ্রাসাদে যখন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেয়ার তার সাথে দেখা করতে গেলেন, বাদশাহ বললেন—

'আমি এটা বরদাশত করতে পারি না। সৌদি তার টাকা দিয়ে কী করবে না করবে, সেটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। এটা বাদশাহকে অপমান করার শামিল!'

পরে অবশ্য সৌদি আরব ছাড়তে হয়েছিল আরামকোর সেসব কর্মকর্তাদের। বদলে নতুন একঝাঁক কর্মকর্তা পাঠায় আমেরিকা। তখনও আমেরিকায় সৌদির তেল ব্যবহৃত হতে শুরু করেনি। নিজেদের আর দক্ষিণ আমেরিকার তেল

দিয়েই মেটানো হচ্ছিল সকল চাহিদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সৌদির তেল ব্যবহার শুরু হলো। একসময় কোরিয়া যুদ্ধেও আরামকোর তেল গেল আর সারা বিশ্বে মার্কিন বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানিতে পরিণত হলো সৌদি আরব। এর মধ্যেই একটি সৌদি জাতীয় তেল কোম্পানির সম্ভাবনা জেগে উঠল। তাহলে কি এবার সত্যিই বিদায় নিতে চলেছে আরামকো?

১৯৫১ সালের অক্টোবরে তেলশিল্প জাতীয়করণ করেছিল ইরান। তারা আবাদান রিফাইনারি নিয়ন্ত্রণে নিলে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা সেখান থেকে চলে যায়। সেইসাথে ভারতীয় ও ফিলিস্তিনি কর্মীদেরও সরিয়ে নেয় ইংরেজরা। গড়ে তোলা হয় ন্যাশনাল ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি। তবে ব্রিটিশদের আকস্মিক চলে যাওয়ায় দক্ষ মানবসম্পদের অভাবে কারিগরি সংকটে পড়ে ইরান কর্তৃপক্ষ। তার ওপর ইংরেজরা ইরানি সিদ্ধান্তকে সামরিকভাবেও জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পারস্য উপসাগরে আবাদানের সন্নিকটে অবরোধ দিতে মোতায়েন করা হয় জঙ্গিবিমান। ব্রিটিশ নৌবাহিনী ইরানি তেলের ট্যাংকারগুলোকে বাধা দেয়। কারিগরি সংকটের কারণে একদিকে যেমন তেলের উৎপাদন কমল; অন্যদিকে যতটুকু উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, বাইরে পাঠানো গেল না সেটুকুও। এর ফলে ইরানের রপ্তানি আয় ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অর্থাভাবে সরকার পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ল। যার ফলাফল আমরা দেখলাম—৫৩-তে এসে মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার মদদে মোসাদ্দেক সরকারের পতন।

এদিকে আরামকো-সৌদির ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলছেই। আরামকোকে চাপে রাখার নিত্যনতুন ফন্দি নিয়ে প্রায়ই হাজির হতেন সৌদি কর্মকর্তারা। একসময় জানানো হয়, সৌদি ব্যবসায়ী এবং প্রিন্সরা আরামকোর শেয়ার কিনতে চান। তখনও প্রতিষ্ঠাকালীন চারটা আমেরিকান কোম্পানির হাতেই ছিল আরামকোর শেয়ার। এগুলো হলো—জার্সি স্ট্যান্ডার্ড (এক্সন), টেক্সাকো, স্ট্যান্ডার্ড অয়েল অব নিউইয়র্ক (মবিল) এবং স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অব ক্যালিফোর্নিয়া (শেভরন)। অর্থমন্ত্রী সোলায়মান একটি আমেরিকান কনসালটিং ফার্মকে নিয়োগ দেন আরামকোর আদ্যপান্ত খুঁজে বের করতে। তারা হিসাব করে দেখল, আরামকো সৌদি আরবকে ট্যাক্স হিসেবে যে টাকা দেয়, তা নেহায়েত সামান্য। এতদিন প্রতি ব্যারেল তেল বেশি দামে বিক্রি করে সৌদির অজান্তে ২০ মিলিয়ন ডলার পকেটে পুরেছে তারা। এভাবেই ধুকতে ধুকতে চলতে থাকল সৌদি-আরামকো রসায়ন।

# মুখোমুখি বাদশাহ সউদ ও ভাই ফয়সাল

বাদশাহ আজিজ যে বছর রশিদি পরিবারের কাছ থেকে রিয়াদের দখল নেন, সে বছরই তার বড়ো পুত্র সউদ-এর জন্ম। ১৯৫৩ সালে বাবার মৃত্যুর পর সউদই হন সৌদি আরবের বাদশাহ। কিন্তু তাকে নিয়ে রাজপরিবারে কানাঘুষা, অস্বস্তি—দুটোই ছিল। সৌদিতে যেখানে অ্যালকোহল পান নিষিদ্ধ, সেখানে বাদশাহ তা নিয়মিতই পান করতেন বলে খবর ভেসে বেড়াত চারপাশে। স্বভাবে তিনি ছিলেন অনেকটাই উড়নচণ্ডী। দুই হাতে খরচ করতেন। আর বাদশাহর এই অতিরিক্ত ব্যয়ের স্বভাবই একসময় রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এ ছাড়া সউদ বিয়েও করেছেন দফায় দফায়। অবশ্য এক মিছিল পরিমাণ স্ত্রী-সন্তান থাকা আরব কালচারে নতুন কিছু নয়। বাদশাহ আজিজের বিশ্বস্ত অর্থমন্ত্রী সোলায়মান, দুই ভাই সউদ আর ফয়সালের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। আজিজের মৃত্যুর বছরখানেক বাদেই পদ ছেড়ে দেন তিনি। সোলায়মানও গেলেন, সৌদি আরবও পতিত হতে থাকল অর্থনৈতিক সংকটের দিকে।

১৯৫৮ সালের দিকে সংকট গভীর থেকে গভীরতর হলো। সৌদি সরকারের ঋণ বেড়ে গেল হুট করে। নির্মাণকাজ অব্যাহত রাখতে অতিরিক্ত অর্থ ছাপানোর নির্দেশ দিলেন বাদশাহ। অর্থনীতির বেসিক রুল অনুযায়ী দেখা দিলো মুদ্রাস্ফীতি। সামরিক-বেসামরিক চাকরিজীবিদের কয়েক মাসের বেতন গেল আটকে। ট্রেজারিতে কী পরিমাণ অর্থ আছে, কেউ-ই সেটা জানত না তখন। এই সময় আরব রাজতন্ত্রগুলো হাতছাড়া হয়ে চলে যাচ্ছিল জাতীয়তাবাদীদের কাছে। মাত্র কয়েক বছর আগেই মিশরে ক্ষমতায় জুড়ে বসেছিলেন জাতীয়তাবাদী জামাল আবদেল নাসের। সৌদির উত্তর সীমান্তে গণ অসন্তোষ কাজে লাগিয়ে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিল আর্মির একটা অংশ।

নাসের সিরিয়াকে নিয়ে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের ঘোষণা দিলে অথই জলে পড়ল সৌদি রাজপরিবার। এ যাত্রায় রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখাই হয়ে উঠল প্রধান চ্যালেঞ্জ।

১৯৫৮ সালের মার্চে প্রিন্স তালালের বাসায় রাজপরিবারের জুনিয়র যুবরাজরা একত্রিত হয়। সউদের চেয়ে ২৯ বছরের ছোটো তালাল। উদার সংস্কারবাদী প্রিন্স তালাল যোগাযোগমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন একসময়। সৌদি ন্যাশনাল এয়ারলাইন্স কোন মন্ত্রনালয়ের অধীনে রাখা হবে—এ নিয়ে ভাই মিশালের সাথে বিরোধে জড়িয়ে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন। সেদিনের বৈঠকে জড়ো হওয়া প্রিন্সদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন প্রিন্স আবদুল্লাহ। তার পরামর্শেই তালাল বিমানে করে ছুটে যান সউদের কাছে। বাদশাহ সউদ তখন মদিনায়। বাদশাহকে দেশের অর্থনীতি ও সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবনের অনুরোধ জানায় তালাল। পরামর্শ দেওয়া হয় সংস্কারের। কিন্তু শূন্য হাতে তাকে রিয়াদে ফিরিয়ে দেন সউদ।

ক্রাউন প্রিন্স ফয়সালের সাথে সবাই আলোচনায় বসলেন—কী করা যায়? কী সংস্কার আনা যায় অর্থনীতিতে? তালাল মজলিশে শূরা গঠনের প্রস্তাব দেন, যারা রাজপরিবারকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ দেবেন। তালাল ভেবেছিলেন, সউদের ক্ষমতা কাটছাঁট করতে এটিই অবিকল্প সমাধান। বাদশাহ আর ক্রাউন প্রিন্সের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হলো। পরামর্শমাফিক ডিক্রি জারি করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন বাদশাহ। সরকারের প্রধান হলেন ফয়সাল। এতদিন যে আশঙ্কা করেছেন, সিংহাসনে আরোহণ করার পর ফয়সাল ট্রেজারিতে হাত দিয়ে দেখেন—পরিস্থিতি তার চেয়েও খারাপ। গুজব আছে, সেদিন ট্রেজারিতে নগদ মাত্র ১০০ ডলার হাতরে পেয়েছিলেন তিনি। অর্থমন্ত্রী মুহাম্মাদ সারুরকে সরিয়ে ফয়সাল এরপর নিজেই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন এবং জাকি সাদ নামে আইএমএফে কাজ করা এক মিশরীয় অর্থনীতিবিদকে নিজের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বানান। নিজের ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করে এক সৌদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করে দেন সরকারি কর্মকর্তাদের বকেয়া বেতন। তার সংস্কারের কারণেই ১৯৬০ সালে একটা ব্যালেন্স বাজেটের দিকে এগিয়ে যায় সৌদি। তবে তার কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। কট্টর সালাফিদের বিরোধিতার মুখে পড়েন তিনি। আর এরই পরিণতিতে বাদশাহ খালিদের সময় ঘটে কাবা অবরোধের মতো এক বিব্রতকর ঘটনা। এমনকি ফয়সাল নিজেও খুন হন খুব সম্ভবত এ কারণেই।

তেল থেকে সৌদি রাজপরিবার যে অর্থ পেত, সেটা কমিয়ে দেন ফয়সাল। রাজপরিবারে তার ব্যয় সংকোচন নীতি সউদকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। কিন্তু বাদশাহর সাথে বিরোধ দেখা দিলেই ফয়সাল হুমকি দিতেন, পদত্যাগ করে চলে যাবেন তিনি। ১৯৬১ সালে যখন তিনি বাজেট পেশ করেন, তাতে সই দিতে রাজি হননি কিং সউদ। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন ফয়সাল।

একসময় সৌদি মিনারেল ও রিসোর্স-এর পরিচালক হয়ে আসেন আবদুল্লাহ তারিকি। তিনি আরামকো ও সৌদি তেলকে জাতীয়করণের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৪ সালে সৌদিরা ভাবল—তাদের নিজস্ব শিপিং কোম্পানি থাকা দরকার, যাতে আরামকোর তেল নিজেদের ট্যাংকার দ্বারা তারা সরবরাহ করতে পারে। আরামকো জানায়, এটা চুক্তির বরখেলাপ। কারণ, শিপিং রাইট কোম্পানিকেই দেওয়া আছে। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাপানের একটি কোম্পানিকে ৫৬-৪৫ শেয়ারে তেল অনুসন্ধানের সুযোগ দেয় তারিকি।

# কীভাবে এলো ওপেক

১৯৬০ সালে আবদুল্লাহ তারিকি আর ভেনিজুয়েলার তখনকার তেলমন্ত্রীর উদ্যোগে বাগদাদে এক বৈঠকে মিলিত হয় তেলসমৃদ্ধ দেশের নেতারা। এই দুই দেশ ছাড়াও বৈঠকে যোগ দিতে আসেন ইরান, কুয়েত ও ইরাকের প্রতিনিধিরা। সে বছরই জন্ম নেয় তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ওপেক। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাষ্ট্র এই পাঁচটি দেশ। অবশ্য এখন সদস্য বেড়ে হয়েছে ১৩। ধারণা করা হয়—পৃথিবীতে যত পেট্রোলিয়াম অয়েল আছে, তার ৮০ শতাংশেরও বেশি তেল মজুত রয়েছে এই সব দেশে। তবে ওপেক যে কোনো মামুলি সংগঠন নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৭০-এর দশকে। তারিকির উদ্যোগে গড়ে ওঠা ওপেক সবচেয়ে বড়ো আলোচনার জন্ম দেয় ১৯৭৩ সালে। চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তেল অবরোধ দিয়ে আরবরা তাদের সাহসিকতা ও অপরিহার্যতার জানান দেয়। এই অবরোধ সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ্ ফয়সালকে কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়ে স্থান করে দেয়।

তারিকি ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার মানুষ। তার এই চিন্তাধারা যুক্তরাষ্ট্র ও আরামকোর জন্য হুমকি বটে, কিন্তু সৌদি রাজপরিবারও নিজের বিপদ দেখতে পায় তাতে। কারণ, জাতীয়তাবাদ রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য চূড়ান্ত হুমকি। এর আগে মিশর আর ইরানে জাতীয়তাবাদের উত্থান দেখেছে সৌদি আরব। মিশরে রাজতন্ত্রের পতন হয়েছে জাতীয়তাবাদী নাসেরের হতে। অবশ্য লিবিয়ায় গাদ্দাফি কিংবা ইরাকে সাদ্দাম জমানা তখনও শুরু হয়নি। আরামকোর কর্মকর্তারা যখনই একটু গাঁইগুই করা শুরু করে, তখনই ইরানের মোসাদ্দেক সরকারের তেল জাতীয়করণের উদাহরণ সামনে নিয়ে আসেন তারিকি। বিরক্ত আরামকো ভাবল, ব্যাপারটা বাদশাহকে জানানো দরকার। বাদশাহর কাছে নালিশ গেল—‘লক্ষণ কিন্তু ভালো নয়, তারিকি মোসাদ্দেকের প্রশংসা করছে!’

সৌদি আরব নিজেও তেল জাতীয়করণ করতে চায়। রাজপরিবারের সেই লক্ষ্য অর্জনের দিকেই আগাচ্ছে তারিকি। তার অবদান খাটো করে দেখা সম্ভব নয়। করণ, সোলায়মান যখন অর্থমন্ত্রী, তখন আরামকো থেকে মুনাফার ফিফটি-ফিফটি ভাগ পুষিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা ছিল তার। কিন্তু জাতীয়তাবাদ ঘাড়ের কাছে এসে নিশ্বাস ফেললে তো বিপদ! শঙ্কা বাড়ে রাজপরিবারে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠল—১৯৬২ সালের পর যখন প্রকাশ্যেই সৌদি রাজপরিবারের সমালোচনা শুরু করলেন তারিকি। এরপর তাকে সরিয়ে দিতে আর দেরি করেননি ক্রাউন প্রিন্স ফয়সাল। তেল মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বানানো হয় আহমেদ জাকি ইয়েমেনি নামের এক আইনজীবীকে। ইয়েমেনি সৌদির তেলমন্ত্রী ছিলেন ২৬ বছর। ঠান্ডা মাথার ইয়েমেনি সউদ, নাসের, মোসাদ্দেক কিংবা তারিকি—কারও পথেই হাঁটেননি; অথচ তার আমলেই আরামকো জাতীয়করণ হয়ে যায়। ১৯৭৩-এর তেল অবরোধের সময় ফয়সাল ছিলেন সৌদির বাদশাহ। আর তার ঘনিষ্ঠ সহচর ইয়েমেনি ছিলেন তেলমন্ত্রী।

# সউদকে ক্ষমতা থেকে সরানোর প্রস্তুতি

বাদশাহ সউদ ছিলেন তার বাবা আজিজের ঠিক উলটো। সৌদি সরকারের টাকা কোথা থেকে আসছে আর কোথায় যাচ্ছে—এ নিয়ে সউদের তেমন মাথাব্যথাই ছিল না। এই উদাসীন বাদশাহকে চিকিৎসার জন্য মাঝেমধ্যে বিদেশে যেতে হতো। একবার দেশে ফিরে দেখলেন, তিনি কেবল নামমাত্র শাসক; পূর্ণ নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করছে ফয়সাল। এই ক্ষমতা অবশ্য তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন। কিন্তু বাদশাহর তো আর ক্ষমতাহীন হয়ে থাকা মানায় না। যখনই সউদ পুরো ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে চাইতেন, পদত্যাগের হুমকি দিতেন ক্রাউন প্রিন্স। কিন্তু রাজনীতি-সচেতন ফয়সাল সৌদি প্রশাসনের নাড়িনক্ষত্র জানেন, তার পদত্যাগ রাষ্ট্রের জন্যই ক্ষতিকর। সউদ তাই কখনো কখনো চুপ মেরে যান। কিন্তু দুই ভাইয়ের বিরোধ তীব্র হতে থাকলে ভয়াবহ বিপদের শঙ্কা দেখে রাজপরিবার। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে সউদ যখন পাকস্থলীর চিকিৎসায় ইউরোপের এক হাসপাতালে ভর্তি, একদল প্রিন্স ছুটে যায় সেখানে। তারা একগুচ্ছ প্রস্তাব তুলে ধরে বাদশাহর কাছে—

- রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকবেন।
- অতিরিক্ত ব্যয় করবেন না।
- ফয়সালের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করবেন না।

ভাইয়েরা হতবাক হয়ে গেল—যখন তারা দেখল, সউদ সেই প্রস্তাবনায় সই করেছে; কিন্তু দেশে ফিরেই উলটে যান সউদ। পরবর্তী বছরের জন্য ফয়সাল যে বাজেট প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। তাই আর বাদশাহর জন্য অপেক্ষা না করে ফয়সাল সরাসরি কাউন্সিল অব মিনিস্টারসে গিয়ে বাজেটের অনুমোদন নিয়ে আসেন।

রাজতন্ত্রে বাদশাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সউদকে পাশ কাটিয়েই সেবার বাজেট পাস হয়ে যায়। বাদশাহ কি তাহলে দুর্বল হয়ে পড়েছেন? নাকি এটা কোনো বিদ্রোহের আলামত? চিন্তিত সউদ বের হয়ে পড়লেন দেশ সফরে। বেদুইন গোত্রগুলো থেকে সমর্থন নিয়ে প্রাসাদে ফেরার পরিকল্পনা তার। শত্রুরা দেখুক, সউদের পক্ষে কত জনমত! কিন্তু বিপদ আরও বাড়ল। রাজপরিবারের বিষয় বাইরে নিয়ে যাওয়ায় প্রিন্সরা সউদের ওপর ক্ষিপ্ত হলেন। ভাইদের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে জেদ্দার প্রাসাদে বাদশাহর ফেরার আয়োজন কাটছাঁট করার নির্দেশ দিলেন ক্রাউন প্রিন্স ফয়সাল।

পায়ের নিচ থেকে রেড কার্পেট সরে যাওয়ার আশঙ্কায় পরিকল্পনা মুলতবি করলেন সউদ। ফিরে এলেন প্রাসাদে। তার নির্দেশে হাজারেরও বেশি সৌদি রয়াল গার্ড সদস্যকে রাজপ্রাসাদের দেয়ালের বাইরে ও ফটকগুলোতে মোতায়েন করা হলো। সউদ নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেনাদের নিয়োজিত করলেও ব্যাপারটাকে পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করলেন ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান আবদুল্লাহসহ অন্য ভাইয়েরা। দ্রুতই ন্যাশনাল গার্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন আবদুল্লাহ। সৌদি আর্মিকেও রাখা হয় সতর্ক অবস্থায়। ফলে অতিরিক্ত সেনা জড়ো করতে ব্যর্থ হন সউদ। ১৯৬৩ সালের শীত পর্যন্ত এই উত্তেজনা চলতে থাকল। কিন্তু ফয়সাল এসবে কোনো গুরুত্বই দিলেন না, যেন পরিস্থিতি খুবই স্বাভাবিক!

একদিন গাড়ি নিয়ে সউদের রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটলেন ফয়সাল। প্রাসাদের দেয়ালের কাছে এসে থামল গাড়িটি। ফয়সাল প্রহরায় নিয়োজিত এক সৈন্যের নিকট গিয়ে জানতে চাইলেন, তিনি ও তার সহকর্মীরা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পেয়েছেন কি না। উত্তরের আশায় না থেকে তাদের জন্য কফি পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে। ক্রাউন প্রিন্স যখনই সউদের রাজপ্রাসাদের দিকে যেতেন, দেয়ালের বাইরে ও ভেতরে থাকা সেনারা স্যালুট জানাত তাকে। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত সউদ ফয়সালকে চিঠি লিখলেন—

> 'শত্রু যখন আমার ঘাড়ের চারদিকে হাত রাখতে চাইবে, সর্বশক্তি দিয়ে আমি তাকে আঘাত করব।'

ফয়সাল কীভাবে এর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন—তা জানা যায়নি; কিন্তু তার ভাই মুহাম্মাদ তাতে খুব ক্ষুব্ধ হন। দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদে ঢুকে সউদের সামনে চিঠিটি ছুড়ে মারেন মুহাম্মাদ। বলেন—'কখনোই আর এসব করবেন না!'

একবার আরব লীগ শীর্ষ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব শেষে পূর্ণ ক্ষমতা ফিরে পেতে চাইলেন সউদ। এই সময় আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ন্যাশনাল গার্ড দিয়ে সউদকে উৎখাতের চেষ্টা চালান। কিন্তু ফয়সাল শক্তি প্রয়োগের পক্ষে নন, তার ভরসা উলামা পরিষদ। উলামা পরিষদ ফতোয়া দিলো—সউদ স্বেচ্ছায় চিফ অথরিটি ফয়সালকে দিয়েছেন, কাজেই এটা ফিরিয়ে নেওয়া অযৌক্তিক।

প্রিন্স মুহাম্মাদ প্রস্তাব আনেন—সউদ বাদশাহ হিসেবে থাকবেন, তবে তার কোনো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকবে না; শাসন কাজ চালাবেন ফয়সাল। তারা বিষয়টি নিয়ে যান উলামা পরিষদের কাছে। বেশিরভাগ উলামা সদস্য এতে একমত হন। ১৯৬৪ সালের ২৯ মার্চ উলামা পরিষদ ঘোষণা করেন—সউদের অনুমতি নেওয়ার আর প্রয়োজন নেই, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ফয়সাল সম্পূর্ণ স্বাধীন। পরদিন রাজপুত্ররা রিয়াদে মুহাম্মাদের প্রাসাদে জড়ো হন। আজিজের পুত্র ও কাজিনরাও যোগ দেন সেখানে। ৭০ জন রাজপুত্র উপস্থিত ছিলেন ওই দিনের বৈঠকে। আজিজের অনেক মিত্র গোত্রনেতাও সেদিন হাজির ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ৩০ মার্চ সউদকে সব রকম অফিসিয়াল কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরপর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোত্র নেতারা এসে বাইয়াত হতে থাকেন ফয়সালের কাছে।

# সৌদি আরবের নতুন বাদশাহ ফয়সাল

এসব দেখতে দেখতে নিজেকে গুরুত্বহীন মনে করে সউদ শেষ পর্যন্ত নিজের পরিবার এবং উলামা পরিষদের কাছে যান। তাদের বলেন—'আরবের ইতিহাসে এমন কোনো বাদশাহ ছিলেন না, যিনি পুরোপুরি ক্ষমতাহীন অবস্থায় সিংহাসনে ছিলেন।' উলামা পরিষদ সউদের কথা শুনে আনুষ্ঠানিকভাবেই তাকে মুক্তি দেয়। পরিষদ ঘোষণা করে—সউদ শাসনকাজ চালাতে অক্ষম। এদিকে ফয়সালকে বাদশাহ ঘোষণার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। তিন দিন ধরে কয়েকজন উলামা সউদকে পদত্যাগে রাজি করানোর চেষ্টা করলেন। শেষবারের মতো সউদের প্রাসাদে গেলেন যুবরাজ মুহাম্মাদ। সেদিন তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে এরপরই মুকুট ও সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন সউদ।

বিমর্ষ সউদ এরপর সরাসরি চলে যান রিয়াদ বিমানবন্দরে। টার্মিনালে অপেক্ষমাণ আবদুল আজিজের অন্য পুত্ররা বড়ো ভাইকে সম্মানের সাথে বিদায় জানায়। ফয়সালও মাথা নিচু করে ভাইয়ের হাতে চুমো খেলেন একরকম বাধ্য কর্মীর মতো; কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি সেদিন। সউদ ও তার সন্তানরা দেশ ছাড়লেন। জীবনের বাকি সময় আজিজের বড়ো ছেলে সপরিবারে নির্বাসিত জীবনযাপন করেছেন বিদেশে। পাঁচ বছর পর; ১৯৬৯ সালে অ্যাথেন্সে মারা যান সউদ। তার মরদেহ দেশে আনা হয়। ফয়সাল তাকে বাবার কবরের পাশেই দাফন করেন। সেদিন ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করেন ফয়সাল। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় বসেন তিনি।

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সৌদি রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার কীভাবে ঠিক হবে, তার সুস্পষ্ট নীতিমালা ছিল না। অটোমান সালতানাতের উত্তরাধিকারজনিত সংঘাত ও ভ্রাতৃহত্যার সংস্কৃতি এড়াতে চাইল সউদ পরিবার। পরের বছরের মার্চের আগ পর্যন্ত কোনো ক্রাউন প্রিন্স ঘোষণা করা যায়নি। অনেকের ধারণা ছিল, আজিজের তৃতীয় পুত্র মুহাম্মাদই হবেন ক্রাউন প্রিন্স। এমন ধারণা অমূলকও

ছিল না একেবারে। সউদকে সরাতে মুহাম্মাদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। স্বভাবতই তার নাম আগে চলে আসে। কিন্তু তার রগচটা স্বভাব আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিংহাসনের উত্তরাধিকার হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রিন্সদের আরেকটা অংশ ছিল প্রয়াত বাদশাহ আজিজের সপ্তম ছেলে ফাহাদের পক্ষে। ফাহাদ আজিজের প্রভাবশালী স্ত্রী হাসসা সুদাইরির সন্তান। ফাহাদসহ সুদাইরির সন্তান ছিল আটজন। এদের একজন ছোটোবেলায় মারা যায়। বাকি সাত ছেলেকে একত্রে বলা হতো 'সুদাইরি সেভেন'।

প্রিন্স ফাহাদ ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ও কৌশলী। ১৯৬২ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বানানো হয়েছিল তাকে। কিন্তু আজিজের তিন ছেলে—খালেদ, নাসের ও সাদ তার চেয়ে বয়সে বড়ো। কাজেই পরবর্তী সময়ে আর আলোচনাতেই রাখা হয়নি তাকে। মুহাম্মাদকে যখন বানানো গেল না, তখন তার ছোটো ভাই খালিদকে করা হলো ক্রাউন প্রিন্স। ধর্মভীরু খালিদের তেমন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল না। ক্রাউন প্রিন্স হওয়া নিয়েও তেমন আগ্রহ ছিল না তার। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ফয়সালের আস্থাভাজন ছিলেন খালিদ। বিদেশ সফরেও তিনি প্রায়ই বাদশাহর সঙ্গী হতেন। এর আগে একাধিকবার ক্রাউন প্রিন্স হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন খালিদ। তবে শেষ পর্যন্ত পরিবারের স্বার্থেই মুকুট মাথায় তুলে নেন। কারণ, এই পদ নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতে পারত মুহাম্মাদ ও ফাহাদ।

ফয়সালকে বলা হয় সৌদির ইতিহাসে সবচেয়ে ডাইনামিক বাদশাহ। তিনি পাশ্চাত্যের সাথে যেমন ভালো সম্পর্ক রেখেছিলেন, তেমনি ফিলিস্তিন ইস্যুতে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। এর প্রমাণ দেখা গেছে ৭৩-এর তেল অবরোধের সময়। তিনি নারীশিক্ষার ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন। উলামাদের আপত্তি সত্ত্বেও সৌদিতে টেলিভিশন চালু করেছিলেন ফয়সাল। তবে কন্টেন্ট ও প্রোগ্রাম মনিটর করার কর্তৃত্ব ছিল উলামা পরিষদের হাতেই। তারপরও বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন ফয়সাল। আবদুল আজিজের এক নাতি খালেদ বিন মুসাইদ, সৌদি আরবে টেলিভিশন চালুর বিরুদ্ধে প্রচারণায় নামেন। এই খালেদ ছিল মানসিকভাবে অসুস্থ। ভিয়েনায় এর আগে কয়েকবার চিকিৎসাও নিয়েছে সে। ফয়সালের টিভি চালু করাকে সে শয়তানের কাজ বলে প্রচার করতে থাকে। ১৯৬৬ সালে নিজের কিছু অনুসারী নিয়ে টেলিভিশন স্টেশনে হামলা করে বসে খালেদ বিন মুসাইদ। পুলিশের গুলিতে খালেদ মারা যায়, সাথে গ্রুপটিও ধরা পড়ে। তখনও প্রকাশ্যে সরকারের নীতির সমালোচনা করতে পারত উলামা পর্ষদ। তবে তা কোনোভাবেই যাতে রাষ্ট্রদ্রোহের পর্যায়ে না চলে যায়, সেটা খেয়াল রাখা হতো সব সময়।

# বাদশাহ ফয়সাল হত্যাকাণ্ড

শেখ আহমেদ জাকি ইয়েমেনি ছিলেন প্রসিদ্ধ একজন আইনজীবী। তিনি বাদশাহ ফয়সাল হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী; খুব কাছ থেকে দেখেছেন খুনের দৃশ্য। সৌদি পত্রিকায় মাঝে মাঝে কলাম বিশ্লেষণ লিখতেন জাকি ইয়েমেনি। সেই হিসেবে তিনি কলামিস্টও বটে। ইয়েমেনি ১৫ বছর ধরে বাদশাহ ফয়সালের অধীনে তেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদশাহ ফয়সাল যেসব মন্ত্রীকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন, ইয়েমেনি ছিলেন তাদেরই একজন। নিজের জীবদ্দশায় ইয়েমেনিকে কখনোই বরখাস্তের কথা চিন্তা করেননি তিনি।

শেখ ইয়েমেনি তারিকির উত্তরসূরি। যুবরাজ ফয়সাল ১৯৬২ সালে ইয়েমেনিকে জ্বালানিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। তখনও ফয়সাল সৌদি সরকারপ্রধান; খাতায়-কলমে বাদশাহর সিংহাসনে সউদ। আরামকোর পরিচালনা পর্ষদে সৌদি সরকারের একজন প্রতিনিধি রাখা হতো। সরকারপক্ষ থেকে ইয়েমেনিকে রাখা হয়েছিল সেই পর্ষদে। বিচক্ষণ ইয়েমেনি ছিলেন শান্ত মেজাজের। যেকোনো কাজে ধীরে-সুস্থে, চিন্তা-ভাবনা করে আগাতেন। তার আচার-ব্যবহারে আমেরিকান ডিরেক্টররা ভেবেছিল—ইয়েমেনি তো মডারেট, অনেকটা বন্ধুভাবাপন্ন। অথচ এই ইয়েমেনিই প্রথম ১৯৬৮ সালে বৈরুতের এক সম্মেলনে ঘোষণা দেন যে, সৌদি আরব আরামকোর ৫০ শতাংশ শেয়ার কিনে নিতে চায়। অবশ্য তিনি সেদিনই আশ্বাস দিয়েছিলেন—শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে আরামকোর শেয়ার নেবে না সৌদি সরকার। সৌদি অবশ্য একসাথে ৫০ শতাংশ শেয়ার কেনেনি; প্রথমে ২৫ শতাংশ শেয়ার বাগিয়ে নেয় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে।

লিবিয়ায় ততদিনে বিপ্লব হয়ে গেছে। সেনুসি রাজা ইদরিসকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসেছেন কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফি। ক্ষমতা গ্রহণের দুই বছর বাদেই ১৯৭১ সালে

লিবিয়ায় থাকা ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের সব সম্পদ জাতীয়করণ করেন গাদ্দাফি। এদিকে ১৯৭৪ সালের ১১ জুন আরামকোর শেয়ারহোল্ডার চার কোম্পানির মধ্যে সৌদি মালিকানা ৬০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত হয়। পরের বছরই সৌদির ইতিহাসে ঘটে নির্মম এক হত্যাকাণ্ড। ভাতিজার গুলিতে খুন হন বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ।

দিনটি ছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ। রাজপ্রাসাদে কুয়েতের একটি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বাদশাহ। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রাসাদে ঢুকে পড়েছেন বাদশাহর নিজের এক ভাইপো। যখন নিজের ভাতিজাকে চুমু খেয়ে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই পরপর তিনটি গুলি করা হয় বাদশাহ ফয়সালকে নিশানা করে। জাকি ইয়েমেনির মেয়ে অধ্যাপক মেই ইয়েমেনি ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসিকে সেদিনের ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বলেন—

> 'আমি তখন আমার বাবার অ্যাপার্টমেন্টে বসে অপেক্ষা করছি। তিনি বাসায় ঢুকলেন। তার চেহারায় গভীর বেদনার ছাপ, অদ্ভুত দৃষ্টি। তিনি হেঁটে সোজা খাবার ঘরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে একটা চিৎকার দিয়ে উঠলেন। ভয়ংকর বিপদ। শেখ আহমেদ জাকি ইয়েমেনিকে সবাই একজন শান্ত, ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ বলেই জানেন। বেশ নম্রভাষী তিনি। সেদিনকার এই আচরণ ছিল একেবারেই তার স্বভাববিরুদ্ধ। ওই দিন সকাল সাড়ে দশটায় কুয়েতের তেল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদলটি এসেছিল। রাজপ্রাসাদে গিয়ে বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিল তারা। আমার বাবা বাদশাহকে কুয়েত টিমের সফরের বিষয়ে আগে থেকে ব্রিফ করছিলেন। আর যে যুবরাজ গুলি করেছিল, তিনি ছিলেন বাদশাহরই ভাতিজা। ভাগ্যের পরিহাস হচ্ছে, গুলিবর্ষণকারী ব্যক্তির নামও ছিল ফয়সাল। কুয়েতের তেলমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদল বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে আসছিল, সেই প্রতিনিধি দলের ভেতরে ঢুকে পড়েন এই ফয়সাল। এরপর বাদশাহ তার ভাতিজাকে আলিঙ্গন করার জন্য দুই হাত বাড়িয়ে দেন। আর তখনই পকেট থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল বের করে ফয়সাল গুলি করেন বাদশাহকে। মাথা লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি করা হয়।'

# কেন খুন হলেন বাদশাহ ফয়সাল

আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আজিজ আল সউদের জ্যেষ্ঠ ছেলেদের একজন ছিলেন ফয়সাল। বাবা আজিজের সাথে বেশ কয়েকটি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন এই রাজপুত্র। বাবার মৃত্যুর পর সৌদির বাদশাহ হন ফয়সালের বড়ো ভাই সউদ। ফয়সালকে করা হয় ক্রাউন প্রিন্স ও সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৪ সালে বাদশাহ হওয়ার পর তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ও ধার্মিক মানুষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর শুরু করেন ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড। খনি থেকে পাওয়া তেল বেচে যে অর্থ আসত, সেই অর্থ তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিচারব্যবস্থার আধুনিকায়নে খরচ করতে থাকেন। কিন্তু তার এই সংস্কার কার্যক্রমকে ভালো চোখে দেখেনি সৌদি সমাজের রক্ষণশীল অংশ। বিরোধিতার মধ্যেও ষাটের দশকের মাঝামাঝি ফয়সাল সৌদি আরবে প্রথম টেলিভিশন স্টেশন চালু করেন। সেই টেলিভিশন স্টেশনে সশস্ত্র হামলা হয়। এই হামলায়ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার এক ভাতিজা। রাজপ্রাসাদে সেই ভাতিজারই আপন ভাই গুলি করে হত্যা করেন বাদশাহ ফয়সালকে।

বাদশাহ ফয়সাল অন্য অনেক দিক থেকেই আলাদা ছিলেন। সৌদি আরবে বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। বাদশাহ আজিজ এবং সউদেরও অনেক স্ত্রী ছিল। কিন্তু ফয়সালের একসঙ্গে একের বেশি স্ত্রী ছিল না কখনো। রানি এরফাদ মেয়েদের জন্য স্কুলশিক্ষা চালু করেন। সেই স্কুলের প্রথম ৯ জন মেয়ের একজন ছিলেন জাকি ইয়েমেনির মেয়ে মেই ইয়েমেনি। বাদশাহ ফয়সাল সৌদি আরবের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে রাজি করাতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের ভালো মায়ে পরিণত করতে হবে। তার এই কর্মসূচির নাম ছিল—'দার-উল হানান' অর্থাৎ স্নেহশীলতার স্কুল।

শেখ জাকি ইয়েমেনি সরাসরি সৌদি রাজপরিবারের কেউ ছিলেন না। বেশ উচ্চশিক্ষিত অথচ খুবই সাদামাটা একজন মানুষ ছিলেন তিনি। ইয়েমেনির লেখা কিছু নিবন্ধ বাদশাহ ফয়সালের নজরে পড়েছিল, আর তাতেই তার ভাগ্য বদলে যায়। মেই ইয়েমেনি এই বিষয়ে বিবিসিকে বলেন—

> 'আমার বাবা আইন প্র্যাকটিস করার জন্য একটি অফিস খুলেছিলেন। এরপর পত্রিকায় তিনি খুবই উসকানিমূলক একটি নিবন্ধ লিখেন। এতে গণতন্ত্র ও সুশাসনের দাবি জানান তিনি। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল "আবু মেই" (মেই'র বাবা) নামে। কারণ, আমিই ছিলাম আমার বাবার প্রথম সন্তান। ফয়সাল তখন যুবরাজ। তিনি জানতে চাইলেন—কে এই লোক। সে সময় একজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজার খুঁজছিলেন তিনি।'

বাদশাহ ফয়সাল পরে শেখ ইয়েমেনিকে তার তেলমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এরপর তিনি আর ইয়েমেনি মিলে এমন এক নীতি তৈরি করেন, যা প্রথমবারের মতো সৌদি আরবকে বিপুল তেল-সম্পদ নিয়ন্ত্রণের সর্বৈব ক্ষমতা এনে দেয়। চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় এই তেল-সম্পদকে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সৌদি আরব। ততদিনে দেশটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তেল রফতানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। ইজরাইল সমর্থনকারী পশ্চিমা দেশগুলোতে তেল রফতানি বন্ধের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় সৌদি আরব। বিশ্বে রাতারাতি তেলের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সৌদি তেলমন্ত্রী জাকি ইয়েমেনি তখন পশ্চিমা গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

> 'আমরা যা চাই, তা হলো সব অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইজরায়েলি সৈন্যদের পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হোক। এরপর আপনারা আগের মতোই আবার তেলের সরবরাহ পাবেন; যেমনটা ছিল ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে।'

একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক তখন শেখ ইয়েমেনির কাছে জানতে চেয়েছিলেন—'তেলের মূল্য যে এত বেশি বাড়ানো হয়েছে, এর ফলে কি বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে যাবে?' শেখ ইয়েমেনির উত্তর ছিল—'অবশ্যই এই সম্পর্ক বদলে যাবে।'

সম্পর্ক সত্যিই বদলে গিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে *টাইম ম্যাগাজিন* বাদশাহ ফয়সালকে বছরের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব বলে ঘোষণা করে। তবে একজন ভাইপোর হাতেই কেন বাদশাহ ফয়সালকে জীবন দিতে হয়েছিল, সেই কারণ এখনও পুরোপুরি অস্পষ্ট। সে সময় যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেগুলোর সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক আছে কি না, তাও পরিষ্কার নয়। মেই ইয়েমেনি বলছেন—'বাদশাহ ফয়সালকে কেন হত্যা করা হয়েছিল, তার প্রকৃত কারণ আমরা জানি না। আমরা শুধু এটা জানি—বাদশাহকে যিনি হত্যা করেছিলেন, সেই ভাইপো ছিলেন মানসিক বিকারগ্রস্ত।'

বাদশাহ ফয়সাল হত্যাকাণ্ডের পেছনে বিদেশি নানা সংস্থার জড়িত থাকার গুঞ্জন শোনা গেলেও পরবর্তী সময়ে তারই পুত্র একসময়কার গোয়েন্দাপ্রধান তুর্কি বিন ফয়সাল তা উড়িয়ে দেন। ফয়সালের পর বাদশাহ হন প্রিন্স খালিদ। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ধর্মভীরু খালিদকে খুবই অস্বস্তিকর একটি পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। সে বছর পবিত্র কাবা শরিফ অবরোধ করেছিল একদল বিপথগামী সালাফি। সেই বিদ্রোহের রক্তাক্ত সমাপ্তি হতবাক করে দিয়েছিল সমগ্র বিশ্বকে।

# পবিত্র কাবা অবরোধ

১৪০০ হিজরি; মহররমের প্রথম দিন। মক্কায় সেদিন ফজরের আজান হয় ভোর ৫:১৮ মিনিটে। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে দিগন্তজুড়ে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে সূর্যের প্রথম কিরণ। কাবার আশপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে সাদা কাপড় পরা একদল লোক। সেদিনের সকালবেলাটা ছিল অন্যান্য দিনের চেয়ে ফরসা। পবিত্র মসজিদের বিশাল আঙিনার চারপাশে জুহাইমান ও তার অনুসারীরা চুপচাপ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়েছে আগেই। পথভ্রষ্ট মুসলমানদের আলোর পথ দেখাতে চায় তারা! অথচ সেদিন এই সশস্ত্র লোকগুলোর হাতেই রচিত হয় কলঙ্কজনক এক ইতিহাস। খানায়ে কাবায় কী ঘটেছিল সেদিন?

ইংরেজি ক্যালেন্ডারে সেদিন ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর। সারা বিশ্ব থেকে আসা হাজারো মুসল্লি ফজরের নামাজের জন্য সমবেত হয়েছেন পবিত্র কাবার বিশাল প্রাঙ্গণে। এই ভিড়ের মধ্যেই কয়েকশো অনুসারী নিয়ে মিশে আছেন জুহাইমান আল ওতাইবি নামের এক কট্টর সালাফি। নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ইমামকে একপাশে ঠেলে দিয়ে তার কাছে থাকা মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নেন জুহাইমান ও তার অনুসারীরা। এদের একজন একটি লিখিত ভাষণ পড়তে শুরু করে—'প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা! আজ আমরা ইমাম মাহদির আগমন ঘোষণা করছি।'

জুহাইমানের লোকজন মুহাম্মাদ আল কাহতানি নামে অপর একজনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তারা একজন একজন করে কাহতানির কাছে বাইয়াত হতে থাকল। নামাজে অংশ নেওয়া অন্যদেরও আহ্বান জানানো হলো—'এই যে দেখুন মাহদি! সত্য ও সঠিক পথের দিশারি। তিনি বিশ্বে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করবেন।'

আকস্মিক এই ঘটনায় হতবাক মুসল্লিরা। কাবার ইমামও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জুহাইমানের অনুসারীরা নিজেদের পোশাকের ভেতর লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র বের করতে শুরু করল। এই অস্ত্র তারা কাবার ভেতরে নিয়ে এসেছিল কফিনে মুড়িয়ে।

ইমাম মাহদির আগমনের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁর হাতে থাকবে আল্লাহ প্রদত্ত অসামান্য ক্ষমতা। কিয়ামতের আগে দাজ্জালের শাসনকে উৎখাত করে তিনিই বিশ্বে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। আর এই ঘটনা ঘটবে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে। এই হাদিসেরই অপব্যাখ্যা হাজির করেছিল জুহাইমানের অনুসারীরা। তারা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল কাহতানির হাতে বাইয়াত হয়ে সবার সামনে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ইমাম মাহদি হিসেবে।

ইমাম মাহদির আগমনের কথায় মুসল্লিরা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেননি, অনেকেই ছিলেন বিস্মিত ও দ্বিধান্বিত। আবার খুশিও হয়েছিলেন কেউ কেউ। এই দ্বিতীয় গ্রুপটি জোরে জোরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে শুরু করল। জুহাইমান তাদের বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলো যে, কাহতানিই হচ্ছেন হাদিসে উল্লেখ করা ইমাম মাহদি। মুসল্লিদের অনেকেই তখন মাহদির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাইয়াত বা আনুগত্য প্রকাশ করতে শুরু করলেন। মসজিদের ভেতরে যখন এ ঘটনা ঘটছে, বাইরের প্রাঙ্গণে তখন শূন্যে গুলি ছুড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে জুহাইমানের আরেকদল অনুসারী।

সেদিন মসজিদের চারপাশে পাহারায় ছিল অল্পসংখ্যক পুলিশ। রাতভর দায়িত্ব পালন শেষে তাদের অনেকেই ছিলেন ক্লান্ত ও নিদ্রাকাতর। খনিকটা বিভ্রান্তও ছিলেন কেউ কেউ। কয়েক ডজনেরও বেশি বিদ্রোহী অস্ত্র হাতে দৌড়ে গিয়ে মসজিদের প্রতিটা প্রবেশপথে অবস্থান নেয়। বিদ্রোহীদের বাধা দিতে গিয়ে মসজিদের ভেতরেই গুলিতে নিহত হন একজন সহকারী ইমাম ও পুলিশের কিছু সদস্য। বন্দুকধারী বিদ্রোহীরা মসজিদের সব দরজা বন্ধ করে দেয়। এমনকি তাদের আরেকটা অংশ জুহাইমানের নির্দেশে অবস্থান নেয় মসজিদের মিনারগুলিতে। গুজব ছড়িয়ে পড়ে—'ছিনতাই হয়ে গেছে আল্লাহর ঘর!'

সেদিনের বিদ্রোহীরা ছিল 'আল জামা আল সালাফিয়া আল মুহতাসিবা' নামের একটি সংগঠনের সদস্য। কেন তারা কাবা অবরোধ করতে গিয়েছিল? সৌদি আরবই-বা এই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল কীভাবে?

# কাবার বিদ্রোহীদের পরিণতি

সৌদিতে যে বছর কাবা অবরোধের ঘটনা ঘটে, সে বছরই ইরানে সংঘটিত হয় ইসলামি বিপ্লব। তেলের অর্থে তখন সৌদি আরবের সমাজ হয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড ভোগবাদী। দেশটিতে ক্রমশ নগরায়ণ হচ্ছিল। নারী ও পুরুষরা প্রকাশ্যে একসাথে কাজ করত কিছু কিছু অঞ্চলে। এসব মানতে পারেনি সালাফিদের মধ্যে উগ্রবাদী এই গোষ্ঠী। জুহাইমান ছিল এই দলের নেতা। তাদের দৃষ্টিতে সৌদি শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত, নৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং পাশ্চাত্য দ্বারা কলুষিত। কাজেই যেসব উৎসুক সৌদি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছিলেন, তাদের দেখামাত্র গুলি করেছিল সশস্ত্র বিদ্রোহীরা। অনেকেই নিহত হয়েছিল সেদিন।

মাহদি হিসেবে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল কাহতানি নামের যে ব্যক্তিকে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন তরুণ ধর্মপ্রচারক। ভালো ব্যবহার ও আচরণের জন্য তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। হাদিসের ভাষ্যমতে—মাহদির প্রকৃত নামের শুরুতে থাকবে 'মুহাম্মাদ'। আর তাঁর বাবার নাম হবে আবদুল্লাহ। অর্থাৎ বিশ্বনবি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিল থাকবে তাঁর। কাহতানির নামের শুরুতে মুহাম্মাদ আছে, এমনকি তার বাবার নামও আবদুল্লাহ। আর সেজন্য কাহতানিকেই ইমাম মাহদি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন জুহাইমান।

কাহতানি অবশ্য 'ইমাম মাহদি' হতে চাননি শুরুতে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাহদির ভূমিকায় রাজি করাতে সক্ষম হয় জুহাইমান। মসজিদ দখলের কয়েক মাস আগেই গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়—মক্কার শত শত মানুষ ও হাজিরা স্বপ্নে দেখেছেন, গ্র্যান্ড মসজিদে ইসলামের ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন কাহতানি। জুহাইমানের অনুসারীরা তো বটেই, বাইরের কিছু লোকও বিশ্বাস করল এসব।

সৌদি আরবের বাদশাহ খালিদ তখন অসুস্থ। ক্রাউন প্রিন্স ফাহাদ বিন আবদুল আজিজই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখভাল করতেন। অসুস্থ খালিদের কাজ ছিল ফাহাদের নির্বাহী আদেশগুলোর অনুমোদন দেওয়া। কিন্তু কাবা অবরোধের ঘটনা যখন ঘটে, তখন আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তিউনিসিয়ায় অবস্থান করছিলেন ফাহাদ। গোয়েন্দা পরিচালক তুর্কি আল ফয়সাল ছিলেন তার সফরসঙ্গী। ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান প্রিন্স আবদুল্লাহও দেশে ছিলেন না সে সময়। ফলে যা করার অসুস্থ রাজা খালিদ আর প্রিন্স সুলতানকেই করতে হতো। এর মধ্যেই অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত তিউনিসিয়া থেকে ফিরে কাবা উদ্ধারের ছক আঁকেন তুর্কি।

সৌদি পুলিশ শুরুতে সমস্যার গভীরতা বুঝতে ব্যর্থ হয়। কয়েকটি টহল গাড়ি আসে কী ঘটেছে তা দেখার জন্য। কিন্তু গ্র্যান্ড মসজিদে আসার পথেই তারা গুলির মুখে পড়ে। এগিয়ে আসে ন্যাশনাল গার্ড। এরপর পুরো মসজিদ এলাকাজুড়ে অবস্থান নেয় স্পেশাল ফোর্স, প্যারাট্রুপার ও আর্মরড ইউনিটের সদস্যরা। দ্বিতীয় দিন দুপুর থেকে লড়াই জোরদার হয়ে ওঠে। কাবার আকাশে উড়তে শুরু করে হেলিকপ্টার ও সামরিক বিমান। বিদ্রোহীরা কার্পেট ও টায়ার পুড়িয়ে কালো ধোঁয়া তৈরির চেষ্টা চালায়। এগিয়ে আসা সৌদি বাহিনীর নজর এড়াতে অন্ধকারে অ্যামবুশ পেতে অবস্থান নেয় তারা। পুরো ভবন হয়ে ওঠে কিলিং জোন। হতাহতের সংখ্যা মুহূর্তেই ছাড়িয়ে যায় শতাধিক।

কাবা শরিফের ভেতরে অভিযান চালানো যাবে কি যাবে না—এ নিয়ে বিভ্রান্ত ছিল সৌদি শাসকগোষ্ঠী। তাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দেয় সৌদি আরবের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তির একটি ফতোয়া। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার এখতিয়ার পায় সৌদি মিলিটারি। অ্যান্টি ট্যাংক মিসাইল ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করা হয় মিনার থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সরাতে। কাহতানি বিশ্বাস করতেন—তিনি মরবেন না। কারণ, তিনি তো ইমাম মাহদি। কিন্তু শিগগিরই গুলির মুখে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারান এই কথিত মাহদি। ছয় দিন পর সৌদি নিরাপত্তা বাহিনী মসজিদ ভবন এলাকা ও আঙিনার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়।

শেষ পর্যন্ত সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি কাবা চত্বরে ঢুকে মসজিদের দ্বিতীয় তলার নিয়ন্ত্রণ নেয়। বেশিরভাগ বন্দুকধারী তখন আশ্রয় নিয়েছে ভূগর্ভস্থ কামরায়। সেই অন্ধকার জায়গা থেকেই তারা আরও কিছুদিন

লড়াই চালিয়ে গেল। ফরাসি সেনা কর্মকর্তাদের পরামর্শে বিপুল পরিমাণ সিএস গ্যাস ছাড়া হলো ওই গোপন কামরায়। বেশিরভাগ বিদ্রোহীই তাতে মারা পড়ল; বাকিরা আত্মসমর্পণ করল সরকারি বাহিনীর কাছে। এই অবরোধ চলেছিল টানা দুই সপ্তাহ ধরে। ঘটনার এক মাস পর জুহাইমানসহ ৬৩ বিদ্রোহীকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। সৌদি কর্তৃপক্ষ তথাকথিত ইমাম মাহদির লাশের একটি ছবি প্রকাশ করে।'

'রীতিমতো ভয়ংকর ঘটনা! কাবা অবরোধ, তাও আবার একদল ধর্মভীরু মানুষের দ্বারা?'

দীর্ঘ সময় পর নীরবতা ভাঙল অমিত।

'এ ঘটনা সৌদিতে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলেনি?'

'ফেলেছে তো নিশ্চয়ই। হারাম শরিফের ওই ঘটনার পর সৌদি আরব আমূল বদলে যায়। পুরোনো রক্ষণশীল পথে ফিরে যায় সউদ পরিবার। রাজত্ব হারানোর শঙ্কা বাড়ে প্রিন্সদের মধ্যে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালতে কড়াকড়ি আরোপ হয়। আগের মতোই বিধিনিষেধ পুনর্বহাল করা হয় নারীদের ওপর। আগের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাধর করে তোলা হয় ধর্মীয় পুলিশ বাহিনীকে।'

'আচ্ছা, যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান যে ৩৫ বছর আগের সৌদি যুগে ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন, তিনি কি ১৯৭৯-এর আগের সৌদির দিকে ইঙ্গিত করছেন?'

'একদম ঠিক বলছিস।'

'আমার এমবিএসকে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা। তিনি এত এত ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন? কেন শুধু শুধু আশেপাশে শত্রু বাড়াচ্ছেন? আসলে তিনি চাইছেনটা কী?'

মূলত এমবিএস বা সৌদি রাজপরিবার অন্য আরব রাজপরিবারগুলোর মতোই ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ার ভয়ে ভীত। ২০১১ সালের আরব বসন্ত আরব রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরশাসকদের জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কেউ কেউ ছিটকে পড়েছেন, কেউ আবার উতরে গেছেন। বেশ কয়েকটি দেশে সরকার পতনের পর থেকে বিদেশি গোষ্ঠীর আশকারায় চলছে গৃহযুদ্ধ। কোথাও কোথাও

ইসলামপন্থিদের ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক পুনর্বাসন হয়। বিশেষ করে আরব বসন্তের তাৎক্ষণিক ফসল যায় মুসলিম ব্রাদারহুড তথা পলিটিক্যাল ইসলামের ঘরে। তাই আরব স্বৈরশাসকরা ভেবেছে, তাদের মসনদকে চ্যালেঞ্জ করছে পলিটিক্যাল ইসলাম। আরব বিশ্বে বর্তমানে ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে যে দমন-নিপীড়ন চলছে, সেটা এই আতঙ্ক থেকেই। আর এই দমন-পীড়নে মিশরের সিসি ও আরব আমিরাতের যুবরাজ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান বেশ অগ্রভাগেই আছেন। সৌদি যুবরাজ এমবিএস তাদের রাজনৈতিক শিষ্য ও মিত্র। এদের সবারই লক্ষ্য অভিন্ন—ব্রাদারহুডের পুনরুত্থান ঠেকানো। এই দমন-নিপীড়নের পথ জারি রেখেই সৌদি অর্থনীতিকে তেল-নির্ভরতা থেকে মুক্তি দিতে চান এমবিএস। এজন্য বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আরও উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবকে। দিকে দিকে গড়ে তোলা হচ্ছে প্রযুক্তি নগরী ও পর্যটন পার্ক। আধুনিক হোটেল নির্মাণ করা হচ্ছে, খুলে দেওয়া হচ্ছে সিনেমা হল, রাজপথে জমে উঠছে পশ্চিমা কনসার্ট। এক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের কোনো সমালোচনাও গ্রহণ করতে রাজি নয় এমবিএস। আর এজন্যই আলিমদের ধরে ধরে জেলে পোরা হচ্ছে। এতসব সংস্কার করতে গিয়ে একদিকে যেমন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরাগভাজন হচ্ছেন, তেমনি রাজপরিবারের অন্য প্রভাবশালীদের ক্ষমতার বাইরে রাখতে গিয়ে তৈরি করছেন নিত্যনতুন শত্রু। তবে প্রগ্রেসিভ সংস্কারের কারণে তরুণ ও নারীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

# আরামকো সৌদির হলো

১৯৮০ সালের ৯ মার্চ সৌদি সরকার আরামকো সম্পূর্ণভাবে কিনে নেয়। পরের বছর আরামকোর আয় ১১৯ বিলিয়ন থেকে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৯৩ বিলিয়নে। ১৯৮৫ সালে সেটা আরও কমে হয় ২৬ বিলিয়ন। ফয়সাল, খালিদ হয়ে ততদিনে সৌদির সিংহাসনে বসেছেন সুদাইরি সেভেনের একজন—ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ। তার সময়েই ঘটে উপসাগরীয় যুদ্ধ। বিদেশি সৈন্য ঘাঁটি গাড়ে সৌদির পবিত্র ভূমিতে। ফাহাদের এমন সিদ্ধান্ত ঘিরে আরেক ইতিহাসের সূচনা হয়। দৃশ্যপটে আসেন ওসামা বিন লাদেন। লাদেন পরিবারের সাথে সৌদি রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা সকলেই জানি। সৌদির উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অনেক আগে থেকেই নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত ছিল বিন লাদেন গ্রুপ। সেই লাদেন পরিবারের একজন উত্তরসূরির সাথে রাজপরিবারের সম্পর্কে কেন ফাটল ধরল? কেন সশাস্ত্রের পথ ধরলেন বিন লাদেন?

# ওসামা বিন লাদেন

লাদেনের জন্ম হয় সৌদির রাজধানী রিয়াদে। তাঁর বাবা লাদেন ছিলেন সৌদি আরবের অন্যতম ধনকুবের। লাদেনের অন্য ভাইয়েরা পশ্চিমা দেশগুলোতে পড়াশোনা করেছেন। তারপর দেশে ফিরে কাজ শুরু করেছেন পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু লাদেন ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন অন্যরকম। ব্যবসায় বা চাকরিতে তার কোনোদিনই মন বসেনি। পড়াশোনা করেছেন জেদ্দায়। কলেজে পড়ার সময়ই ধর্মীয় গুরু ডক্টর আবদুল্লাহ ইউসুফ আজমের মতাদর্শ অনুসরণ শুরু করেন। আজম বিশ্বাস করতেন, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের জিহাদ করা অত্যাবশ্যক। ওই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জীবনে পশ্চিমা প্রভাব দেখে বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন লাদেন। সে সময় আজমের মতবাদ তার চিন্তাজগতে আলোড়ন তোলে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় আজম ও লাদেন আফগান মুজাহিদিনদের দলে যোগ দিতে পেশোয়ারে যান। এটি আফগান সীমান্তের কাছের একটি পাকিস্তানি শহর। দুজনের কেউ সরাসরি লড়াইয়ে অংশ না নিলেও আফগান মুজাহিদদের অর্থ সহায়তা করেন লাদেন। খুব সম্ভবত ৯০-এর দশকের আগে আল-কায়েদা গঠন করেন তিনি। এর আবির্ভাব মূলত 'মাকতাব আল খিদমাত' নামের অপর এক সংগঠন থেকে, যার রূপকার ছিলেন ওস্তাদ আবদুল্লাহ আজম। সোভিয়েত সেনারা আফগানিস্তান ছাড়ার পর ১৯৮৯ সালে লাদেন সৌদি আরবে ফিরে যান।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ওসামা বিন লাদেন সৌদি আরবে বিদেশি সেনাদের আগমন পছন্দ করেননি। ১৯৯১ সালে সাদ্দাম কুয়েত দখলে নেওয়ার পর লাদেনের মনে বিশ্বাস জন্মে, মুসলিম তরুণ-যুবকদের নিয়ে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে ইরাকের কবল থেকে কুয়েতকে মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু সৌদি রাজপরিবার তার কথা শোনেনি। তিনি দেখলেন, তার প্রস্তাবের পরিবর্তে

আমেরিকানদের ডেকে এনেছে সৌদি আরব। সৌদির এমন পদক্ষেপে অপমানিত বোধ করেন লাদেন। সেখান থেকেই রাজপরিবারের সাথে তার বিবাদের শুরু। এই মুজাহিদ নেতার দৃষ্টিতে ইরাকের বাথিস্টরা ছিল কমিউনিস্ট। এজন্য তিনি মনে করতেন, বাথিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু প্রিন্স আহমেদ সোজা বলে দেন—'আরব স্বেচ্ছাসেবী দিয়ে সাদ্দামকে মোকাবিলা করার চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। ওসামা বিন লাদেন এরপর সৌদিতে নিষিদ্ধ হন, পালাক্রমে পাড়ি জমান সুদান ও আফগানিস্তানে। সুদান থেকেই লাদেনের জিহাদি জীবন শুরু।'

'আলোচনা ভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছে।'

অমিতের কথায় থমকে গেলাম। সত্যিই তো! আমাদের আরামকোতে ফিরে যাওয়া দরকার।

# উপসাগরীয় যুদ্ধ ও আরামকোর তেল ব্যাবসা

কুয়েত আক্রমণের পর তেলের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। এরপর ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে অবরোধ এলো ইরাকের ওপর। সৌদিতে আসা মার্কিন বিমানগুলোকে জ্বালানি দিচ্ছিল আরামকো। যদিও জ্বালানির খরচ আমেরিকা দেয়নি, কোম্পানিটি নিজেই বহন করেছে। ঘুরেফিরে সব ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে সৌদি সরকারকেই। ইরাক অবরোধের ফলে তেলের দাম বাড়বে, আর তাতে মোটা অঙ্কের আয় করা যাবে—আরামকোর এমন ধারণা আগে থেকেই ছিল। আর তাই আরামকোর অফিস যেখানে, সেই দাহরানই ছিল ইরাকি স্কাড মিসাইলের টার্গেট। পরে তেলের দাম সত্যি সত্যি বেড়েছিল, আরামকোও এই সুযোগে হাতিয়ে নিয়েছিল বিপুল পরিমাণ অর্থ। কার্যত ইরাকের ওপর অবরোধ শাপে বর হয়ে এসেছিল সৌদির জন্য। সেই আয়ের ওপর ভর করেই বিশ্বের শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী কোম্পানিতে পরিণত হয় আরামকো। আমরা দেখেছি ২০০৫ সালেও সৌদিকে তেলের সুপার পাওয়ার ভাবা হতো। সে সময় বিশ্বের তেল রিজার্ভের ২২ ভাগই ছিল তার হাতে।

উপসাগরীয় যুদ্ধের পর রিয়াদের কাছে প্রিন্স সুলতান এয়ারবেইস তৈরি করা হয়। এক দশক পরেই ইরাক, আফগান যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এই এয়ারবেইস। মার্কিনজোট ব্যাগপত্র গুছিয়ে পরে চিরতরে চলে যাবে—২০০৩ সালে এই শর্তে ইরাকের বিরুদ্ধে ঘাঁটিটি ব্যবহার করতে দেন আবদুল্লাহ। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে ৯১-এর সেই আমেরিকান সেনারা সৌদি ছেড়ে খুঁটি গাড়ে কাতারের ওদেদ এয়ারবেইসে। এটিই এখন মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড়ো মার্কিন বিমানঘাঁটি।

১৯৪৫ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ৭৩-এর পর এই সম্পর্কে নতুন জোয়ার আসে, যখন ওপেকের নিয়ন্ত্রণ হাতে পায় সৌদি। তখন থেকেই মার্কিন ডলারে সৌদি আরব তেল বেচতে আরম্ভ করল, আর তেলের টাকা পুনরুদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্র চালাতে থাকল অস্ত্র ব্যাবসা। যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি বিনিয়োগ বাড়ল। মার্কিনিদের স্বার্থের সপক্ষে তেলের মূল্য ঠিক করা

শুরু করল সৌদি। ৭৩-এর তেল অবরোধ ১৯৩০-পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক সংকটের জন্ম দেয়, যার প্রভাব বজায় ছিল পরবর্তী এক দশক পর্যন্ত। তেল অবরোধ দিয়ে পশ্চিমাদের নাকাল করে দেওয়ার নেপথ্য নেতা ছিলেন সৌদি বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবে ইরানের মুহাম্মাদ রেজা শাহের পতন হয়। পরের বছর তৎকালীন দুই বড়ো তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরাক ও ইরান যুদ্ধে জড়ালে তেলের দাম আবারও বেড়ে গিয়ে দ্বিগুণ আকার ধারণ করে। ৭৩-এর অবরোধের আগে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ছিল তিন ডলার, অবরোধের পর তা হয়ে যায় ১২ ডলার। ইরান-ইরাক যুদ্ধে সেটা ৩০ ডলারে গিয়ে ঠেকে। যদিও ১৯৮২ সালে তেলের দাম পড়ে যায়। সে যাত্রায় সৌদি ও কুয়েতের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে এবং দাম কমিয়ে রাশিয়াকে ঠেকানোই ছিল ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। হয়েছিলও তা-ই। সৌদির তৎপরতায় তেলের দাম কদিনের মধ্যেই ১০ ডলারে নেমে আসে। এরপর ৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধ তেলের গুরুত্ব নতুন করে বুঝিয়ে দেয়।

৯০-এর দশকে ভারত, গুয়েতেমালা, পানামা, কলম্বিয়া ও অন্যান্য দেশের রাজনীতিবিদদের সাথে দেনদরবার শুরু করে এনরন। উদ্দেশ্য ছিল ইলেট্রিক্যাল ও গ্যাস ইউটিলিটিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র মোজাম্বিককে হুমকি দেয়—এনরনের বিড না মানলে মার্কিন বিদেশি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। বুশের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে অর্থ সহায়তাকারী এনরন একসময় যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম বৃহৎ কর্পোরেশন ও পৃথিবীর ১৬তম বড়ো কর্পোরেশনে পরিণত হয়। প্রচুর আয় সত্ত্বেও ১৯৯৬-২০০১ এই সময়ে মাত্র এক বছর ট্যাক্স দিয়েছে এনরন। হাজার হাজার অফশোর পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিলিয়ন ডলার দেনার অর্থ গোপন করেছিল এনরন। অতঃপর ২০০১ সালে তা ফাঁস হয়ে যায়। ধসে যায় এনরন। কোম্পানিটির দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো পতনের রেকর্ড।'

'আচ্ছা, বেশ কিছুদিন ধরে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা বেশ উত্তপ্ত দেখছি, গ্যাস অনুসন্ধান নিয়ে; বিশেষ করে তুরস্ক আর গ্রিসের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা আর ঠ্যালাঠ্যালি হচ্ছে। তোর কি মনে হয় তুরস্ক এখানে গেইনার হবে? তারা গ্রিসের সাথে যা করছে তা কি ন্যায়সংগত?'

'আসলে এককথায় তোর প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব কঠিন, অমিত। পুরো বিষয়টা তোকে খুলে বলি চল।'

# ভূমধ্যসাগর ও তেল-গ্যাসের লড়াই

ভূমধ্যসাগরের চারপাশে তিন মহাদেশ—এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকা। অন্তত ১৭টি স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে এই সাগরের তীরে। এই অঞ্চল ঘিরেই অতীতে উত্থান ঘটেছে রোমান, বাইজেন্টাইন, অটোমান, ফাতেমি এবং দামেশক থেকে নির্বাসিত হয় উমাইয়া সাম্রাজ্য। ভূমধ্যসাগর ভৌগোলিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক—তিন দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি এই সাগরের পূর্ব অংশে বিশাল গ্যাসের মজুত পাওয়া গেছে। আর তাতেই সামনে চলে এসেছে গ্রিস আর তুরস্কের পুরোনো বিরোধ। অবশ্য দুই দেশের মধ্যকার এ বিরোধ যতটা না অর্থনৈতিক, তার চাইতে বেশি রাজনৈতিক। আর বহুদিন ধরে এই শত্রুতা অব্যাহত থাকায় আমরা এটাকে ঐতিহাসিকও বলতে পারি। শত বছর আগের এক অসম চুক্তিই এই বিরোধের মূল কারণ; যেখানে একরকম হাতে-পায়ে বেঁধে ফেলা হয়েছিল তুরস্ককে। তুরস্ক এখন পরাশক্তি, ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত একমাত্র মুসলিম দেশ। ন্যাটোর ঘাঁটি ও অস্ত্রশস্ত্রও আছে তার ভূখণ্ডে। দেশটি নিজেই সামরিক ড্রোন নির্মাণ করছে, সেইসাথে বাইরে রফতানি করছে ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র। কাজেই অতীতের কোনো অন্যায় চুক্তি মেনে নেওয়ার মতো দুর্বলতা এখন আর তুরস্কের নেই। কিন্তু সেই বিতর্কিত চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলেও আছে সিরিজ নিষেধাজ্ঞা ও যুদ্ধের আশঙ্কা। কারণ, সেটা ছিল শান্তিচুক্তি। এ ধরনের চুক্তির কোনো সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না। যেকোনো সময় যেকোনো পক্ষ তা লঙ্ঘন করলেই একটা যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়। তবে উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করাও সম্ভব। অথবা একই ইস্যুতে নতুন কোনো চুক্তি সই হলে আগের চুক্তিটি এমনিতেই রদ হয়ে যায়।

'মানলাম গ্রিসের সাথে তুরস্কের ঐতিহাসিক শত্রুতা আছে। কিন্তু মিশর, আমিরাত আর সৌদি আরবের মতো মুসলিম দেশ কেন গ্রিসের হয়ে কথাবার্তা বলছে? তাদের কী স্বার্থ এখানে?'

অমিতের এমন প্রশ্নে থামতে হলো আমাকে। তুরস্কের এরদোয়ান সরকারের সাথে উল্লিখিত দেশগুলোর বিরোধিতার মূল কারণ পলিটিক্যাল ইসলাম। আরব দেশ বিশেষত রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলো এই পলিটিক্যাল ইসলামকে এখন হুমকি মনে করে।

'কিন্তু এরদোয়ান সরকার তো কোনো ইসলামি সরকার নয়।'

হ্যাঁ। এটা ঠিক যে সাংবিধানিকভাবে তুরস্ক একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র; এরদোয়ান নিজেও তা-ই বলে থাকেন। কিন্তু এরদোয়ান ও তার দল একেপি আদর্শগতভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের ঘনিষ্ঠ—এটা বেশ পরিষ্কার। সিরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও মিশর ইস্যুতে তুরস্কের ভূমিকাই তার বড়ো প্রমাণ। এরদোয়ানের ব্রাদারহুড ঘনিষ্ঠতা নিয়েই সৌদি-আমিরাত আর মিশরের আপত্তি। কাতারের ওপর চার আরব দেশের সংঘবদ্ধ অবরোধের অন্যতম কারণও ছিল এই ব্রাদারহুড ইস্যু। আর কাতারের সেই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছিল তুরস্ক। কাজেই মিশর, আরব আমিরাত আর সৌদি আরবের মতো মুসলিম দেশগুলো তুর্কিদের মতো ঐতিহাসিক শত্রুর পালে বাতাস দেবে এমনটাই স্বাভাবিক। সেই দলে ভিড়েছে বিশ্ব রাজনীতিতে তুরস্কের পটেনশিয়াল থ্রেট ফ্রান্সও।

'কিন্তু ভূমধ্যসাগরে পাওয়া এই গ্যাসের প্রকৃত মালিকানা কার? এর সমাধানই-বা কী?'

বিষয়টা একটু জটিল। এর সমাধান যদি হতে হয়, সেটা আসলে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবেই হওয়া উচিত। মানে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে। তবে বাস্তবতা নিয়ে একটু আলাপ করা যেতেই পারে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইন অনুযায়ী, সমুদ্র উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত কোনো দেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা বিস্তৃত। আমাদেরও কিন্তু রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। এ সীমা পর্যন্ত সমুদ্রের ওপরে ও নিচে রাষ্ট্র তার যাবতীয় আইন প্রয়োগ করার অধিকার রাখে। এই নির্দিষ্ট এলাকায় সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারও করতে পারে কারও কাছে কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই। এ ছাড়া বিদেশি নৌযান ওই রাষ্ট্রের অনুমতি সাপেক্ষে এদিক দিয়ে চলাচল করতে পারবে। তবে বাইরের কোনো রাষ্ট্রেরই এখানে মৎস্য আহরণ কিংবা সামরিক মহড়া চালানো কিংবা যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর অধিকার নেই। কারণ, এই জলসীমায় পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের।

আরেকটি বিষয় হলো অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা। উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত কেবল সমুদ্রের নিচে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই সীমা পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র সামুদ্রিক সম্পদ যেমন মৎস্য, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণের ব্যাপারে সার্বভৌম অধিকার ভোগ করে থাকে। বিদেশি জাহাজ এই সীমানায় পানির নিচে প্রবেশ করতে না পারলেও পানির ওপরে তার অবাধ চলাচল করতে কোনো বাধা নেই। আর ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের সব সমুদ্র অংশই আন্তর্জাতিক জলসীমার অংশ, যেখানে বিশ্বের সব রাষ্ট্রেরই অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে। যেকোনো দেশই এখানে মৎস্য শিকার, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণাসহ সমুদ্র তলদেশে ক্যাবল নেটওয়ার্কও স্থাপন করতে পারবে। এমনকি সামরিক মহড়ার আয়োজন করতেও কোনো বাধা নেই। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক জলসীমার বড়ো একটা অংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও চীন।

উত্তরের সিসিলি প্রণালি থেকে দক্ষিণে তিউনিসিয়া পর্যন্ত একটি কাল্পনিক রেখা ভূমধ্যসাগরকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে ভাগ করেছে। এখানে অবস্থান করছে সাইপ্রাস, ইতালির সিসিলি, ফ্রান্সের কর্সিকা ও গ্রিসের ক্রিট দ্বীপ। এদের মধ্যে সাইপ্রাস আর গ্রিসের ক্রিট দ্বীপ পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বর্তমান সংকটের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ, এই দুই ভূখণ্ড নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধিতা আছে। প্রতিবেশী দুটি দেশের সমুদ্রসীমার দূরত্ব যখন ৪০০ নটিক্যাল মাইলের কম থাকে, তখনই তাদের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা নিয়ে সৃষ্টি হয় নানাবিধ টানাপোড়েন। এই সংকটের সমাধান করা হয় কূটনৈতিকভাবে বা দুই দেশের উপকূল থেকে সমদূরত্বের ভিত্তিতে। যেমন ধরা যাক, দুটি দেশের আন্তঃজলসীমা ৩০০ নটিক্যাল মাইল। তাহলে প্রতিটি দেশ পাবে ১৫০ নটিক্যাল মাইল করে। কিন্তু কখনো কখনো সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে বিরোধ থেকে যায়। কোনো পক্ষই সহজে সুবিধাজনক দাবি হাতছাড়া করতে চায় না। ঠিক এমনটাই ঘটেছে তুরস্ক আর গ্রিসের ক্ষেত্রে। গ্রিস একসময় ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ভূখণ্ড। পরে উভয়ই পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের পরাজয় হলে মূলভূমি তুরস্ক ছাড়া সাম্রাজ্যের বাকি অংশ ব্রিটিশ আর ফরাসিরা ভাগাভাগি করে নেয়। ইস্তাম্বুল সিটি, বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালিরও নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা।

আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দুনিয়ার ক্ষমতা কাঠামো বদলে দিয়েছিল। চার-চারটি সাম্রাজ্যের পতন হয়। ভেঙে যায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান এবং জার্মান সাম্রাজ্য। বলশেভিকদের হাত ধরে রুশ সাম্রাজ্যের পতন হয়, জন্ম নেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। তবে সবচেয়ে বেশি মূল্য চুকাতে হয়েছে তুর্কিদের। অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের আরব, আফ্রিকা আর ইউরোপীয় অংশ হারিয়ে অটোমানদের তুষ্ট থাকতে হয় কেবল আনাতোলিয়া নিয়ে। যে চুক্তির মাধ্যমে অটোমানদের এভাবে পিতৃভূমিতে এনে ঠেকিয়ে রাখা হয়, সেটি 'সেভরস চুক্তি' নামে পরিচিত। শেষ পর্যন্ত তুর্কি খিলাফত টেকেনি। তুরস্কও অটোমান পরিবারের কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে যায়। দেশটির পরবর্তী ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী তরুণ তুর্কিরা।

মিত্রবাহিনীর আগ্রাসনের মুখে একরকম বাধ্য হয়েই শান্তিচুক্তির পথ বেছে নিতে হয়েছিল অটোমান খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মাদকে। ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট এই অপমানজনক চুক্তিতে সই করতে সম্মত হন খলিফা। চুক্তি অনুযায়ী উত্তর আফ্রিকা ও আরব অংশ স্বাধীন হয়ে যায় অটোমানদের হাত থেকে। চুক্তিতে আর্মেনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়, থাকে কুর্দিদের নিয়ে নতুন একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবও। এ ছাড়া পূর্ব থ্রেস ছেড়ে দিতে হয় চিরশত্রু গ্রিসের হাতে। নিষেধাজ্ঞা জারি করে দুর্বল করে ফেলা হয় অটোমান নৌ ও বিমানবহর, যেমনটা করা হয়েছিল জার্মানির বেলায়। তরুণ তুর্কি হিসেবে পরিচিত জাতীয়তাবাদী একদল সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি খলিফার ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। তারা মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে আনাতোলিয়ায় (তুরস্কের এশীয় অংশ) নতুন সরকার গঠন করে। ৭ লাখ ৮৩ হাজার বর্গকিলোমিটারের আজকের যে তুরস্ক, তার বড়ো একটা অংশ উদ্ধার করা হয় কামাল পাশার নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে। এজন্যই তাকে বলা আতাতুর্ক বা তুরস্কের জাতির পিতা। আতাতুর্কের নেতৃত্বে এ সময় বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালিকেও বিদেশি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়।

তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা ১৯২২ সালে অটোমান সুলতান পদটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে। ষষ্ঠ মুহাম্মাদকে সরিয়ে দেওয়া হয়, খলিফার পদে বসেন দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ। নতুন খলিফা দায়িত্ব নেওয়ার পরই মিত্রশক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করে সেভরস চুক্তির পরিবর্তে নতুন আরেকটি চুক্তি সইয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই সুইজারল্যান্ডের লুজানে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক সেই চুক্তি। এটিই ইতিহাসে লুজান চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির একপক্ষে ছিল তুরস্ক, আর অন্যপক্ষে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রিসসহ আরও কিছু দেশ। নতুন এই চুক্তিতে মূল ভূখণ্ড ফিরে পায় তুর্কিরা! ইস্তাম্বুলও যুক্ত হয় আনাতোলিয়ার সাথে; কিন্তু কুর্দিদের স্বাধীনতার দাবি মাটিচাপা দেওয়া হয় লুজান চুক্তিতে। সেভরস থেকে কিছুটা নমনীয় হলেও লুজানের শর্তগুলো তুরস্ককে পঙ্গু রাষ্ট্রে পরিণত করতে যথেষ্ট ছিল। কী এমন শর্ত ছিল যে, তা তুরস্কের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হয়? চাইলে কি এই চুক্তি দেশটি এড়াতে পারত না? এখন কি আর এড়ানো সম্ভব না?

# কী ছিল লুজান চুক্তিতে

অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে এই যে তুরস্ককে আমরা দেখছি, তার জন্ম হয়েছে লুজান চুক্তির মাধ্যমে। লুজানের মাধ্যমেই গ্রিস আর সিরিয়ার সাথে তুরস্কের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। অপরিবর্তিত থেকে গেছে ৪০০ বছর ধরে চলে আসা তুরস্ক-ইরান সীমান্ত। এই চুক্তিতে তুরস্কে থাকা গ্রিক নাগরিকদের স্বদেশে ফেরত দেওয়া এবং গ্রিসে বসবাসরত তুর্কি নাগরিকদের তুরস্কে ফেরত আনার সিদ্ধান্ত হয়। দখলকৃত তুর্কি ভূখণ্ড ছেড়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীপক্ষ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি। তুর্কি ভূখণ্ড থেকে তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে যে দ্বীপগুলো আছে, সেগুলো তুরস্কের হাতেই থাকে। বাকি দ্বীপগুলো দিয়ে দেওয়া হয় গ্রিসকে। এর ফলে এজিয়ান সাগরে গ্রিসের মূল ভূখণ্ড থেকে শত শত মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও তুরস্কের অতি কাছের প্রায় সবগুলো দ্বীপ গ্রিসের হাতে চলে যায়। লুজান চুক্তির মাধ্যমে বসফরাস ও দারদেনালিস প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, দুই প্রণালির তীরবর্তী অঞ্চলকে অস্ত্রমুক্ত রাখতে হবে সব সময়। এমনকি এসবের আশপাশে কোনো অস্ত্রধারী বাহিনী রাখার এখতিয়ার হারায় তুরস্ক।

ফলে তুরস্ক এখানে সামরিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বসফরাস দিয়ে অতিবাহিত জাহাজ থেকে টোল আদায়ের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। অবশ্য ১৯৩৬ সালে অপর এক চুক্তির (মন্ট্রেক্স চুক্তি) মাধ্যমে সান্ত্বনা দেওয়া হয় তুর্কিদের। বসফরাস ও দার্দেনালিস প্রণালির পূর্ণ কর্তৃত্ব ফিরে পায় দেশটি। তবে এই চুক্তিতেও বলা হয়, প্রণালি দুটি দিয়ে অতিক্রম করা বিদেশি জাহাজ থেকে টোল আদায় করা চলবে না। এখন পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ আর সার্ভিস চার্জ বাবদ নামমাত্র অর্থ আদায় করে থাকে তুর্কি কর্তৃপক্ষ। তুরস্ক এখন তাই বিকল্প একটি

নৌরুট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, প্রয়োজনমতো টোল আদায় করা যাবে সেখান থেকে। এই প্রকল্পের ন্যাম দেওয়া হয়েছে 'ক্যানাল ইস্তাম্বুল'।

তাহলে আমরা খোলা চোখে যা দেখছি—জন্মলগ্ন থেকেই গ্রিক-তুরস্ক শত্রুতার শুরু। এখনও সমুদ্রসীমা, সাইপ্রাস ইস্যু নিয়ে দ্বন্দ্ব চলমান। এমনকি তাদের মধ্যকার সমুদ্রসীমাও নির্ধারিত হয়নি আজ পর্যন্ত। ফলে বিরোধিতার বিষয়টি সুরাহা হয়নি। গ্রিস আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইন ১৯৮২-এর স্বাক্ষরকারী দেশ হলেও তাতে সই করেনি তুরস্ক। কারণ, তুরস্কের পশ্চিম জলসীমায় পূর্ব এজিয়ান সাগরে অনেকগুলো গ্রিক দ্বীপ রয়েছে, যাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা যথাক্রমে ১২ ও ২০০ নটিক্যাল মাইল ধরা হলে তুরস্কের জলসীমার নিয়ন্ত্রণ মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। তাই তুরস্ক এই রাজনৈতিক সীমা ছয় নটিক্যাল মাইল বজায় রাখতে চাপ অব্যাহত রেখেছে। তুরস্ক ও গ্রিস উভয়ে সেটা মেনেও এসেছে বিগত কয়েক দশক ধরে। কিন্তু গ্রিস এখন তার সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণের কথা বলছে। আবার দেশটি তুরস্ককে আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিল, পূর্ব এজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলোতে তারা সামরিক কার্যক্রম চালাবে না; কিন্তু খুব সম্ভবত তারা আগের সেই প্রতিশ্রুতিতে নেই। বর্তমানে গ্রিসের অব্যাহত সামরিকীকরণ দুই দেশের সম্পর্কে আরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

# সাইপ্রাস নিয়ে দ্বন্দ্ব

ভূমধ্যসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস। সংখ্যাগুরু গ্রিকদেরই আধিপত্য এখানে। তুর্কিদের একটি অংশও অবশ্য এখানে বসবাস করে, কিন্তু সংখ্যায় তারা গ্রিকদের সমতুল্য নয়। ১৫৭১ সালে অটোমানরা দ্বীপটির দখল নেয়। কিন্তু তুর্কি আধিপত্যকে দুর্ভাগ্যের চাদরে ঢেকে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অটোমানদের পতনের পর দ্বীপটি চলে যায় ইংরেজদের হাতে। সাইপ্রাসে বসবাস করা গ্রিক ও তুর্কিদের মধ্যে আজও যে বিভাজন ও বৈরিতা আমরা দেখছি, তার শুরু তখন থেকেই। এজন্যই বলছি, এই শত্রুতা ঐতিহাসিক। গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ সাইপ্রাসকে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের সাথে জুড়ে দিতে চেয়েছিল। এমনকি তুর্কিদের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থি গ্রিকদের উসকে দিয়েছিল তারা।

ইংরেজমুক্ত হয়ে স্বাধীন 'রিপাবলিক অব সাইপ্রাস' গঠিত হয় ১৯৬০ সালে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধানে অবশ্য সংখ্যালঘু তুর্কি সাইপ্রিয়টদের অধিকার অস্বীকার করা হয়নি। তুরস্ক ও গ্রিস উভয়কেই বলা হয়েছিল—'দ্বীপরাষ্ট্রটি তোমরা দেখভাল করো।' কিন্তু তাতেও গ্রিক-তুর্কি বিরোধ মেটেনি। তুর্কি সাইপ্রিয়টদের বাড়ি-ঘর হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়, অনেককেই উচ্ছেদ করা হয় বসতভিটা থেকে। এ সবকিছুই করে গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টরা। কয়েক দফায় এখানে সেনা পাঠিয়েছে গ্রিক সরকার। জাতিসংঘও হস্তক্ষেপ করেছে পরবর্তী সময়ে; কিন্তু সংকট চলমান। এর মধ্যেই পরিস্থিতি একদম গড়বড় করে দেয় একটি সামরিক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেয় গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টরা। ফলে সাইপ্রাসের স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে তুর্কি সাইপ্রিয়টরদের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবেই হস্তক্ষেপ করে অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি তুরস্ক। দ্বীপটির উত্তর অংশ দখলে নেয় তুর্কি বাহিনী। এই অংশ এখন তুর্কি সাইপ্রাস বা নর্দান সাইপ্রাস নামে পরিচিত। তুরস্ক ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো রাষ্ট্র সাইপ্রাসের এই অংশকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি।

ছবি : ইকোনোমিস্ট

'রিপাবলিক অব সাইপ্রাস' নামে পরিচিত দ্বীপের দক্ষিণ অংশ জাতিসংঘের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। ২০০৪ সালে উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অধীনে একটি গণভোটের আয়োজন করা হয়। উত্তর সাইপ্রাসের ৬৫% জনগণ সম্মতি দিলেও দক্ষিণের ৭৬% জনগণ 'না' ভোট দেয়। ফলে একত্রীকরণ সম্ভব হয়নি। তুরস্ক আর উত্তর সাইপ্রাসের সাথে মূল সাইপ্রাসের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। সাইপ্রাসের সমুদ্রসীমার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তুরস্ক ও উত্তর সাইপ্রাস নিজেদের অংশ বলে দাবি করে থাকে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইন অনুযায়ী তুরস্কের দাবিকে একেবারে অন্যায্য বলা যাবে না; কিন্তু তার পথের কাঁটা সেই লুজান চুক্তি। শত বছর আগের এই বিতর্কিত চুক্তির মাধ্যমেই তুরস্ককে ঠকিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ। তুরস্ক অবশ্য এখন আর এই চুক্তিকে প্রাসঙ্গিক মনে করে না।

বিরোধ নতুন করে ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হলো—সমুদ্রে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান। মূল সাইপ্রাস তার দাবিকৃত এলাকায় আমেরিকান এক্সন মবিল, ফরাসি টোটাল এবং ইতালিয়ান অ্যানি কোম্পানিকে গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছে। পালটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুসন্ধানী কাজের জাহাজ পাঠিয়েছে তুরস্ক। গ্রিস ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্বভাবতই সাইপ্রাসকে সমর্থন দিচ্ছে কারণ দেশটি ইইউ-এর সদস্য। অন্যদিকে উত্তর সাইপ্রাসে এখনও তুরস্কের ৪০,০০০ সেনা মোতায়েন রয়েছে। মূলত পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যথাক্রমে নর্দার্ন সাইপ্রাস এবং মূল সাইপ্রাসকে প্রক্সি হিসেবে ব্যবহার করছে তুরস্ক ও গ্রিস।

ছবি : বিবিসি
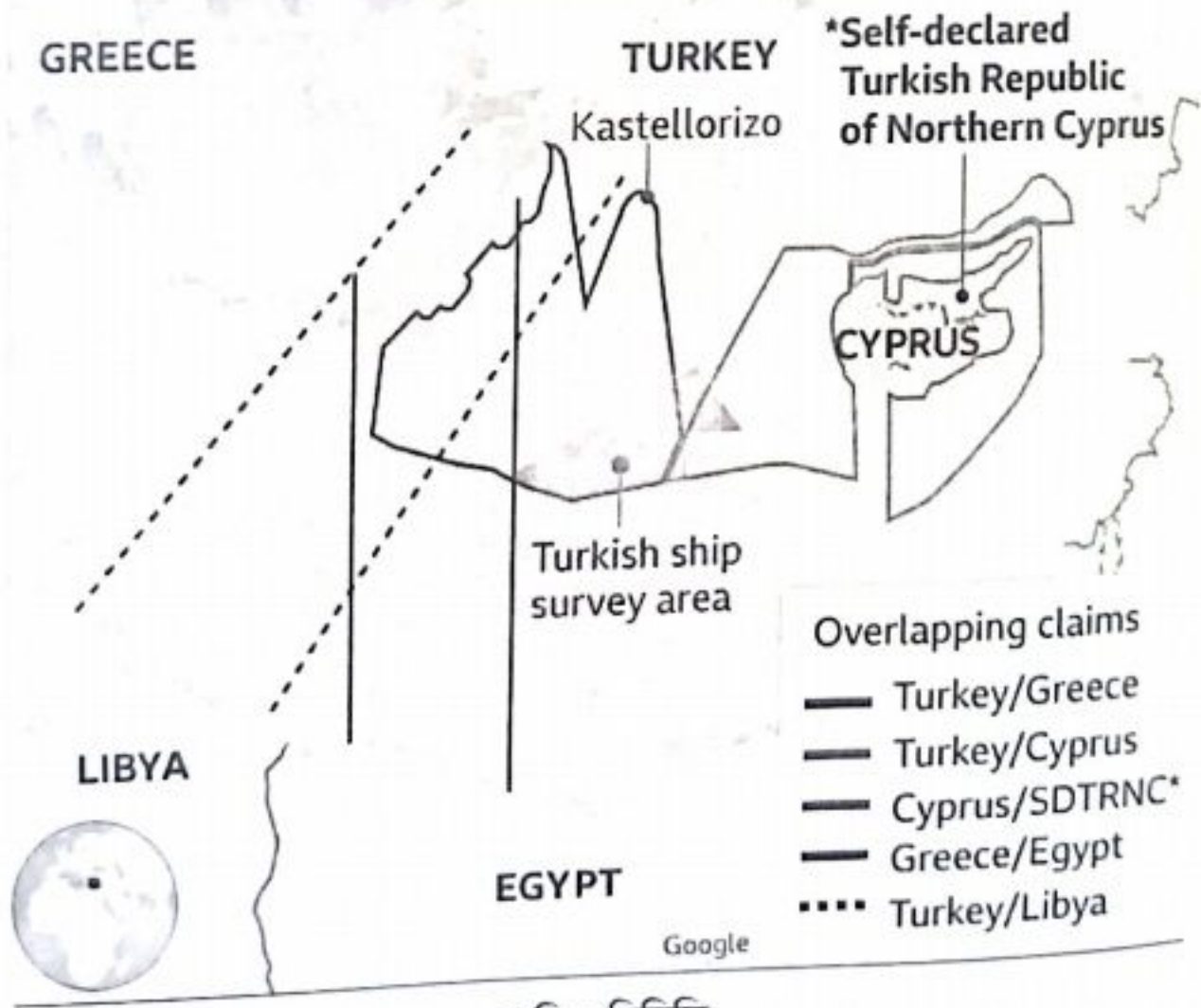
কিন্তু এই দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে আরও বেশ কিছু কারণে। এর একটি কারণ রাশিয়ার গ্যাস। অনেক আগে থেকেই প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ রাশিয়া। তাই ইউরোপ বরাবরই গ্যাসের জন্য দেশটির মুখাপেক্ষী। সেই গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে নিয়ে যেতে হলে ইউরোপকে তাকাতে হয় তুরস্কের দিকে। কিন্তু ইউরোপের পায়ের তলায় ভূমধ্যসাগরে যখন গ্যাস মিলছে, তখন তুরস্ককে আপাতত গনায় না নিলেও চলে। এমন ভাবনা থেকেই তুরস্ককে বাদ দিয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় গ্যাস পাইপলাইন চুক্তি। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে অ্যাথেন্সে গ্রিস, সাইপ্রাস আর ইজরাইল চুক্তিটিতে সই করে। দুই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাইপলাইনটি টানা হবে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে। আর এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ বিলিয়ন ডলার। এই পাইপলাইনের রুট হচ্ছে ইজরাইল-সাইপ্রাস-ক্রিট দ্বীপ-গ্রিস-ইতালি। পাইপলাইনটি দিয়ে যে গ্যাস যাবে, তাতে ইউরোপের প্রায় ১০% গ্যাসের চাহিদা মিটবে বলে অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা। তুরস্কের দিক থেকে এই চুক্তির বিরোধিতা আসতেই পারে। কিন্তু দেখতে হবে, এই বিরোধিতা কতটুকু যৌক্তিক। এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছে, তখন সাইপ্রাসের পশ্চিমে গ্যাসকূপ খনন কার্যক্রম জোরদার করে তুর্কিরা। তুরস্ক দাবি করে—সাইপ্রাসের প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগাভাগি হওয়া উচিত, যেহেতু দুই সাইপ্রাস এখন আলাদা।

বর্তমানে লিবিয়াতে জাতিসংঘ সমর্থিত যে আন্তর্জাতিক সরকার রয়েছে, তার অন্যতম সমর্থক দেশ তুরস্ক। দেশ দুটির মধ্যে কয়েক বছর আগে একটি চুক্তির মাধ্যমে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তুরস্কের দক্ষিণ উপকূল থেকে লিবিয়ার উত্তর-পূর্ব তীর পর্যন্ত উভয় দেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক করিডোর। তাই কোনো ধরনের পাইপলাইন পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে ইউরোপে যেতে হলে এই করিডোরই একমাত্র পথ এবং এক্ষেত্রে লিবিয়া ও তুরস্ক উভয়েরই অনুমতি লাগবে; কিন্তু এই দুই দেশের মাঝখানে রয়েছে গ্রিসের মালিকানাধীন ক্রিট দ্বীপ। চুক্তিতে এই দ্বীপকে মোটের ওপর বিবেচনাতেই নেওয়া হয়নি। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে গ্রিসকেই উপেক্ষা করেছে তুরস্ক। দেশটি এই চুক্তির সাহায্যে জানান দিচ্ছে—'ইজরাইল-সাইপ্রাস-ক্রিট দ্বীপ-গ্রিস-ইতালি' রুটের পরিবর্তে ইস্টমেড পাইপলাইনটি যেতে হবে 'ইজরাইল-সাইপ্রাস-তুরস্ক-ইউরোপ' রুট দিয়ে। ফলে দুই পরস্পরবিরোধী চুক্তি এবং তার স্বাক্ষরকারী দেশগুলো একধরনের মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। এটা কি তুরস্কের বাড়াবাড়ি? আইন কী বলছে? তুরস্ক কি এমনটা করতে পারে?

পূর্ব ভূমধ্যসাগর এবং এজিয়ান সাগর এলাকায় গ্রিসের এমন বহু দ্বীপ আছে– যা তুরস্কের উপকূল থেকে দেখা যায়। ফলে এখানে কার সমুদ্রসীমা কোথায়, তা নির্ধারণ এক জটিল ব্যাপার। অতীতে এ নিয়ে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রমও হয়েছিল প্রায়। গ্রিস যদি তার সমুদ্রসীমা ছয় মাইল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ১২ মাইল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে, তাহলে তুরস্কের যুক্তি অনুযায়ী গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশটির নিজের অন্যান্য সমুদ্রপথ। সমুদ্রসীমা ছাড়াও এখানে আছে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা। এর একটি রয়েছে তুরস্ক আর লিবিয়ার মধ্যে, অপরটি সাইপ্রিয়ট বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায়। এগুলোর সীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত হতে পারে। গ্রিসের কাস্টেলোরিজোর অবস্থান হচ্ছে তুরস্কের মূলভূমি থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে।

গ্রিস বলছে—তুরস্ক যে এলাকায় ড্রিলিং জরিপ চালাবে বলে সতর্কবার্তা জারি করেছে, কাস্টেলোরিজোর উপকূলীয় এলাকার অনেকখানি তার মধ্যে পড়ে যায়। আর তুরস্কের মতে, গ্রিসের মূলভূমি থেকে অনেক দূরে তাদের যেসব দ্বীপ আছে, সেগুলো তুরস্কের খুবই কাছে। তাই তারা তাদের চারপাশের অগভীর সমুদ্র এলাকাকে তার নিজস্ব স্থলভাগের অংশ বলে দাবি করতে পারে না। স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী তুরস্কের দাবি ন্যায়সংগত। কিন্তু লুজানসহ অতীতের কিছু বিতর্কিত চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ককে তার প্রাপ্য সমুদ্রসীমা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। দেশটি সেই বঞ্চনার অবসান ঘটাতে মরিয়া।

# ইস্তাম্বুল খাল

তুরস্ক যে দিক দিয়ে ইস্তাম্বুল খাল কাটার উদ্যোগ নিয়েছে, সেই জায়গাটা পড়েছে ইস্তাম্বুল নগরীর ইউরোপীয় অংশে। মূলত এটি হবে বসফরাস প্রণালির সমান্তরাল ও বিকল্প একটি নৌরুট। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোয়ান সম্প্রতি এই প্রকল্পের ওপর একটি সেতুর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন। ইস্তাম্বুল খাল কেন কাটা হচ্ছে, সেদিন তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন এরদোয়ান। তিনি বলেছেন—

> 'বসফরাস প্রণালি দিয়ে ১৯৩০-এর দশকে বছরে গড়ে ৩০০০ জাহাজ পারাপার হতো। এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫,০০০। এই শতকের মাঝামাঝি নাগাদ অর্থাৎ ২০৫০ সালের দিকে জাহাজের এই সংখ্যা ৭৮,০০০-এ গিয়ে ঠেকবে। আর এত বিপুলসংখ্যক জাহাজের চলাচল ইস্তাম্বুল শহরের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ।'

এরদোয়ানের বক্তব্য থেকে সহজেই বোধগম্য, তিনি বসফরাসের ওপর চাপ কমাতে চান। আর সেজন্যই দরকার একটি বিকল্প নৌরুট; যদিও এটাই একমাত্র কারণ নয়। তুর্কি সরকার খালের জিওপলিটিক্যাল গুরুত্বের বিষয়টিতে চুপ থাকলেও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার দিকটি বারবার তুলে ধরছে। বলা হচ্ছে—ইস্তাম্বুল খাল দিয়ে দৈনিক ৫০টি জাহাজ পার হলেও বছরে দুই থেকে আড়াই বিলিয়ন ডলার অর্থ আয় করা সম্ভব। যেখানে বসফরাস রুট থেকে নামমাত্র মুনাফা করছে তারা।

ন্যাটোর একমাত্র মুসলিম সদস্য রাষ্ট্র তুরস্ক দুই মহাদেশে বিস্তৃত। এর এশীয় অংশকে বলা হয় আনাতোলিয়া। দেশটির ৯৫ ভাগেরও বেশি ভূমি পড়েছে এই অংশে। বাকিটা পড়েছে ইউরোপে। এর কারণ মূলত দুই মহাদেশে বিভক্ত

ইস্তাম্বুল নগরী। আর ইস্তাম্বুলকে এশিয়া-ইউরোপে ভাগ করেছে যে প্রণালি, তার নাম বসফরাস।

৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্তাম্বুল খালের প্রস্থ হবে ২৭৫ মিটার। আর গভীরতা হবে ২০.৭৫ মিটার। বসফরাসের মতোই এই খাল কৃষ্ণসাগর, মারমারা সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সংযোগ তৈরি করবে। কেবল খাল খননই নয়, এই প্রকল্পের আওতায় নতুন একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর, কন্টেইনার টার্মিনাল, কিছু কৃত্রিম দ্বীপ এবং খালের দুই পাশ বরাবর বেশ কয়েকটি আধুনিক শহরও গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে তুরস্কের। এই পুরো প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৫০০ কোটি ডলার।

প্রস্তাবিত ইস্তাম্বুল ক্যানাল। ছবি : টিআরটি ওয়ার্ল্ড

কেবল ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় কারণে নয়, ভূরাজনৈতিক কারণেও ইস্তাম্বুল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সবচেয়ে সরু জলপথ—বসফরাস প্রণালি (ইস্তাম্বুল প্রণালি) এই শহরের বুক দিয়েই বয়ে গেছে। এই বসফরাস আর দার্দানেলিস প্রণালি এড়িয়ে কৃষ্ণসাগরকে মারমারা সাগর, এজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব নয়। একদিকে বসফরাসের মাধ্যমে কৃষ্ণসাগর ও মারমারা সাগর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। অন্যদিকে দার্দানেলিস প্রণালির মাধ্যমে মারমারা সাগরের সাথে যুক্ত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগর।

আরও সহজভাবে বললে—বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালিদ্বয়ের মাধ্যমে কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগর যুক্ত হয়েছে।

এখন কৃষ্ণসাগর হলো পূর্ব ইউরোপ আর ককেশাস অঞ্চলের দেশগুলোর একমাত্র সমুদ্রপথ। বসফরাসে কোনো রকম বাধা বা বিপর্যয় মানে ইউক্রেন, জর্জিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, আর মলদোভার ভূমধ্যসাগরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই অঞ্চলে থাকা ইউরোপের বড়ো দেশ রাশিয়ার অবশ্য বেশ কিছু বিকল্প সামুদ্রিক রুট আছে। কিন্তু পরিবেশ, খরচ ও সময় বিবেচনায় নিলে কৃষ্ণসাগরই তার জন্য সবচেয়ে সেরা অপশন। কাজেই বসফরাসের চাবি যার হাতে, সেই তুরস্ক এই জলপথের মাধ্যমে উল্লিখিত দেশগুলোর ওপর সর্বদা মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করে রাখার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু বসফরাসের নিয়ন্ত্রণ তুরস্কের হাতে থাকলেও এই জলপথ থেকে দেশটি প্রত্যাশিত আর্থিক সুবিধা আদায় করতে পারছে না বহু আগের দুটি চুক্তির কারণে। একটি লুজান আর অন্যটি মন্ট্রেক্স চুক্তি। শেষের চুক্তিটি কিছুটা নমনীয় হলেও দুটি চুক্তিতেই আছে তুরস্কের জন্য বেশ কিছু অপমানজক শর্ত।

মন্ট্রেক্স চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, শান্তির সময়ে যেকোনো বাণিজ্যিক জাহাজ কোনো রকম বাধা ছাড়াই বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালি ব্যবহার করতে পারবে। তবে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী নয়, এমন দেশের নয়টির বেশি যুদ্ধজাহাজ একসঙ্গে এই প্রণালি দুটি পার হতে পারবে না এবং সেগুলো ২১ দিনের বেশি কৃষ্ণসাগরে অবস্থানও করতে পারবে না। এসব জাহাজকে হতে হবে সম্মিলিতভাবে ১৫,০০০ টনের কম। আবার কোনো একটি জাহাজ ১০,০০০ টনের চেয়ে বেশি হতে পারবে না। তবে কৃষ্ণসাগরের দেশগুলোর রণতরি তুরস্ককে জানিয়ে প্রণালি দুটি ব্যবহার করতে পারবে। যেহেতু প্রণালি দুটিতে তুরস্কের সামরিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া হয়েছে, তাই যুদ্ধ চলাকালে এই পথ দিয়ে বিদেশি যুদ্ধজাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তুরস্ক। এমনকি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যেকোনো রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক জাহাজের প্রবেশাধিকারও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে দেশটি।

চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণসাগর এলাকায় যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া। এই চুক্তির অন্যতম বেনিফিশিয়ারি অটোমানদের পুরোনো শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া। বিপরীতে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো, যারা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে

আদর্শিক লড়াই করে আসছে, তারা কিছুটা হলেও বিপাকে। কারণ, তাদের বিমানবাহী রণতরিগুলোর ওজন অনেক বেশি। রাশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে গড়া ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্র তুরস্ক এখন আর নিজেকে দুর্বল মনে করে না। দেশটি সমর ও প্রযুক্তিতে আগের থেকে ঢের শক্তিশালী হয়েছে, কিন্তু ৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে দাপট কমেছে রুশদের। একদিকে মানুষের গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহের কারণে সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোর দিকে আমেরিকা ও ন্যাটোর নজরদারি বাড়ছে, অন্যদিকে রাশিয়া চায় পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমের প্রভাব ঠেকাতে। এই ক্ষেত্রে দুপক্ষকে নিয়েই যার খেলা সম্ভব, তার নাম তুরস্ক। কারণ, কৃষ্ণসাগরে ঢোকা ও বের হওয়ার চাবি তারই হাতে। কাজেই মন্ট্রেক্স চুক্তির শর্ত মেনে তুরস্কের চুপচাপ বসে থাকার দিন শেষ। খাল কেটে নতুন নৌরুট তৈরি করা গেলে বসফরাসে চাপ যেমন কমবে, তেমনি অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক সুবিধা পাবেন এরদোয়ান।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। এবার ওঠার পালা। গাছতলা ছেড়ে আমি আর অমিত-দুজনই ধর্মসাগরের ভেতরে একটা প্রমোদবোটে চড়ে বসলাম। নামেই সাগর, আসলে এটা বড়ো একটা দিঘি। সাড়ে ছয়শো বছর আগে ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমানিক্য এই দিঘি খনন করেছিলেন। তার এই দিঘি কাটা নিয়েও আছে নানা গল্প; মিথ আর জনশ্রুতি। সেই গল্প অন্যদিন হবে, অন্য কোনো বিকেল বা সন্ধ্যায়। সেদিন না হয় ঠোঙাভর্তি বাদাম হাতে গল্পে গল্পে দিন পার করে দেবো আমরা!'

# সহায়ক গ্রন্থসমূহ


১. The History of Saudi Arabia, Madawi al-Rasheed.

২. The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future, Kerim Yildiz.

৩. The Coup: 1953, The CIA, and The Roots of Modern U.S.-Iranian Relations, Ervand Abrahamian.

৪. The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future , Vali Nasr.

৫. The CIA in Iran: The 1953 Coup and the Origins of the US-Iran Divide, Christopher J. Petherick.

৬. Ghosts of Halabja: Saddam Hussein and the Kurdish Genocide (Praeger Security International), Kelly, Michael J.

৭. State of Repression: Iraq under Saddam Hussein, Lisa Blaydes.

৮. Blood and Oil: Mohammed bin Salman's Ruthless Quest for Global Power, Bradley Hope and Justin Scheck.

৯. War in the Gulf, 1990-91: The Iraq-Kuwait Conflict and Its Implications, Majid Khadduri .

১০. A History of Modern Iran, Ervand Abrahamian.

১১. Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, William R. Clark.

১২. The Party's Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies, Richard Heinberg.

১৩. Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State, Yasheng Huang.

১৪. The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower, Michael Pillsbury.

১৫. The War for Wealth: Why Globalization is Bleeding the West of Its Prosperity, Gabor Steingart.

১৬. A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order, F. William Engdahl.

১৭. The Making of Saudi Arabia, 1916-1936: From Chieftaincy to Monarchical State, Joseph Kostiner.

১৮. Saudi, Inc. Ellen R. Wald.

১৯. The Iran–Iraq War 1980–1988, Efraim Karsh.

২০. Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia, Robert Lacey.
২১. The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict, Dilip Hiro.
২২. Salman's Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia, Madawi Al-Rasheed.
২৩. Saddam Hussein: A Political Biography, Efraim Karsh.
২৪. The Ba'thification of Iraq: Saddam Hussein's Totalitarianism, Aaron M. Faust.
২৫. ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড, তামিম আনসারি, আলী আহমাদ মাবরুর (অনুবাদক)
২৬. লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি, ফিরাস আল খতিব , আলী আহমাদ মাবরুর (অনুবাদক)
২৭. বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর, ড. তারেক শামসুর রেহমান.
২৮. ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
২৯. রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩০. দেশে বিদেশে, সৈয়দ মুজতবা আলী
৩১. গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী, আমিনুল ইসলাম
৩২. ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান, ইভন রিডলি, আবরার হামিম (অনুবাদক)
৩৩. আরব্য রজনীর অজানা অধ্যায়, সাইয়েদ সালিম শাহজাদ, সম্পাদনা মূসা আমান। অনুবাদ-টিম, দারুল ঈমান
৩৪. মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত: বর্তমান ও ভবিষ্যত, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন
৩৫. তেল-গ্যাস : নব্য উপনিবেশবাদ (কাবুল হতে বাগদাদ), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন
৩৬. জীবনের বালুকাবেলায়, ফারুক চৌধুরী
৩৭. পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ, শাহাদুজ্জামান
৩৮. দ্য কিংডম অব আউটসাইডারস, সোহেল রানা
৩৯. ছোটদের রাজনীতি ছোটদের অর্থনীতি, ড. নীহার কুমার সরকার
৪০. আফগানিস্তান অতীত ও বর্তমান, ড. গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া
৪১. ইরান সংকট ও উপসাগরীয় রাজনীতি, ড. তারেক শামসুর রেহমান
৪২. সোভিয়েৎস্কি কৌতুকভ (১৯১৭-১৯৯১), মাসুদ মাহমুদ

# লেখক পরিচিতি

সোহেল রানা।

কুমিল্লার সন্তান। বেড়ে উঠেছেন গোমতীর তীরে, মনোহরপুর নামে এক সবুজ পাড়াগাঁয়ে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশের পর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে কাজ করছেন রেডিও টুডে-তে। *দ্যা কিংডম অব আউটসাইডারস* লেখকের প্রথম বই। আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে লেখক বিচরণ করতে চান বিশ্ব রাজনীতি ও ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে; যেতে চান দূরে, বহুদূরে...

ইতিহাস বদলে যায় যুদ্ধ-সংগ্রাম, বিদ্রোহ আর বিপ্লবে। উত্থান হয় ক্ষমতার নতুন ভরকেন্দ্র ও পরাশক্তির। যুগে যুগে এভাবেই ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দুনিয়া দেখল জ্বালানি তেলের অভূতপূর্ব দাপট! বিংশ শতাব্দী থেকে দুনিয়ার ক্ষমতা-কাঠামোই উলটপালট করে দিলো এই তেল অস্ত্র। তেলের পরশে বদলে গেল মরুর দেশ সৌদি আরব, উপসাগরীয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কাতার, কুয়েত, আমিরাত, ওমান ও বাহরাইন। পশ্চিমা অয়েলম্যানদের কারসাজিতে প্রায় ধ্বংস হলো লিবিয়া, ইরাক আর ইয়েমেন। অন্যদিকে রাশি রাশি নিষেধাজ্ঞার বোঝা মাথায় নিয়েও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তেল আশীর্বাদে দিব্যি টিকে আছে ইরান ও ভেনিজুয়েলা। *ব্যাটল ফর পাওয়ার* আপনাকে শোনাবে সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনি; নিয়ে যাবে বিশ্ব রাজনীতির দুর্গম গিরিপথে।